রবীন্দ্রনাট্যকল্পনা : অন্যান্য প্রসঙ্গ

কানাই সামন্ত

রবীন্দ্রনাট্যকল্পনা : অন্যান্য প্রসঙ্গ

কানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ
শান্তিনিকেতন

১২৫ রবীন্দ্রজন্মবর্ষ

প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৩
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

মূল্য চল্লিশ টাকা

প্রকাশক সুব্রত চক্রবর্তী
বিশ্বভারতী গবেষণাপ্রকাশন বিভাগ
শান্তিনিকেতন

মুদ্রক তিলক দাস
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস বোলপুর

নিবেদন

বিশ্বভারতী গবেষণাপ্রকাশন বিভাগ রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবর্ষে রবীন্দ্রসংক্রান্ত গবেষণামূলক গ্রন্থপ্রকাশ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই পরিকল্পনাপ্রসূত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয়ের **রবীন্দ্রনাট্যকল্পনা : অন্যান্য প্রসঙ্গ**।

রবীন্দ্রপ্রতিভার সার্বিক্ পরিমাপ-সাধন কোনো একক প্রচেষ্টায় অসম্ভব। সত্তা ও সত্যের সমন্বয়ে যে প্রতিভা দীর্ঘদিন নানা বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে নিয়োজিত রেখেছিলেন— এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলির ভিতর কালপরিমাপে তাঁর যে আংশিক প্রতিভার পরিচয় পাই তা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভাবিত করে।

১২৫-তম রবীন্দ্রজন্মবর্ষে এই গ্রন্থটি পাঠকসমাজও আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

শান্তিনিকেতন
ভাদ্র ১৩৯৩

সুব্রত চক্রবর্তী
সম্পাদক। বিশ্বভারতী গবেষণাপ্রকাশন বিভাগ

প্রাককথন

এ বইয়ের সাতটি প্রবন্ধ একটি পত্রপ্রবন্ধ নানা সময়ে লেখা নানা উপলক্ষ্যে। তার মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ লেখা হয় বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেনের আগ্রহে, পরে প্রচারিত হয় বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৭৬ বৈশাখ-আষাঢ়ে। তৃতীয়টির প্রচার বেতার-ভাষণ রূপে কোলকাতা-কেন্দ্র থেকে ১৩৭০ সনের ৩১শে বৈশাখ তারিখে। আর, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার পুঁজি অল্প হলেও চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধে হাত দিতে হয় চিরস্মরণীয়া ইন্দিরা দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'ইন্দিরা' সঙ্গীতশিক্ষায়তনের বিশেষ অনুরোধে, আদৌ প্রচারিত হয় ওঁদেরই 'একটি রক্তিম মরীচিকা' (ভাদ্র ১৩৮৩) ও 'রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান' (বৈশাখ ১৩৯০) পুস্তিকায় ---এ কথার উল্লেখ থাক্ এখানে।

যাঁরা প্রেরণা দিয়েছেন লেখায়, প্রচার করেছেন পত্র-পত্রিকায়, সর্বপ্রকারে আনুকূল্য করেছেন এই গ্রন্থ-প্রকাশে, সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শ্রাবণ ১৩৯৩

শান্তিনিকেতন

কানাই সামন্ত

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতিপ্রতিভাময়ী

শ্রীমতী বাসন্তী বাগচীর

করকমলে

রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার বিবর্তন

রবীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ। প্রায় তাঁর জন্মমুহূর্তে বঙ্গবাণীর মন্দিরে নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন শ্রীমধুসূদন।[১] তাঁর কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হল নবযুগের নূতন সুর, অতল অকূল সমুদ্রের উদাত্ত গম্ভীর আরাব, দেশ-দেশান্তর যুগ-যুগান্তর প্লাবিত করে যার বেগবান প্রবাহ অপূর্ব ছন্দে গানে নিত্য আন্দোলিত। মধুসূদনের দুঃখদ্বন্দ্বময় জীবনে যার প্রথম প্রতিশ্রুতি, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতর জীবনে ও সাধনায় তারই পরমাশ্চর্য সফলতা। সারা জীবনের একাগ্র ও অবিশ্রান্ত সারস্বত সাধনার দ্বারা একা তিনি বহু শত বৎসরের সমৃদ্ধি দিয়ে গেছেন জাতিকে— তার প্রকার ও পরিমাণ শুধু নয়, প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়াও বিস্ময়জনক। জন্মার্জিত প্রতিভার অব্যর্থ ধীর বিকাশে স্বভাবের শক্তি বা স্বতঃস্ফূর্তি যেমন ভিতরের কথা, আসল কথা বা প্রকৃত ঘটনা, বাহিরের দিকে তেমনি ছিল তাঁর যত্ন পরিশ্রম এবং অনুশীলন— তবেই তো অন্তরের সামগ্রী বাহিরেও অপূর্ব আকার পেয়ে রূপসৌষ্ঠবে সৌন্দর্যে ও রসমাধুর্যে ভরে উঠেছে। এভাবে দেখলে যোগী বা সাধকের থেকে কবির প্রকৃতি কিছু ভিন্ন নয় এবং সর্বাঙ্গীণ এই প্রক্রিয়াটিও অতন্দ্র অটুট এক তপস্যা। তপস্যার ফললাভে কৃতকৃতার্থ আমরা সকলেই কিন্তু তপস্যার মাঝখানেও তপস্বীকে চিনে নিতে চাই। এজন্য আমাদের দিক থেকেও যত্ন ও পরিশ্রম চাই, অনুশীলন চাই, অধ্যবসায় অপরিহার্য। একজনের কাজ নয়। অনেকের অনেক কালের চেষ্টায় ও অভিনিবেশে কবির জীবনব্যাপী সারস্বত সাধনার রহস্য, নিগূঢ় মর্ম ও বৈশিষ্ট্য, একটু হয়তো উদ্‌ঘাটিত ও উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে।

এ ক্ষেত্রে কিছু কাজ[২] অবশ্যই করা হয়েছে, কত যে বাকি আছে বলা যায় না। উপস্থিত সীমাবদ্ধ একটি বিষয়েই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট, সেটির সংজ্ঞা এই হতে পারে: রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন। কিন্তু 'নানা' বলতেই 'সব' নয়। বিশেষ কবি-

কল্পনা কোনো-একটি নাটকে যে আকারে-অবয়বে প্রাণবান ও শরীরী, পরে কিভাবে আর কেনই বা তার রূপান্তর অথবা জন্মান্তর তারই আলোচনা করা যেতে পারে প্রায়শ্চিত্ত পরিত্রাণ ও মুক্তধারার পারস্পরিক তুলনায়। হয়তো শাপমোচন রাজা ও অরূপরতনের বৈচিত্র্যধারায় অনুস্যূত ঐক্যের সন্ধানও তুরূহ হবে না। কিন্তু তার বাইরেও আলোচনার বহু বিষয় আছে, বর্তমানে এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

বিভিন্ন রচনায় যা-কিছু পরিবর্তন করেছেন কবি বিভিন্ন সময়ে আর বিচিত্র মনোভাব থেকে, সবই একজাতীয় বলা যায় না। কখনো আকারে, কখনো প্রকারে, কখনো প্রকৃতিতেই প্রভেদ ঘটেছে। কখনো কাঁচা লেখার সংস্কার করেছেন পরিণত বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা থেকে। কখনো নানারূপ যোগবিয়োগ করে পরিবর্তন করেছেন বলা যায়। আর, কখনো বা সম্পূর্ণ জাত্যন্তর জন্মান্তর ঘটিয়েছেন কাব্য বা নাটকের সূক্ষ্মশরীরেও —এই প্রক্রিয়াকেই যথার্থ বিবর্তন বলা চলে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় কিম্বা সন্ধ্যাসংগীত কাব্যেরও মুদ্রণ-পরম্পরায় সংস্কার কতদূর যেতে পারে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু এজাতীয় সংস্কারের দ্বারা কবি যে কখনোই শেষ তুষ্টিলাভ করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। পক্ষান্তরে চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের প্রথম মুদ্রণ (১২৯৯) থেকে দ্বিতীয়ে (১৩০১) ও তৃতীয়ে (১৩০৩) যে পরিবর্তন তাকেও আক্ষরিক কিম্বা আভিধানিক অর্থে সংস্কার বলতে হয় বোধ করি, পাত্রপাত্রীর অথবা ঘটনার সমাবেশে ইতর-বিশেষ কিছু হয় নি অথচ আদ্যন্ত রচনায় বহু স্থলে শব্দের পরিবর্তন অথবা শব্দগোষ্ঠীর স্থানপরিবর্তন আর তারই ফলে যতিপাতের পার্থক্য কেবলই পরিমাণগত এমন বলা যায় না, পঞ্জীকৃত পাঠভেদে তার যথার্থ হিসাব মেলে না— কবি ও রসিক উভয়কেই অপ্রত্যাশিতের প্রকটনে চমৎকৃত ক'রে তা গুণগত পরিবর্তনের রূপ নিয়েছে কখন্ কিভাবে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সুকঠিন। এইমাত্র বলা চলে—

চিত্রাঙ্গদার প্রথমপ্রচারিত রূপ আর তারই রূপান্তর এ দুটির মধ্যে কালের ব্যবধান যেমন দুস্তর নয়, যেভাবেই হোক, কবিচিত্তের মুড বা মেজাজটিও ছিল অবিচ্ছিন্ন, অবিকৃত। অর্থাৎ, যে রসপ্রেরণা থেকে ঐ নাট্যকাব্যখানি প্রথম লেখা হয় (ভাদ্র ১২৯৮), একই সেই প্রেরণা সংস্কারকার্যে সজাগ, সক্রিয়। ফলে, পরিবর্তন শুধু শব্দশরীরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, কাব্যের **ছন্দোময় প্রাণময়** সূক্ষ্মশরীরেও পৌঁছে গিয়েছে; আদ্যন্ত কাব্যের ছন্দোদোলায় কী যেন নূতন বেগ, নূতন সুর, নূতন আনন্দউল্লাস জেগে উঠেছে। ছন্দই তো অনির্বচনীয় রসের ধারক, বাহক। তাই রসাত্মক রচনার সামগ্রিক সত্তায় কী-এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘ'টে গিয়ে অভূতপূর্ব সৌন্দর্যে মাধুর্যে ও সংরাগে আমাদের বিস্মিত করেছে। সতর্ক সজাগ বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন, বুদ্ধিগ্রাহ্য, সংস্কার এ নয়— মৌলিক পরিবর্তন বা বিবর্তনই বলতে হয়। চিত্রাঙ্গদার প্রাথমিক রূপটিকে পরবর্তী সার্থক রূপরচনার, অর্থাৎ আসল চিত্রাঙ্গদার, খসড়াও বলা চলে। যেটি কবি-কারিগরের কারখানাঘরের নেপথ্যেই থাকার কথা, দৈবক্রমে সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয়েছে। ভাবীকালের গবেষকগণ অভাবিত-আবিষ্কারের ও আত্মগৌরবের দুর্লভ এক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এমন বলা যায় না কি ?

রাজা ও রানী, বিসর্জন,[৩] এই নাটক-দুটিতেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মুদ্রণে বা সংস্করণে বহু পরিবর্তনই করেছেন, শব্দগত সংস্কার নয়, পাত্রপাত্রীর যোগবিয়োগ (বিসর্জনের ক্ষেত্রে) আর অঙ্কবিভাগ ও দৃশ্যসন্নিবেশের বিভিন্নতা, ঘটনারাজির তারতম্য— ফলে সামগ্রিক-ভাবেই পুরাতন রচনার নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত।

রাজা-অরূপরতনে এই একই প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ পাই।

বউঠাকুরানীর হাট আর রাজর্ষির কাহিনী যথাক্রমে প্রায়শ্চিত্ত আর বিসর্জনের নাট্যরূপে বিবর্তিত (রচনার কালক্রমে বিসর্জন নাটকখানি প্রায়শ্চিত্তের অগ্রগামী) এ কথা অনেকেই জানেন। প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তিত রূপ— পরিত্রাণ। বিসর্জন নাটকের বিভিন্ন

মুদ্রণে বহুবিধ পরিবর্তন এ তো পূর্বেই বলা হয়েছে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত থেকে আঙ্গিকে বা প্রকরণে, রূপরসের আবেদনে আর বক্তব্যেও, মুক্তধারার যে পার্থক্য তাকে পরিবর্তন বলা চলে না ; বলতে হয় বিবর্তন। এই ভাবেই রাজা ও রানী নাটকের বিবর্তন ঘটেছে তপতীতে এ কথা উল্লেখযোগ্য। বিসর্জনের এমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটে নি তার একটা কারণ এই যে, এই পঞ্চাঙ্ক নাটক তার প্রচল রূপে 'চিরায়ত' ট্র্যাজেডির আদর্শেই যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ, সার্থক ও সন্তোষজনক, হয়ে উঠেছে সহৃদয় সামাজিকের দৃষ্টিতে।[৪]

এই-সব পরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারাবিবরণ ও পর্যাবলোকন অল্প কৌতূহলজনক নয়! তেমনি শিক্ষাপ্রদ। কার্যকারণনির্দেশ অনেক সময়েই দুরূহ সন্দেহ নেই; কেননা স্রষ্টার দুরবগাহ অন্তর্লোকে আমাদের প্রবেশলাভ প্রায়শই সম্ভবপর নয়। সৃষ্টি কেমন, তার উপাদান, তার গঠন, তার ক্রমবিকাশের ধারা, কতকটা বর্ণনা করা গেলেও— সে যে কী ও কেন প্রায় তা বলা যায় না। এ যেমন বিশ্ব-সৃষ্টিতে তেমনি মানুষের সৃষ্টি মনোভবলোকেও অতিশয় সত্য। তাই, রসোত্তীর্ণ কাব্য ও নাটকের প্রকার ও প্রকরণ নিয়ে যতই না আলোচনা করা যাক, তার কার্যকারণনির্দেশ সংশয়াতীত বা অভ্রান্ত না হতে পারে।

. .

১৩১৭ পৌষে রাজা প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু ঐ নাটকের এটি প্রাথমিক রূপ নয়। প্রাথমিক পাঠ প্রকাশিত হয় ন্যূনধিক দশ বৎসর পরে। ১৩২৬ মাঘে অরূপরতন এই নামান্তরে রাজা নাটকের অন্য একটি রূপও আত্মপ্রকাশ করে আর সব-শেষে ১৩৪২ কার্তিকে অরূপরতন নূতন-সংস্করণ দেখা দেয়। বস্তুতঃ রাজার চতুর্বিধ রূপ আমাদের গোচরে আছে ; রচনার পারম্পর্যে উল্লেখ করতে হলে বলা যায়— রাজা (মাঘ-পূর্ব ১৩২৬? দ্বিতীয় মুদ্রণ),[৫] রাজা (১৩১৭ পৌষের প্রথম মুদ্রণ), অরূপরতন (১৩২৬ মাঘ) এবং অরূপরতন

(১৩৪২ কার্তিক)। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনসংগ্রহে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে রাজা/অরূপরতনের আরো দুটি অসম্পূর্ণ পাঠ দেখা যায়— একখানি জাপানি খাতায় (রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১৭১)[৬] আর বর্জিত প্রেস-কপির খুচরা কতকগুলি পাতায়।[৭] এগুলির রচনা শেষোক্ত মুদ্রিত সংস্করণের পূর্বেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রসদনের খাতায়-পত্রে ১০ নভেম্বর ১৯৩৫ (২৪ কার্তিক ১৩৪২) তারিখে উল্লেখ দেখা যায় : 'রাজা ও অরূপরতন নাটক দুটি মিলাইয়া রাজা নাটকের সংশোধন সভায় পাঠ।'[৮]

রবীন্দ্রনাথ অসম্পূর্ণ রচনা সভাস্থলে পাঠ করেন এমন কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। কাজেই জাপানি খাতার পাঠ পড়া হয় নি এ কথা নিশ্চিত। মনে হয়, সম্পূর্ণ যে পাঠ কবি আশ্রমস্থ সহৃদয়-সমাজে উপস্থিত করেন তারই প্রথমাংশ (২১ পাতা বা পৃষ্ঠা) বর্জিত প্রেস-কপি হিসাবে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আর অবশিষ্ট পাতাগুলির সন্ধান না মিললেও, অল্প-বিস্তর পরিবর্তনে, বর্জনে / সংযোজনে, ১৩৪২ কার্তিকে মুদ্রিত অরূপরতনের অঙ্গীভূত— এ কথা সহজে এবং সংগত কারণেই অনুমান করা চলে। পূর্বোক্ত সভাস্থলে আমাদের গোঁসাইজি (শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী) উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধ রচনার সময়ে অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী তিনি, এটুকুই জেনেছি— নূতন পাঠ তেমন ভালো লাগে নি তাঁর। ভালো না লাগার সম্ভাবনা কিসে, সে হয়তো পরবর্তী আলোচনায় বা পাঠবিচারে জানা যাবে। ছাপাখানার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পরেও কবিকর্তৃক আংশিক (?) বর্জনে, রবীন্দ্রভক্ত সুধী সামাজিকের পূর্বোক্ত অনভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

রাজা-অরূপরতনের অন্তত চারটি পাঠ এবং কবির আয়ুষ্কালে অমুদ্রিত কিন্তু অধুনাপ্রচারিত (রবীন্দ্রবীক্ষা-২। পৌষ ১৩৮৩, পৃ ৪৭-৮৭ ও ৮৮-৯৭) দুটি অসম্পূর্ণ পাঠ নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। আর, তার আগে রাজা বা অরূপরতনের মূলসূত্রানুসন্ধানও

অনুচিত হবে না। এ কথা জানা চাই— রাজা বা অরূপরতন-রূপ বিচিত্র নাট্যকল্পনার এক সীমায় আছে বৌদ্ধ কুশজাতক উপাখ্যান,[৯] অন্য সীমান্তে শাপমোচন[১০] কবিতাটি। উপাখ্যান কিম্বা কবিতার সঙ্গে রাজা-অরূপরতনের অন্তরের মিল নেই, তবু বাহ্যসাদৃশ্য কতকটা আছেই। —

বারাণসীরাজ ইক্ষ্বাকুর পাঁচশো রানী আর পাঁচশো পুত্রসন্তান। তার মধ্যে প্রধানা মহীষীর পুত্র কুশ বলবীর্যে বুদ্ধিমত্তায় অদ্বিতীয় হলেও অত্যন্ত কুৎসিত দেখতে। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন আর কান্যকুব্জরাজের সুন্দরী কন্যা সুদর্শনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় প্রতীক বা প্রতিনিধি-যোগে। স্বামীর কুৎসিৎ রূপ দেখে পাছে রানী আত্মহত্যা করেন তাই রাজমাতার ব্যবস্থায় পাতালে অন্ধকার কক্ষে হল তাঁর মিলনবাসর; বলা হল ইক্ষ্বাকুকুলের এই রীতি। কিন্তু প্রাণপ্রিয় দয়িতকে দিনের আলোয় না দেখে সুদর্শনা স্থির থাকতে পারেন না। সুতরাং কুশের সুরূপ এক বৈমাত্র ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বয়ং কুশ ধরে রইলেন রাজছত্র। রাজকন্যা 'স্বামী' - সন্দর্শনে পুলকিতা হলেও কালো কুৎসিত ছত্রধারীকে দেখে হল তাঁর ক্ষোভ। কিন্তু এ বঞ্চনাও স্থায়ী হল না। একদা করভোদ্যানে[১১] লাগল আগুন আর কুশের বলবিক্রমেই তা নির্বাপিত হল। মুখে মুখে তাঁর গুণগান, মসীকৃষ্ণ যাঁর তনু, আয়ত রক্তচক্ষু যেন আগুনের ভাঁটা। সুদর্শনার মোহময় ভ্রান্তি ঘুচে গেল; রোষে ক্ষোভে অধীর হয়ে রাজমাতার অনুমতি নিয়ে, পিতৃগৃহে হল তাঁর আত্মনির্বাসন। মহারাজ কুশ ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে পাকশালায় ভর্তি হলেন। গোপনে রাজকন্যাকে বোঝাতে গেলেন; কোনো ফল হল না। এ দিকে সুদর্শনার স্বামীত্যাগের বৃত্তান্ত গোপন রইল না। সাতজন সামন্তরাজা এলেন পাণিপ্রার্থী হয়ে; যুদ্ধ বাধল। কান্যকুব্জরাজ বললেন, পরাজয় যদি ঘটে পতিত্যাগিনী কন্যাকে সাত টুকরো করে দেবেন তিনি সাতজন রাজাকে। শঙ্কায় অনুশোচনায় শেষে স্বামীরই শরণ নিলেন সুদর্শনা।

কান্যকুব্জরাজ দিলেন তাঁকে বহুমান। রণক্ষেত্রে গজবাহন কুশ অমানুষিক এক হুঙ্কারে আতঙ্কিত শত্রুরাজাদের অনায়াসে করলেন পরাভূত। জামাতার অনুরোধে কান্যকুব্জরাজ প্রত্যেকের সঙ্গেই এক-এক রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। কুশও পত্নীকে নিয়ে ফিরে চললেন আপনার রাজধানীতে। পথে স্বচ্ছ এক জলধারায় আপনার কদাকার রূপ হঠাৎ দেখতে পেয়ে কুশ আত্মহত্যায় উদ্যত হলে করুণাময় ইন্দ্র এসে দিলেন তাঁকে দিব্যরত্নগ্রথিত এক মালা। সেই মালা প'রে অচিরে কুশ হলেন দিব্যকান্তি চিরযুবা আর সুদর্শনাও যার-পর-নেই আনন্দিতা হলেন।

সংক্ষেপে এই হল কাহিনী। এই গল্পে অলৌকিকের সমাবেশ আছে যথারীতি, সেকালের শ্রোতাদের মনোহরণের উপযোগী উপাদানও আছে প্রচুর। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভাবসম্পদে বা অর্থগৌরবে ভরে দিয়েছেন এই বাঁধা ছাঁদের কাহিনীটি, কল্পনা ও কবিত্বের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে অপরূপ করে তুলেছেন আর গভীর-গম্ভীর জীবনদর্শনের বিগ্রহ রচনা করেছেন অভিনব নাট্যরূপে— দুর্লভ কবিপ্রতিভার গুণেই তা সম্ভবপর। নাট্যরূপ না দিয়ে গাথা বা কবিতাও অবশ্যই লেখা যেত। বৌদ্ধকথাবস্তুর আধারে রচিত পূজারিনি অভিসার পরিশোধ স্মরণ করা যেতে পারে। কুশজাতক নিয়েও বহু বৎসর পরে, ১৩৩৮ পৌষে, লিখলেন শাপমোচন গদ্যকবিতা; সেটি ঐ নামেরই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল, পরে স্বতন্ত্র কবিতা হিসাবেও পুনশ্চ কাব্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বক্তব্য বা জীবনদর্শন সচল শরীরী বেগবান্ প্রাণবান্ করে দেখতে ও দেখাতে চান কবি, নাট্যরূপই তার উপযুক্ত বাহন আর সে নাটক যুগোপযোগী।

দুঃখের তপস্যায় কর্মক্ষয় আর তারই ফলে শাপমোচন ও পরিণামে অরুণেশ্বরের দিব্যকান্তিলাভ, এটুকু অলৌকিকতা থাকলেও (ভারতীয় পরম্পরার বিচারে এ আর কী এমন অলৌকিক) শাপমোচন কবিতায়

আদ্যন্ত কাহিনীটি আছে লৌকিক স্তরে। মর্ত্যমানুষের সুখদুঃখ আশানিরাশা আকাঙ্ক্ষাআবেগের ঘাতপ্রতিঘাতময় পরিচিত জীবন-ছন্দই। পূর্বজীবনের ভূমিকায় ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, ছন্দোময় দিব্যজীবন; ছন্দঃপতনই তার যা-কিছু দুঃখের হেতু, তার বিশেষ অপরাধ। উষাসন্ধ্যায় তারার কিরণে, দেওদারবনে হাওয়ার হাহাকারে, কৃষ্ণপক্ষ চাঁদের আলোয়, অতন্দ্রতরঙ্গের কলক্রন্দনে, নিমফুলের সৌগন্ধে, ঝিল্লির ঝঙ্কারে, নিষুপ্তনীড়ের-পাশ-দিয়ে-উড়ে-যাওয়া রাতের পাখির ডানার চঞ্চলতায়, স্বপ্নে-কথা-কওয়া অরণ্যের আকূতিতে আর তারই সঙ্গে বিরহীহৃদয়ের নৃত্যে গানে ও বেণুবীণায় পরজ বেহাগ ভৈরবীর একতানে মিলিয়ে অশরীরী বেদনাকে কী অপূর্বভাবেই না ব্যঞ্জিত করা হয়েছে কবিতায়। মানবমনের পথ-না-জানা সব গুহায় গহ্বরে জেগে উঠেছে ধ্বনি প্রতিধ্বনি। অবশেষে মিলনের লগ্নটির উদয় হল অন্তহীনপ্রায় বিরহের পরপারে। এ তো শুধু রবীন্দ্ররচনাশৈলীতেই সম্ভবপর। সবই আসলে তবু পার্থিব অভিজ্ঞতা, বহু এবং বিচিত্র মানবভাগ্যেরই করুণে মধুরে মেশানো এক কাহিনী— কাব্যের ভাষায় অপরূপ সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে।

রাজা অরূপরতনের তাৎপর্য আরো গূঢ়, গভীর, সর্বগ্রাসী। যথালব্ধ আখ্যান রবীন্দ্রপ্রতিভার ইন্দ্রজালে নিখিল মানবজীবনেরই প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ তত্ত্ববুদ্ধির-ছাঁচে-ফেলা বা জোড়াতালি-দেওয়া অ্যালেগরি তো নয়, জীবন্ত প্রতিমা। বুদ্ধিজীবী সমালোচক কিভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন কবি তা জানতেন, তাই বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন লেডি ম্যাক্‌বেথের মতোই তাঁর সুদর্শনা সত্য এবং বাস্তব।[১২] আমাদেরও তাই নিশ্চিত প্রতীতি। কবি বলছেন— যেমন বাইরের জীবনে বহু ঘটনা ঘটে অন্তর্জীবনও তেমনি রুদ্ধ স্থির বা নির্দ্বন্দ্ব নয়: 'the human soul has its inner drama'। কাব্যে নাটকে সেই অন্তর্জীবনই যদি মূর্ত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে (কায়াহীন মায়া বা ছায়াছবি নয়) তাই বা অবাস্তব মনে হবে কেন?

আর, রাজাও সব জীবনেরই জীবনেশ্বর যদিও, নিরাকার কল্পনা হয়ে থাকেন নি, অনুভবেই তো ধরা দিয়েছেন।[১৩] তারই সচল সবাক্ বিগ্রহ তিনি, কোনো দেশে কোনো কালে নিঃশেষে যার নাম রূপ সংজ্ঞার্থ দেওয়া যায় না ; এক দিকে যিনি ভয়েরও ভয়, ভীষণ থেকেও ভীষণ আর অন্য দিকে পরমসুন্দর ও সুচিরমধুর— প্রেম আনন্দ এবং কল্যাণ-স্বরূপ। মানুষী সত্তার অন্তরের রঙ্গমঞ্চে যা সর্বকালে সব রকমেই সত্য, মানুষের সীমাবদ্ধ ভাবে ও ভাষায় কবি তাকে প্রাণ ও শরীর দিতে পেরেছেন এইটেই আশ্চর্য। পূর্বকালের রচনায় যেমন এর তুলনা নেই, এ কালের নাট্যে বা কবিতায় তেমনি এই রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। সুদর্শনা মানবহৃদয়েরই প্রতিমা আবার মান অভিমান আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেমাবেগ নিয়ে অত্যন্ত বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট এক নারীও বটে ; অর্থাৎ, একজন নারী, বিশেষ এক নারী, বিশ্বের সকল নরনারীর অন্তরাত্মা স্বরূপ বা সত্তার যথার্থ প্রতিমা। নারীর আরেক রূপ সুরঙ্গমা ; তার মধ্যেও অবাস্তবতা কিছুই নেই। অন্য সব চরিত্র যদি এক-একটি টাইপও হয়ে থাকে (ঠাকুরদা ও বিক্রমবাহুকে টাইপ বলা যায় কি ?), তাতে এ রচনার নাটকীয়তার ক্ষতি হয় নি।

রাজার প্রথম পাঠ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ও দ্বিতীয় পাঠ (প্রথম মুদ্রণ) দুটিতেই দৃশ্যসংখ্যা বিংশতি। বিশেষ পরিবর্তন এই যে, প্রথম মুদ্রণে প্রথমেই পাওয়া যায় পথের দৃশ্য আর দ্বিতীয় দৃশ্য হল রাজান্তঃপুরের অন্ধকার কক্ষে অদর্শন রাজাধিরাজের সঙ্গে রানী সুদর্শনার মিলন— সে মিলনে রানীর প্রেমতৃষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই, কেননা দু চোখ ভরে দেখতে চান দয়িতকে ; জানেন না সে দেখা সহজ নয়, সে দেখায় ভ্রান্তির অবকাশ আছে, আছে আঘাত ও দুঃখ। প্রথম পাঠে এই দুটি দৃশ্যের বিন্যাস ছিল বিপরীত এবং সেইটেই সঙ্গত। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে যবনিকা-অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দুটি 'ছায়ামূর্তি'র আলাপন অথবা 'অশরীরী' রাজার আবির্ভাব দর্শকদের পক্ষে কি ভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে সমস্যা পৃথক্— হয়তো সঙ্গীতের জাদুতে অসম্ভব

হয় না— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই নাটকের মূল সুরটি ধরিয়ে দেওয়া যায় এভাবে, তার মর্মকথার ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব হয় সূচনাতেই। কাজেই প্রথম-মুদ্রণ-গত পরিবর্তন ত্যাগ ক'রে প্রথম পাঠে ফিরে যাওয়া অহেতু নয়। দুটি পাঠের মধ্যে অন্য যে পার্থক্য তা হল গানের সংখ্যা ও নাটকের সংহতি নিয়ে। প্রথম পাঠে ছাব্বিশটি গান; তার মধ্যে 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', 'আমি কেবল তোমার দাসী', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'অন্ধকারের মাঝে আমার ধরেছ দুই হাতে' গান ক'টি বাদ দেওয়ায় দ্বিতীয় পাঠে গানের সংখ্যা কেবল বাইশটি। এটিও উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পাঠের 'ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ হে ভীষণ' ত্যাগ ক'রে ঠিক সেই স্থলে সেই সুরঙ্গমার কণ্ঠেই দেওয়া হয়েছিল— 'আমারে তুমি কিসের ছলে পাঠাবে দূরে'। কিন্তু অন্তরে অন্তরে যখন সুদর্শনার "শাস্তি শুরু হয়েছে" আর হাল-ভাঙা নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো কোন্ সর্বনাশে ছুটে চলেছে উন্মাদিনী জানা নেই, সেই ক্রান্তিক্ষণের উপযোগী সুর ঐ ভয়েরই আঘাতে ভয় যেখানে ভাঙে, কঠিনের পাদস্পর্শেই কান্ত করুণ কল্যাণকে চেনা যায়। প্রথম পাঠে কুঞ্জদ্বারবর্তী দুটি দৃশ্যে (তৃতীয় ও পঞ্চম) যাত্রীজনতার অংশরূপে ছিল মেয়ের দল; সহজ মানুষ ঠাকুরদার সঙ্গে তাদের ছিল সহাস্য অন্তরঙ্গতা; রূপে রসে বর্ণে ও আনন্দের উচ্ছলতায় উৎসবকে তারা সত্যই উৎসবময় করে তোলে নি কি— প্রথম মুদ্রণে বর্জিত হয়েছে। পঞ্চম দৃশ্যে সুরঙ্গমার সঙ্গে ঠাকুরদার আলাপ সংক্ষিপ্ত ক'রে তার স্থান দেওয়া হয়েছে দৃশ্যের শেষে; রাজবেশী ভণ্ডের সঙ্গে কাঞ্চীর মন্ত্রণা দৃশ্যের মাঝখানে চলে এসেছে শেষ দিক থেকে আর ঠাকুরদার সঙ্গে তার দেখাও হয় না। দ্বিতীয় পাঠে এই-সব পরিবর্তন যেমন পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কমাবার উদ্দেশে (উৎসবামোদী জনতার থেকে মেয়েরা তাই বাদ গেছে) তেমনি সংহতির অনুরোধে, এমন মনে করা যেতে পারে।

অবরেণ্যকে বরণমালা পাঠিয়ে সেই কৃতকর্মের অনুশোচনায়

রাজকন্যা তো পিতৃগৃহে চলে গেলেন, পিতার কাছে পেলেন অনাদর ও তিরস্কার। দশম দৃশ্যের শেষে দেখা যায় দুরন্ত অভিমান যে কথা বলাচ্ছে তাঁর মুখ দিয়ে, মন তা বলছে না— 'তবে তো সে [সুবর্ণ] আসছে! ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না, কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে ... কিন্তু, সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল্ তো! এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না? ... আমি এখানে ... দাসী-গিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো হীনতা আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস?' [১৪]

একাদশ দৃশ্যে অল্প-কিছু কথোপকথন বাদ গেছে।

ত্রয়োদশ দৃশ্যে বন্দীকৃত কাঞ্চীরাজ, অন্যান্য রাজা আর ভণ্ডরাজ সুবর্ণ। স্বয়ংবরের প্রস্তাব এনেছিলেন কাঞ্চী। পরিবর্তিত পাঠ শুধু কাঞ্চীরাজ আর সুবর্ণকে নিয়ে, স্বয়ংবরের প্রস্তাব নেপথ্যেই স্থির হয়ে গেছে।

পরবর্তী দৃশ্যে অনুতাপানলে সুদর্শনার প্রায়শ্চিত্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; স্বয়ংবরসভায় তবু তাঁকে যেতেই হবে, নইলে পিতার প্রাণ-রক্ষা হবে না। বুকের আঁচলে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লুকিয়ে রেখেছেন; মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়েই বলছেন— 'তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু, আমার অন্তরের কথা তুমি কি জানবে না? ... তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে— সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু! সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে আমার কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু আসুক— সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর— তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে— সে তুমিই, সে তুমি।' [১৫]

স্বয়ংবরসভা ছত্রভঙ্গ হল, যুদ্ধ শেষ হল, সুদর্শনা মিছে অপেক্ষা

ক'রে রইলেন— 'এখন আমার রাজা আসবেন কখন্?' রাজা তো এলেন না। অভিমানের জোয়ারের বেগে বুক আবার দুলে ওঠে, কেঁপে ওঠে— 'চাই নে তাকে চাই নে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল! আমার জন্যে একেবারেই না! কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে!' ১৬ এই-যে শেষ 'আমি'টুকু এ যেন কিছুতেই ছাড়া যায় না, সুরঙ্গমার মতো আত্মনিবেদনে নত হয়ে বলা যায় না 'আমি কেবল তোমার দাসী'। সুরঙ্গমাকেও তাই সহ্য করা যায় না— 'যা যা চলে যা— তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্চে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না! বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে রেখে দিয়ে চলে গেল!'

তার পরে সুদর্শনাকে তো পথে বেরোতেই হল। যে পথে ঠাকুরদা চলেছেন, পথই তাঁর আপন। কাঞ্চীও চলেছেন আত্মনিবেদনের কাঙাল। সুরঙ্গমা চলেছে আর রানীও চলেছেন ধূলিধূসর অভিসারে— পথের ধূলিতেই তাঁর অঙ্গরাগ— ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে আজ ধূলোমাটিতেই মিলন হচ্ছে, এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই।

সব-শেষের দৃশ্যটি আবার সেই অন্ধকার ঘরেই। শুধু সুদর্শনা আর রাজা। রাজা বললেন— 'আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।'

এখানেই রাজা নাটক শেষ হল, মধুর রসের ব্যঞ্জনায় আর বৈষ্ণবসাধনার নিগূঢ় তত্ত্বে শুধু নয়— বাউলের প্রাণের কথা, বিশ্বসংসারে সহজের সন্ধান, যুগপৎ প্রেম আর মুক্তির বার্তা, সবেরই ইঙ্গিতে আভাসে ব্যঞ্জনায়। রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন বৈষ্ণব আর বাউল— জ্ঞানের, প্রেমের, মুক্তির সাধক।

ইচ্ছা না থাকলেও, প্রয়োজনে যাঁই থাক্ (পাঠক পাঠিকার [illegible]

নয় রাজা অরূপরতন এটুকু ধ'রে নিতে হয়), তবু মূল ঘটনাধারার আমরা আনুপূর্বিক অনুসরণ করলেম। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে কী তফাত, কেন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া' ছাপায় 'হয়তো কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে'— তারও সাধ্যমত আলোচনা করা গেল।

অরূপরতনের প্রথম প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। ··· অন্তরের নিভৃত কক্ষে ··· তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না, নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল ··· দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল ··· হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই; যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় —এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই নাট্যরূপকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— পুনর্লিখিত।'

সংক্ষিপ্ত করার যে ঝোঁক থাকায় প্রথম থেকে দ্বিতীয় পাঠের উদ্ভব, বলা যায়, অরূপরতন (১৩২৬) তারই পরবর্তী পরিণতি। আশ্চর্যের বিষয় মনে হতে পারে রাজাধিরাজ রাজা এ নাটকে নেই; তাঁকে চোখে যেমন দেখা যায় না তাঁর স্বরও শোনা যায় না—অথচ তিনি সব সময় সর্বত্রই আছেন এ কথাও সত্য। রাজা না থাকায় অন্ধকার ঘরের দৃশ্য আদি-অন্তে কিম্বা মধ্যেও নেই। 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো / ধনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে দলে দলে গো'— গানের দলের এই গানেই নাটকের সার্থক প্রস্তাবনা। 'আমি আমার রাজাকে চোখে দেখতে চাই' সুদর্শনার এই অন্ধ আবেগ ও আকুতিতে তার

সূচনা। 'ঐ সূর্য উঠল ··· আজ আমার অন্ধকারের দ্বার খুলেচে' এই আন্তরিক প্রত্যয়ে তার শেষ আর গানের সুরের অনিঃশেষ এই ব্যঞ্জনা : 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে!' গান আছে এই নাটকে উনচল্লিশটি,[১৭] এজন্য গানের দল, বাউলের দল, বালকের দল আর পাগলের প্রয়োজন; আর, ঠাকুরদাও অবশ্যই গানে গানে উচ্ছল। আশ্চর্য এই যে, গীতমূর্তিমতী সুরঙ্গমার কণ্ঠে একটি গানই কেবল শুনি: 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।'[১৮]

সংক্ষিপ্ত হয়েছে কিনা গজ-ফিতের না মেপেই বলা যায় সংহত হয় নি এই নাট্যরূপ, হয়তো সাধারণভাবে অভিনয়যোগ্যও হয় নি। বস্তুতঃ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মিথ্যা বলেন নি— 'কবিতা গল্প উপন্যাসের লেখক সম্পূর্ণ নিজের মতো করে লিখতে পারেন। ··· কিন্তু নাটকের বেলা লেখকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। কাদের নিয়ে নাটক করানো হবে ··· দেখবে কারা ··· ভেবে দেখতে হয়। প্রযোজনার নানা সুবিধা অসুবিধা বিচার করে নাটক করতে হয়।'[১৯]

তা হলে আমাদের জানা দরকার অরূপরতনের এই রূপটির কী উপলক্ষ্যে আর কেমনভাবে উদ্ভব এবং প্রযোজনা। রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে যতদূর জানা যায়— '১৩৩১ সালে কোলকাতায় ১৩২৬ সালের অরূপ-রতন অবলম্বন করে একটি মূকাভিনয় করা হয়। ···বিদ্যালয়ের মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন। পিছন থেকে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে গান গেয়েছিলেন। কিন্তু গান অনেক কমে যায়, গুরুদেব কেবল আবৃত্তি করেছিলেন।'[২০] অপিচ রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন— 'কবি তখন সুররাজ্যের মধ্যে বাস করিতেছেন ··· গানগুলি মূকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। এই অভিনয়ের দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও একটু নাচের আমেজ দেখা না গিয়াছিল তা নয়। ··· কাঠিয়াবাড়ের ও গুজরাটের লোকনৃত্যের স্পর্শ তাহাতে ছিল'[২১] এবং 'ছিল একটুখানি 'তাও বাংলানো' নৃত্যপদ্ধতি।'[২২]

তথ্যগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গানে জোয়ার এসেছে যেমন

স্বতউদ্‌বেল অন্তরের আবেগ থেকে, নৃত্যে গানে আবৃত্তিতে নূতন রসরূপসৃষ্টির নানা পরীক্ষাও করে দেখছেন কবি (প্রযোজনাকালে গানের সংখ্যা কিন্তু কমাতে হয়েছে), সুতরাং অভিনেতব্য সাধারণ নাটক তো নয়ই, এমন-কি শারদোৎসব ডাকঘর অচলায়তন ফাল্গুনী যতটা চরিত্র ও ঘটনাঘাত -ময় তাও নয়— বিশেষ ক'রেই ভাব ভাষা ও সুরের ইন্দ্রজাল, নৃত্যের ছন্দে ছন্দে অপরূপ বা অরূপ'কেই রূপ দিতে উৎসুক। অভিনয়গত এর যাকিছু সফলতা বিশেষ করে সেই সুর ও ছন্দের গুণেই। রঙ্গমঞ্চে উৎসবপতি কবির প্রত্যক্ষ উপস্থিতিও সামান্য ঘটনা নয় আর সামাজিকগণও বিশিষ্ট। এই-সব বিবেচনা করে আমাদের মনে হয় অরূপরতন (১৩২৬) হয়তো সাধারণ-ভাবে অভিনেতব্য নাটক নয়, অথচ রীতিমত গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যও নয়— রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য তখনো কারণলোকে বা অপ্রকটিত কবিকল্পনায়।

বহু পাঠভেদ ও বিচিত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও রাজা ও অরূপরতন বস্তুতঃ একই নাটক এ কথা মনে রাখা ভালো। কবির জীবনকালে রাজা/ অরূপরতনের সর্বশেষ মুদ্রণে (অরূপরতন ১৩৪২) শেষ পাঠ প্রথমেরই কাছাকাছি এসেছে, অথচ যথাসম্ভব সংক্ষেপীকৃত ও সংহত হয়েছে। কতখানি সংক্ষিপ্ত ও সংহত এতেই কতকটা বোঝা যাবে— যে ক্ষেত্রে রাজার উভয় পাঠেই কুড়িটি দৃশ্য ছিল, এ ক্ষেত্রে (তেমনি ১৩২৬ মাঘের অরূপরতনে) ছয়টির বেশি নয়। পাত্রপাত্রী ও ঘটনা -সংস্থানের দিক দিয়ে প্রথম পাঠের অনুসৃতি এই দেখা যায়— অরূপরতনের প্রথম মুদ্রণে সাক্ষাৎভাবে রাজাধিরাজের উপস্থিতি জানা যায় না, রাজার দ্বিতীয় পাঠে (প্রথম মুদ্রণে) অন্ধকার ঘরেই নাটকের সূচনা হয় না আর উৎসবক্ষেত্রে মেয়েরা অনুপস্থিত— বর্তমানে প্রথম পাঠের অনুসরণে রাজা সাক্ষাৎভাবেই শ্রুতিগোচর, অন্ধকার ঘরের দৃশ্যে নাটকের সূচনা (প্রথমপ্রচারিত অরূপরতনের গীতপ্রস্তাবনা, অবশ্য, যথাস্থানে আছে) আর মেয়েরাও বসন্তোৎসবে যোগ দিয়েছে। পার্থক্য কি নেই? তাও আছে— নাটকের সূচনায় আর শেষে রাজা উপস্থিত

থাকলেও মাঝের কোনো দৃশ্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটে নি, রোহিণী চরিত্র বর্জিত, মন্ত্রীসহ কান্যকুব্জরাজও 'পাদপ্রদীপের আলোয়' সামাজিকের সামনে আসেন নি। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সংহতির উদ্দেশে এত সব পরিবর্তন / পরিবর্জন করলেও, গানের সংখ্যা কমিয়ে দিলেও (প্রথম পাঠের তুলনায় বিশেষ কমে নি),[২৩] নাটকের চরিত্রই বদলে যাবে এমন নয়। কিন্তু, বিশেষ ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন কিছু হয়েছে স্থান কালের অভিনব সংঘটনে আর সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা চরিত্রের অভিব্যক্তিতে। সূক্ষ্ম বলেই হয়তো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, আসল পার্থক্য কোথায় ঠিক বুঝতে পারি নে। 'আমাদের' পক্ষে বুঝতে না পারার বিশেষ একটি হেতুও আছে— হয়তো রাজা বা অরূপরতনের যে রূপেই মনোনিবেশ করতে যাই অন্যান্য রূপও মনের নেপথ্যে জেগে থাকে, অদৃশ্যপ্রায় হয়েও সমুপস্থিত বিষয়ের ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ কোনো একটি পাঠ বিচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন -ভাবে গ্রহণ করা বড়ো কঠিন হয়ে পড়ে। সে যাই হোক, এই বিশেষ ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন কী এবং কেমন করে ঘটল জানতে হলে, রাজা-অরূপরতনের অসম্পূর্ণ যে-দুটি পাঠের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে-দুটির আলোচনা অপরিহার্য।

জাপানি খাতায় অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির ছিয়াশি পৃষ্ঠা আর ছাপাখানার কালিমালাঞ্ছিত বর্জিত ('cancelled') একুশখানি পাতা, উভয়ই কবির নিজের হাতের লেখায় ; যথাক্রমে এদের পাণ্ডুলিপি ও প্রেস-কপি ব'লেই উল্লেখ করা যাক্। পাণ্ডুলিপির বিশেষত্ব হল এইগুলি—

১ রাজাধিরাজ ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষচরিত্র দেখা যায় না। যিনি রাজার রাজা তিনি তো অদৃশ্যই, শুধু তাঁর কণ্ঠ শোনা যায়। বাণীমূর্তি তাঁর। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা'র মতো আর-একখানি নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন যা শুধু মেয়েদের দিয়েই অভিনীত হবে— প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে কোনো পুরুষচরিত্রের অবতারণার প্রয়োজন থাকবে না।

সুদর্শনা

~~[illegible]~~ আমাকে কোথায় যেতে হবে?

সুরঙ্গমা

কোথাও না, এইখানেই।

~~[illegible]~~ সুদর্শনা

এইখানেই? সে কি কথা? তুমি যে বললে কোন্ অন্ধকারের মধ্যে তিনি আমাকে নিতে আসবেন। প্রথমটা শুনে ভালো লাগে নি, তার পরে ভাবলুম, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার — এমন তো কারো কখনো হয় না। এই জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। কিন্তু সেই অন্ধকারের সভা কি এইখানেই? কোথাও যাত্রা করে যেতে হবে না?

সুরঙ্গমা

হাঁ, এইখানেই। এই যা অন্ধকার সে তাঁর দিক থেকেই।

সুদর্শনা

এইখানেই তো চিরদিনই আছি। ~~এইখানেই~~ যদি তেমনিই ~~[illegible]~~ থেকে যাই, তাহলে কী হল? লোকেই বা কী বলবে?

সুরঙ্গমা

এখানে থাকবে কি কোথায় যাবে সে কথা তো মোটেই ভেবো না। যুদ্ধ আরম্ভ হয় ঘরের মধ্যেই, পরে হয় তো বাইরে বেরোতে হবে। এখনো থাকতে কে বলতে

সুদর্শনা

সেই ভালো, যা হবে, তাতে আমায় লাগবে। রাজার ঘরে এমন দেখানো ভালো হয় না। কিন্তু আমার মন উতলা হয়ে উঠেচে। কখন সময় আসবে?

সুরঙ্গমা

তুমি যখনি চাইবে, সময় সেই মুহূর্তেই হবে।

সুদর্শনা

আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করচে না।

সুরঙ্গমা

কোরো না দেরি। তাঁকে ডাকলে, এখনি এইমাত্রই তিনি তোমাকে দয়া করবেন।

সুদর্শনা

কিন্তু সাধনা কি?

সুরঙ্গমা

ইচ্ছে করো তো সাধো।

২ ঘটনাস্থল কান্যকুব্জরাজগৃহে আর সুদর্শনাও কুমারী কন্যা।

৩ সুরঙ্গমা কোথা থেকে এল কেউ জানে না আর সেও বলে না। রাজা তাকে কারাগারে পাঠিয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, শৃঙ্খল পরে সে ভূষণের মতো— রাজমহিষীর মুখের কথায় এ-সব জানা যায়। মহিষী তাকে ভয় করেন আর ভক্তি না করেও পারেন না।

৪ রাজাধিরাজের প্রসঙ্গে কুমারী সুদর্শনাকে সুরঙ্গমাই আকৃষ্ট এবং উতলা করেছে। আবার এও বলেছে, 'কাঞ্চীরাজের মতো রাজার [বিবাহের] প্রস্তাব তোমার মতো রাজকন্যারই যোগ্য।' কেননা, সবার যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি অতুলনীয়, তাঁকে পাওয়ার গৌরব আছে বটে কিন্তু কেউ জানবে না, কোনো সমারোহই হবে না; ঘোষণা মানেই আত্মঘোষণা— তাতেই অপমান। সুদর্শনা বলেন— 'তবে কোথায় আমায় যেতে হবে?'

'কোথাও না, এইখানেই।'

'কখন সময় আসবে' তারও উত্তর— 'তুমি যখনই চাইবে।'

বুঝতে বাকি থাকে না সুদর্শনার রাজা আছেন সব সময় সর্বত্র। তাঁর আলাদা কোনো রাজ্য নেই, সেই নিখিল ভুবনাধীশ আছেন হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে। যে আলোয় তাঁকে দেখা যাবে, আপনি জ্বলে ওঠে নি ব'লেই তাঁকে দেখা হয় না।

৫ রাজমহিষীর পার্শ্বচারিণী রোহিণী, হিসাবী বুদ্ধি তার— সুরঙ্গমার বিপরীত। সুরঙ্গমার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ তার প্রচুর।

৬ কাঞ্চীরাজ শৌর্যশালী রাজা, কান্যকুব্জে দূতী পাঠিয়েছেন সুদর্শনার পাণি প্রার্থনা ক'রে। সুবর্ণ তাঁর পার্শ্বচর বিদূষক, তাকে রাজাধিরাজ সাজিয়ে তাঁর ছলনা আর সুদর্শনা-হরণের মন্ত্রণা —এ-সব পাঁচজনের মুখে-মুখে জানা যায়।

৭ সুবর্ণকে চেনে সুরঙ্গমা। অথচ রাজাধিরাজ-জ্ঞানে তাকেই মালা পাঠালেন সুদর্শনা। ভুল ধরা পড়তেই এল আত্মধিক্কার। আগুন লাগল প্রাসাদে। রাজকন্যা সেই জ্বলন্ত পুরীতে প্রবেশ করলেন।

৮ 'অন্ধকার হয়ে গেল'। সুদর্শনাকে রক্ষা করেন রাজার রাজা, আশ্বাস দেন ভয় নেই। — 'ভয় নেই কিন্তু লজ্জা! সে যে আগুন হয়ে আমাকে ঘিরে রইল। ··· আমি অশুচি, তোমার কাছে থাকলে আত্ম-গ্লানি আমাকে অস্থির করবে।' সুদর্শনা তাই পালাতে চান। কোথায় পালাবেন সর্বময় রাজার অধিকার ছেড়ে? থাকতেও চান— 'কেশের গুচ্ছ ধরে আমাকে টেনে রেখে দাও-না। আমাকে মারো, মারো আমাকে। ··· রাখলে না! আমাকে বাঁধলে না! আমি চল্লুম।' তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন— 'রাজা! রাজা!' সুরঙ্গমা বলে তিনি চলে গেছেন।— 'চলে গেলেন? আচ্ছা বেশ! তা হলে আমাকে ছেড়েই দিলেন! আমি ফিরে এলুম। তিনি অপেক্ষা করলেন না! ভালোই হল! আমি মুক্ত! সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু বলেচেন?'

'না, কিছুই বলেন নি।'

'আচ্ছা, ভালো, আমি মুক্ত।'

'কী করতে চাও তুমি?'

'এখন কিছুই জিজ্ঞাসা কোরো না— কিছুই ভেবে পাচ্চি নে।'/

পাণ্ডুলিপিতে এর বেশি লেখা হয় নি। পাণ্ডুলিপি আর প্রেস-কপি (যতটা পাওয়া যায়) উভয়ের মধ্যে এই-সব মিল আর অমিল—

১ ঠাকুরদা, প্রতিহারী, কান্তিকরাজ (কান্যকুব্জ), এই পুরুষ চরিত্রগুলি প্রেস-কপির পাঠে প্রত্যক্ষ।

২ পূর্বের মতোই ঘটনাস্থল কান্যকুব্জ, সুদর্শনা কুমারী কন্যা। রোহিণী-সহ রাজমহিষীর ভূমিকাও বর্জিত হয় নি।

৩ সুরঙ্গমা চরিত্র যতটা মুখ্য হয়ে উঠেছিল পূর্বপাঠে, কিছুটা কমানো হয়েছে।

৪ কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব সুদর্শনা প্রত্যাখ্যান করলে রাজমহিষী ভয় পেলেন কিন্তু কান্তিকরাজ কন্যাকে বাধ্য করতে চাইলেন না, মরণপণ ক'রে যুদ্ধে গেলেন।

সুদর্শনা

ওগো সেইজন্যেই আমার মন তো বেশি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আমি অসম্পূর্ণ, তোমার কাছে থাকলে এই অসম্পূর্ণতা আমাকে অস্থির করে।

রাজা

আচ্ছা বন্ধুর আমার দূরে চলে যাও।

সুদর্শনা

অমন করে ছেড়ে যাও কেন? জোর করে ধরে আমাকে বেঁধে রেখে দাও না। আমাকে মারো, মারো আমাকে। আমাকে কিছু বোঝানো যে আরো অসহ্য হচ্ছে।

রাজা

কিছু বোঝাচ্ছি নে, কে বললে তোমাকে?

সুদর্শনা

অমন করে নয়, অমন করে নয় — চীৎকার করে, গর্জন করে — আমার কানে যেন সব শব্দ কথা ডুবিয়ে দিয়ে। এত সহজে আমাকে ছেড়ে দিয়োনা, যেতে দিয়োনা।

রাজা

ছেড়ে দেব কিন্তু যেতে দেব কেন?

সুদর্শনা

যেতে দেবে না? আমি যাবই।

রাজা

আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা

দেখো, তাহলে আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে, রাখলে না। আমাকে ঠেকালে না। আমি চললুম। তোমার প্রহরীদের বলো, আমাকে ঠেকাক।

রাজা

কেউ ঠেকাবে না। ছিন্ন মেঘ ঝড়ের মুখে যেমন চলে যায়, তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা

ক্রমেই জোর বেড়ে উঠছে — এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়ত ডুবব, কিন্তু আর ফিরব না।

প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

রাজা রাজা।

সুরঙ্গমা

তিনি চলে গেছেন।

সুদর্শনা

চলে গেছেন? আচ্ছা বেশ! তাহলে আমাকে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম তিনি অপেক্ষা করলেন না। ভালোই হল —

খণ্ডিত প্রেস-কপির আবিষ্কৃত প্রথমাংশে এই তো দেখা যায়। অনাবিষ্কৃত অবশিষ্টাংশে কী ছিল বলবার উপায় নেই, কতটা তার কিভাবে মুদ্রিত গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে (অথবা হয় নি) সে জল্পনা-কল্পনা নিরর্থক। পাণ্ডুলিপি এবং প্রেস-কপির সঙ্গে উত্তরকালীন এবং প্রায়-সমকালীন (?) অরূপরতনের মিল কতটা আর অমিল কতখানি সেটাই বিশেষ দ্রষ্টব্য—

১ বাংলা ১৩৪২ সনের অরূপরতনে প্রথম দৃশ্যটি প্রায় যথাযথ প্রেস-কপি থেকে নেওয়া হয়েছে; অন্য দিকে পাণ্ডুলিপির প্রথম ও তৃতীয় দৃশ্য মিলিয়ে, কিছু অংশ ত্যাগ ক'রে প্রেস-কপির এই প্রথমাংশ।

২ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশ নিয়ে— যাতে রাজবাড়ির মেয়েরা, সুনন্দা, কমলিকা, সুরোচনা, বসন্তোৎসবে আমন্ত্রণ করছে রাজমহিষীকে — প্রেস-কপির দ্বিতীয় অংশ; এটি গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

৩ গ্রন্থের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' গানের পূর্বেই মেয়ের দলের মধ্যে ঠাকুরদা, এটুকুই প্রেস-কপির তৃতীয় অংশ বলা যায় আর পাণ্ডুলিপিরও চতুর্থ দৃশ্যের একাংশ। প্রভেদ এই যে, পাণ্ডুলিপিতে ঠাকুরদার স্থানে ছিল সুরঙ্গমা।

৪ পাণ্ডুলিপি ও প্রেস-কপির রাজমহিষী ও রোহিণী চরিত্র, প্রেস-কপির কান্তিকরাজ চরিত্র, পূর্বেই বলা হয়েছে গ্রন্থে এগুলি বর্জিত। রাজমহিষী বা রোহিণীর কোনো প্রসঙ্গই নেই আর নাটকে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হন না কান্যকুব্জরাজ।

৫ খণ্ডিত প্রেস-কপিতে দৃশ্যবিভাগ পরিষ্কার করে দেখানো হয় নি। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতেও 'প্রথম দৃশ্য' (পৃ ১১-২৮) শুধু পাওয়া যায়, আর-সব অনুমানসাপেক্ষ, সেইভাবে— রাজমহিষী ও রোহিণীকে নিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য (পৃ ১-১১ ও ২৯-৪৮), 'ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে' সুদর্শনা সুরঙ্গমা ও রাজাকে নিয়ে তৃতীয় দৃশ্য (পৃ ৪৯-৫৪), উৎসবক্ষেত্রে সুদর্শনা সুরঙ্গমা রোহিণী এবং আরো অনেককে নিয়ে চতুর্থ দৃশ্য ('ওগো জানচ? রাস্তা কোন্ দিকে' ইত্যাদি

পৃ ৫৫-৮০), শেষ কয়টি পৃষ্ঠায় (পৃ ৮০-৮২) 'অন্ধকার হয়ে গেল' — এর বিষয়বস্তু তো পূর্বেই আলোচিত। পাণ্ডুলিপি বা প্রেস-কপির সমুদয় দৃশ্যই কান্যকুব্জে, কুমারী সুদর্শনার পিতৃরাজ্যে। প্রশ্ন এই যে, পরিবর্তিত অরূপরতনে কোথায় ঘটছে ঘটনাগুলি ? মোট ছয়টি দৃশ্যের কোনোটিই যে কান্যকুব্জ রাজপুরীর বাইরে বা কান্যকুব্জের সীমানা পেরিয়ে বহু দূরে —এমন মনে হয় না।

৬ সর্বোপরি সুদর্শনাও কুমারী কন্যা -রূপেই প্রথম দেখা দিয়েছেন এই গ্রন্থে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনার যোগ্য। 'রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়' প্রায় এই কথাতেই নাটকের সূচনা। কিছু পরে— 'ঐ আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা'। দ্বিতীয় দৃশ্যে কাঞ্চীরাজ বিক্রমবাহু 'কান্তিক-রাজকন্যা' ব'লেই সুদর্শনার উল্লেখ করছেন, পুনশ্চ 'রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই'— তদুত্তরে সুবর্ণও বলে 'রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন-না'। পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে ছিল রানী সুদর্শনাকে দেখবার জন্য রাজাদের লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র; তিনি পতিকুল ত্যাগ করে পিতৃগৃহে গেলে বিক্রমবাহু ও অন্যান্য রাজাদের কান্তিকনগর বা কান্যকুব্জ রাজ্য -আক্রমণ। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু হয় নি; কেবল ভণ্ডরাজ সুবর্ণকে নিয়ে মন্ত্রণা হচ্ছে করভোদ্যানে আগুন লাগাবার। করভোদ্যান কান্যকুব্জেই হতে বাধা নেই। ঠিক পরের দৃশ্যে সুদর্শনা বলছেন— 'আমি হব রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।' এই দৃশ্যেই সুদর্শনার আহ্বানে প্রতিহারীও বলছে— 'কী রাজকুমারী ?' পরবর্তী চতুর্থ অঙ্কে প্রথম দৃশ্যের প্রথমেই নাগরিকদলের প্রস্থানের পরে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ; কেবল এখানেই দেখি সুরঙ্গমা বলছে— 'মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে' ইত্যাদি। এটুকু পূর্ব পূর্ব মুদ্রণের অনুরূপ। অথচ এই দৃশ্যেই কান্তিকরাজ বন্দী হওয়ার খবর এলে সুরঙ্গমার মুখে আবার শুনি— 'কী রাজকুমারী !' পূর্বের মুদ্রণ-গুলিতে সুদর্শনাকে সব সময়েই সুরঙ্গমা 'মা' অথবা 'রানীমা' বলে

সম্বোধন করেছে। ফলতঃ কুমারী সুদর্শনা কোন্ ক্ষণে রাজাধিরাজের রানী হয়ে উঠলেন অন্তরে অন্তরে— কোনো অনুষ্ঠানই তো হয় নি— এ নাটকে কোথাও তা বলা হয় নি; হয়তো সেই 'অভাব' বা 'অসংগতি'-টুকু আমাদের বুদ্ধিকেও পীড়া দেয়। (তীব্র দুঃখদহনের কোন্ সুদুঃসহ প্রক্রিয়ায় অবশেষে রাজাধিরাজের যোগ্য হয়েছেন সুদর্শনা, সে আমরা জানি।) পূর্বোক্ত দৃশ্যে আছে 'আমার আর হবে না দেরি' গানটির পূর্বে— 'সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন, হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, এও সেইরকম'। আর শেষ দৃশ্যে আছে— 'আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমায় দেখতে চেয়েছিলুম'। বলা যেতে পারে এ দুটি উক্তির কোনোটিরই সূক্ষ্ম হিসাব মিলত না রসিকের মনে, রাজা-অরূপরতনের অন্য রূপ এবং অন্য পাঠও যদি 'মগ্নমানসে' না জাগত তাঁর।[২৪]

রাজাধিরাজের রাজ্য কোথায় পূর্বে জানা ছিল না আমাদের, এখন নিশ্চিত জানা গেল— সবখানেই। রাজকন্যাকে পিতৃরাজ্যের বাইরে তো যেতে হবে না। বিবাহ হল কবে? পিতা তো দান করেন নি কন্যাকে; রাজকন্যা নিজেই জেনে না-জেনে কখন্ বরণ করেছেন রাজার রাজাকে। অগ্নিমণ্ডলের মধ্যেই দেখেছেন দুর্দর্শ রূপ, তার পর সেই 'কালো' কখন্ আলো হয়ে উঠেছে অন্তরে; দুঃখ পাপ তাপ অভিমান আত্মগ্লানি সবই অলক্ষ্যে ঘুচে গেছে, মুছে গেছে।[২৫]

জাপানি খাতায় লেখা অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আর-একটুকু বলা দরকার। খাতাখানি কবির কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বলেই লেখা সম্পূর্ণ হয় নি এমন নয়। বস্তুতঃ রচনা সম্পূর্ণ হতে চায় নি বলেই খাতাখানি কন্যা শ্রীমতী মীরাদেবীকে দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ হয় নি বা হতে চায় নি কেন?—

১ বহুদিনের রচনা বহুবার অভিনয়ও হয়েছে, তাতে এতখানি পরিবর্তন চলে কি যাতে তার মূল চরিত্রই বদলিয়ে দেয়?— প্রকৃতি না হলেও প্রকরণ হয় একেবারে আলাদা?

২ জাপানি খাতাখানিতে দেখা যাবে— সুরঙ্গমার চরিত্র কতটা প্রধান হয়ে উঠেছিল, আর 'নটীর পূজা'র শ্রীমতীর ছায়াপাতও হয়েছিল কখন্ অলক্ষে অজ্ঞাতসারে—ধনঞ্জয় বৈরাগীর সজাতীয়া, ভগিনী বা দুহিতা ব'লে মনে হয় নি এমন নয়— এ ব্যাপারটি এক সময় কবির কাছেও ধরা পড়ে আর অবাঞ্ছিত মনে হয়। সুদর্শনাই এ নাটকের নায়িকা, সুরঙ্গমাকে নায়িকার থেকে মুখ্য করে তোলা তো চলে না।

৩ সমস্ত পুরুষ চরিত্র বাদ দিতে গিয়ে (রাজাধিরাজের কথা স্বতন্ত্র) যে মানসিক কসরতের প্রয়োজন হয়েছিল এ ক্ষেত্রে, তাতে কিছু কি কৃত্রিমতা এসে যায় নি? প্রতিভা অঘটনঘটনপটিয়সী হলেও, সর্ব অবস্থায় সমান সাচ্ছন্দ্য তার হয়তো থাকে না।

৪ পাণ্ডুলিপিতে রাজমহিষী চরিত্র আর তাঁকে ঘিরে অন্যান্য নাটকীয় ব্যাপার, তেমনি প্রেস-কপিতে কান্যকুব্জরাজ ও রাজমহিষী, শেষ পর্যন্ত উপস্থিত প্রসঙ্গের পক্ষে অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত মনে হয়েছিল। প্রথমে তাই কমিয়ে দিয়েছেন, পরে সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন। ঘটনার প্রবহমাণ ধারাকে যা বেগবান করে তোলে না, পৃথক রচনা হিসাবে তা যত সুন্দরই হোক, নাট্যকল্পনায় তাকে নির্মমভাবে ত্যাগ না করে উপায় কী?

শেষ পর্যন্ত নাটক হিসাবে (রূপকনাট্য বা গীতিনাট্য হিসাবে নয়) রাজা / অরূপরতনের প্রথম ও শেষ এই দুটি পাঠই বিশেষ আদরণীয় মনে হয়, তার মধ্যেও কোন্‌টিকে বেছে নেব সে বিচার নির্ভর করবে কোন্ নাটকে— রাজা (১৩২৬) বা অরূপরতন (১৩৪২) কোন্ গ্রন্থে— সুদর্শনা চরিত্র সব থেকে সমুজ্জ্বল হয়ে, বাস্তব হয়ে, সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে, তারই নির্ণয়ে। কবির কথার প্রতিধ্বনি করে পুনর্বার বলি— সুদর্শনা 'সীম্বল' অথবা 'অ্যালেগরি' নয়, টাইপ নয়, সব-নারী হয়েও বিশিষ্ট এক নারী, যেমন কুমু সুচরিতা বিমলা অথবা দামিনী। যেমন ইতিহাস-বিদিত মীরাবাঈ।

সীম্বল বা অ্যালেগরি হওয়ার অনিবার্যতা কোথায়? মীরাবাঈ

ঐতিহাসিক চরিত্র, তাঁকে ঘিরে ছিল বাস্তব সংসারের বিচিত্র নরনারী। কেবল 'গিরিধরনাগর'ই স্বতন্ত্র, সকলের কাছেই অদৃশ্য, অবাস্তব, কল্পনা, এক মীরা আর মীরার মতোই অধ্যাত্মপথের পথিক যারা তাদের কথা বাদ দিলে। মীরার জীবনই যে নাটকের উপজীব্য, তাকেও রূপককাব্য বলা যাবে কি ?

রাজা ও অরূপরতন সম্পর্কে যা-কিছু বক্তব্য আমাদের, এখানেই শেষ হল কি ? না। সামগ্রিকভাবে রাজা ও অরূপরতনের বিচার বিশ্লেষণে বোধ করি এটুকু বলা চলে যে, সুদর্শনা সুরঙ্গমা সব সময়েই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হলেও, তাদের ভাব অনুভব আচার আচরণ চরিত্রের অলৌকিক তাৎপর্য গ্রহণে অরূপরতনের পরিকল্পনা যতটা অতর্কণীয় এবং অনুকূল, রাজা তেমন নয়। লৌকিকের ভিতরে অলৌকিকের দ্যোতনা অরূপরতনেই (১৩৪২) আরো নিখুঁত, সুন্দর, সম্পূর্ণ।[২৬]

'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন··· প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল··· সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে··· নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস[২৭] দেখা দিল 'বউঠাকুরানীর হাট' গল্পে— একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্প বয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি।'— পরিণত বয়সে এই কথাতে রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরানীর হাট' বইখানি লেখার ইতিবৃত্ত দিয়েছেন আর যে মূল্য নির্দেশ করেছেন তাতেও বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখান নি, বরং তার বিপরীত। বাংলা ১২৮৮-৮৯ সনে এ রচনা ধারাবদ্ধভাবে যখন ভারতীতে প্রকাশ পাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি-একুশ আর বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও বয়স বেশি নয়। বঙ্কিমের অধিকাংশ গল্প উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আর তৎকালীন অন্য গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রতিভার ব্যবধান

দুস্তর। সে হিসাবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই নূতন উদ্যমের প্রশংসনীয়তা অল্প নয়। আর, অযাচিতভাবে একখানি চিঠি লিখে বঙ্কিমচন্দ্রই সে প্রশংসা করেছিলেন; অনুজ সাহিত্যিককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বলা যায় তাঁর মধ্যে মহৎ ও বৃহৎ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে। বউঠাকুরানীর হাটে বঙ্কিমের প্রভাব তো আছেই প্লট-আশ্রিত গল্প বলার কৌশলে আর চরিত্রচিত্রণেও,[২৮] তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। নূতন প্রতিভার চমৎকারজনক স্বাক্ষরও আছে, কবিত্ব কল্পনা ও চিত্রাঙ্কনের বহু চারুতা ও সূক্ষ্মতা। বঙ্কিমের পরে ভাব-ভাষার এতখানি শ্রী ও সৌষ্ঠব সেদিন আর কারো লেখনীতেই এমনভাবে ফুটে ওঠে নি। সে কথা থাক্। বউঠাকুরানীর হাট গল্পের প্লট আর 'সজীব পুতুল' ব'লে উনোক্তি করা হয়েছে যাদের নিয়ে সেই-সব চরিত্র, কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে সেটুকুই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়। প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণের পরিণতি কোন্ দিকে সে আলোচনা পরে।

বউঠাকুরানীর হাট যে নাটকে পরিণত হল তার নানা কারণই ছিল। ঘটনা ও চরিত্রের বৈচিত্র্যে তথা ঘাত-প্রতিঘাতে নাটক হয়ে থাকে। সেই গুণ বঙ্কিমের উপন্যাসে নেই কি? দুঃখের বিষয় তিনি নিজে নাটক লেখেন নি; অন্যে তাঁর গল্পগুলি নাটকে পরিবর্তিত করে মঞ্চস্থ করেছিলেন যেমন স্বাভাবিক আকর্ষণে তেমনি একান্ত প্রয়োজনেও বটে। যথাকালে বউঠাকুরানীর হাটেও তাঁদের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়েছিল এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। জানা যায় খ্যাতিমান অভিনেতা 'রাধারমণ করের আগ্রহে ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিতে কেদারনাথ চৌধুরী' 'রাজা বসন্ত রায় নাম দিয়ে এই গল্পের এক নাট্যরূপ প্রণয়ন' করেন— ঠিক কোন্ সময়ে জানা না গেলেও, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[২৯] কেননা, ঐ সময়ে উপন্যাসখানির যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় তার আখ্যাপত্রে নামের সঙ্গেই ছাপা হয়েছে— (রাজা বসন্ত রায়)। / উপন্যাস। / বস্তুতঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১৯৪৫) গ্রন্থেও বলেছেন— ৩ জুলাই ১৮৮৬ তারিখে 'ন্যাসন্যাল' রঙ্গমঞ্চে 'রাজা বসন্ত রায়'এর অভিনয় এবং ৬ এপ্রিল ১৯০১ তারিখে 'মিনার্ভা'য় তার পুনরভিনয় হয়েছিল। অবশ্য, অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে অন্য সময়ে অভিনয় হয় নি তা নয়; বিশেষ সাফল্যে অভিনীত হয়েছিল সেও নিশ্চিত। কেননা, ১৩০২ জ্যৈষ্ঠের 'অনুশীলন ও পুরোহিত' মাসিক পত্রে লেখা হয়— 'এমারেল্ডে ··· "রাজা বসন্ত রায়ের" অভিনয় বরাবর উত্তমই হইয়া থাকে। বসন্ত রায়, উদয় সিংহ, সুরমা, বিভা ইত্যাদি প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অংশ সুচারুরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। বসন্ত রায়ের অভিনয় সর্ব্বোত্তম। ··· বহু পূর্ব্বের অভিনেতা [মাধুকর বা] রাধামাধব করের অভিনয় যাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন [যেমন অক্ষয়চন্দ্র সরকার] তাঁহাদের ইহা তেমন ভালো লাগে না। ···আমরা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা রাধামাধব বাবুর বসন্ত রায়ের অভিনয় দর্শনে বঞ্চিত। ··· ইঁহার ··· অভিনয় দেখিয়াই সুখ পাইয়াছি।' ইত্যাদি। কাজেই ১২৯৩ আষাঢ় থেকে ১৩০৭ চৈত্র অবধি ন্যূনাধিক পনেরো বৎসরও যদি মাঝে মাঝে অভিনয় হইয়া থাকে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে আর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতো বিশিষ্ট সজ্জনও বারবার দেখতে এসে থাকেন, তবে এ নাটক যে লোকপ্রিয় হয়েছিল তাতে সন্দেহ করা চলে না। হাস্য করুণ মধুর রস, অপ্রত্যাশিত বা চমৎকারজনক ঘটনা, সুমধুর সংগীত ও সুন্দর সাজসজ্জা— লোকপ্রিয় হবার উপায় উপকরণ যথেষ্টই ছিল। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবী শেষ বয়সে স্মরণ করেছেন— 'বাইরে নাটক দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না; কেবল একবার স্টার থিয়েটারে রাজা বসন্ত রায় ··· দেখতে গিয়ে বুড়ো বসন্ত রায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলুম মনে পড়ে।' [৩০]

মনে হয় রাজা বসন্ত রায় নাটকে বসন্ত রায় চরিত্রই প্রাধান্য পেয়ে থাকবে। কবি-কৃত প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও বিশেষ ন্যূনতা ঘটে নি, তবে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে এর একটি সার্থক জুড়ি মিলেছে। [৩১] রাজকুলে জন্মলাভ সত্ত্বেও বসন্ত রায়ের যে স্বাভাবিক পরিণতি, স্বভাবে

যেমন তেমনি সচেতন সাধনাতেও ধনঞ্জয় তারই পরিপূর্ণ বিকাশ। ধনঞ্জয়ই প্রায়শ্চিত্ত নাটকে নূতন সৃষ্টি।

যা হোক, কেদারনাথ চৌধুরী 'রাজা বসন্ত রায়' নাটক রচনা করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র 'দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিতে' এ কথার অর্থ, অবশ্যই, কবিরও অসম্মতি ছিল না— তবে সহযোগিতা কতদূর ছিল সে কথা জানা যায় না।[৩২] বক্ষ্যমান গল্পে নাট্যবস্তু যখন যথেষ্ট আছে, পেশাদার থিয়েটারি লেখকের প্রযত্নে নাট্যীকৃত হয়েও তার সমাদরের কোনো অভাব হয় না। ফলে, কোনো-একসময় রবীন্দ্রনাথ নিজে এই গল্পের আধারে নূতন একখানি নাটক লিখতে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন এ হয়তো স্বাভাবিক। অন্যের সীমিত কল্পনায় বা মর্মজ্ঞতায় আর অনিপুণ হস্তক্ষেপে যে সার্থক রূপান্তরের আশা হয়তো করাই যায় না, কবিপ্রতিভার পুনরভিনিবেশে ও যত্নে সেটি অপেক্ষাকৃত সহজেই সিদ্ধ হতে পারে।

তবু, ১২৮৮-৮৯ সনে গল্পের ধারাবাহিক প্রকাশ আর ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে তার রূপান্তর (১৩১৬ বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ), মধ্যে দুই যুগেরও বেশি ব্যবধান। এ সময়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা পূর্ণ, পরিণত। নাটক-রচনার বিশেষ কী উপলক্ষ্য ঘটেছিল কোথাও তার ঘোষণা নেই। অথচ এ নাটকে বউঠাকুরানীর হাট গল্পের অতিরিক্ত নূতন যে উপাদান আছে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাঁর দল-বল নিয়ে, তাতে অবশ্যই মনে হয় যে, সারা দেশে যে আবেগ-উত্তেজনার আব-হাওয়া ছিল তৎকালে, ঐকান্তিক দেশপ্রেম গুপ্তহত্যাকেও উপায় বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি বরং অন্তরে অন্তরে গৌরবই বোধ করেছিল, তারই প্রতিবাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছিল কবির মনে, দেশের যথার্থ কল্যাণকামনায় তার প্রয়োজনও বোধ করেছিলেন। আর, এই সময়েই দূর সিন্ধুপারে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের নূতন প্রয়োগ শুরু করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, "সত্যের পরীক্ষা", তারও বার্তা, তার সূক্ষ্ম প্রভাব ও প্রেরণা, তার অন্তর্গূঢ় অভিনন্দন নূতন এই বৈরাগীর বাণীতে

তথা গানে গানে বিঘোষিত। রবীন্দ্রনাথ দেশের লোকের বিরাগভাজন হয়েও নানা প্রবন্ধে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন স্পষ্ট ভাষায়, নাটকেও তাই তো বলা হয়েছে। উগ্র স্বাদেশিকতা তাঁর কোনোদিনই ছিল না, রাজনীতিতে উদার মানবিক নীতির কোনো বালাই নেই আর ক্ষেম প্রেমের শাশ্বত ধর্ম অনায়াসেই লঙ্ঘন করা চলে, উপায় অতিক্রম করে যায় উদ্দেশ্যকে, এমন কখনো তিনি মনে করেন নি। তৎকালীন নানা ঘটনায় অবশ্যই তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তরুণ বয়সেও বাংলার প্রতাপাদিত্য তাঁর 'হিরো' ছিলেন না। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে তাই এ নাটকের কল্পনা।[৩৩] এটি দুই যুগ আগে লেখা উপন্যাসের আধারে এখনকার নূতন এক রচনা ; এর আসল বক্তব্যটি অভিনব।[৩৪]

হিংসা দ্বেষ বলদর্প বিষয়বাসনা এগুলি দুর্বুদ্ধি আর দুর্বুদ্ধিই পাপ, অবুদ্ধি আর দুর্বলতাও পাপ— প্রতাপ ও রামচন্দ্রের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এঁদের আত্মজন প্রাণ দিয়ে কিম্বা মরণাধিক মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য করে। প্রতাপাদিত্যের বা রামচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় নাটকে তা দেখানো হয় নি বটে, তবু 'কর্মফল' যদি সত্য হয় সেও কোনো কালে কোনো আকারে সুনিশ্চিত এমন মনে করা যেতে পারে। একের কর্মফলে অন্যে দুঃখ পায় কেন, চিরন্তন এ জীবন-জিজ্ঞাসার কোনো জবাব হয়তো নেই। কিম্বা, এ সংসারে 'আমরা কেউ যে একলা নই',[৩৫] বিচ্ছিন্ন নই, আর চরম দুঃখেরও পার আছে— সার্থকতা আছে— এইমাত্র বলা যায়। দুঃখেই দুঃখের শেষ নয়, যে প্রাণ খুলে বলতে পারে 'আমি / মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে / তোমার / ভয় ভাঙা এই নায়ে'[৩৬] সে'ই দুঃখের পারে গিয়ে অন্তরে স্থায়ী সুখ ও শান্তি লাভ করে এই তত্ত্ব সাকার হয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর জীবনে ও জীবনদর্শনে। (রাজা বসন্তরায়ও স্বভাবতঃ এই পথের পথিক)। এজন্যই এই নাটকে বৈরাগীর অবতারণা। নূতন এই বৈরাগীর বিশেষ ধর্ম নয় সংসারবিমুখ বৈরাগ্য, কিন্তু আপন প্রাণের ঠাকুরের অনুরাগে সকল মানুষে আর সর্বভূতে অনাসক্ত অনুরাগ।

ব্যক্তিবিশেষ, বসন্তরায় বা উদয়াদিত্য, স্বভাবতঃ যেরূপ আচরণ করেন, শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা সচেতনভাবেই সব সময় তার প্রয়োগ হতে পারে সমষ্টিজীবনে— এ কারণেই মাধবপুরের বা শিবতরাইয়ের[৩৭] সরল নিরভিমান প্রজাদেরও ডাক পড়েছে।

উপন্যাসের মতোই নাটকেও উদয়াদিত্য ও সুরমাকে নিয়ে গল্পের সূচনা। প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যহত্যা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, রমাই ভাঁড়ের অশালীন আচরণে জামাতার প্রতি তাঁর ক্রোধ, রামচন্দ্রের কোনো প্রকারে প্রাণ নিয়ে পলায়ন, 'ওষুধ' করার ফলে সুরমার মৃত্যু, রাজ্যলোভে উদয়াদিত্য বুঝি ষড়যন্ত্র করছেন এই ক্ষীণ সন্দেহে তাঁর কারাবরোধ, ভাইয়ের দুঃখের দিনে বিভার স্বামীগৃহে যেতে অস্বীকৃতি ও রামচন্দ্রের আক্রোশ, কারাগার থেকে উদয়াদিত্যকে উদ্ধার করে বসন্তরায়ের রায়গড়ে পলায়ন, প্রতাপ-কর্তৃক তাঁর প্রাণদণ্ড-বিধান, রাজ্যত্যাগী মর্মাহত উদয়ের ভগিনীকে নিয়ে চন্দ্রদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা, সেখানে সেদিন আরেক বিবাহের আনন্দোৎসব, সংগীত ও দীপাবলি, সব-শেষে নৌকার মুখ ফিরিয়ে উদয়াদিত্য বিভা রামমোহন ধনঞ্জয় সকলেরই হিন্দুর শিবস্থান মুক্তিতীর্থ বারাণসী-উদ্দেশে প্রয়াণ—মূলের এই গল্পধারার নাটকেও কোনোরূপ পরিবর্তন বা ব্যাঘাত উৎপাদন করা হয় নি। মাধবপুরের প্রজাদের নিয়ে বা একাকী ধনঞ্জয় এই নাটকের আদ্যন্তে গানে কথায় আচরণে কবির অভিনব বক্তব্যের মূল সুরটি ধরিয়ে দিচ্ছেন শুধু— সপ্রেমে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করে দুঃখতরণের কী কৌশল, মুক্তির কোন্ পথ, তাই নির্দেশ করে চলেছেন। মুক্তিদাতা হরি, দয়াময় প্রেমময় ভগবান, কী বিচিত্র তাঁর লীলা! বৈরাগী বলেন— 'কী আনন্দ! তোমার একি আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছ।' বিভাকে বলেন—'দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে। ... চল্ চল্! পা ফেলে চল্! খুশী হয়ে চল্! হাসতে হাসতে চল্! রাস্তা এমন্ পরিষ্কার করে দিয়েছে— আর ভয় কিসের!'

পাপের ফল যেমন দুঃখ, প্রায়শ্চিত্ত তেমনি স্বেচ্ছায় সানন্দে দুঃখবরণে ; পরিণামে মুক্তি, যে দুঃখবরণ করে তার যেমন, যে দুঃখ দেয় তারও নয় কি ! এটুকুই প্রায়শ্চিত্ত নাটকের মর্মের কথা, নূতন সুর। বিভাকে দেখে মনে পড়ে আর-এক রাজকন্যার কথা যিনি গেয়ে উঠেছিলেন আনন্দে, আবেগে—

মীরাকে প্রভু গিরিধরলাল
অওর ন কোঈ !

সানন্দে সচেতনভাবে সকলেই এ কথা বলতে পারে না সত্য, তবু বলতেই হয়। ভুল করলেও ভুলের সংশোধন অবশ্যই হয়। সে তো আমরা রানী সুদর্শনাতে দেখেছি। সত্যলোকে আর বাস্তব সংসারে কাহিনী একই।

বউঠাকুরানীর হাট গল্পে উদয়াদিত্য-সুরমার এক কাহিনী, বিভা-রামচন্দ্রের আর-এক কাহিনী, রাজা বসন্তরায়ের প্রতিহত স্নেহের দুঃখবেদনার কাহিনীও অপ্রধান নয়— এই ত্রিধারা বা দুই ধারাই একত্র বয়ে চলেছে। সুরমা আর বসন্তরায়ের মৃত্যুতে এক-একটি ধারা শেষ হয়ে অবশেষে বিভার দুঃখকাহিনীই বাকি থাকে, চরম আশাভঙ্গে সেই ধারারও সমাপ্তি— সাগরসঙ্গমে মুক্তি কি না সে কথা জানা যায় না।

রুক্মিনী তথা মঙ্গলাকে নিয়ে উদয়াদিত্যের জীবনে আর আনুষঙ্গিক ঘটনাধারায় হয়তো অনাবশ্যক জটিলতাই সৃষ্টি করা হয়েছিল গল্পে ; নাটকে একেবারে সেটি বর্জিত। রাজমহিষীর দাসী 'ওষুধ' ব'লে বিষ এনে দিয়েছে বটে কোন্ মঙ্গলা ডাইনির কাছ থেকে— তার নাম আছে, পরিচয় নেই।

গল্প যেমন ধীরে সুস্থে রসিয়ে এবং ফলিয়ে বলা চলে, বিশেষ মুহূর্তের দ্যোতক বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনায় ভয় বিষাদ ঔদাস্য আর শিহরণ জাগানো চলে, নাটকে তার সুযোগ নেই তা বলাই বাহুল্য। আকারে ইঙ্গিতে অল্প কথায় এমন-কি অর্ধোচ্চারিত শব্দে বা অসম্পূর্ণ বাক্যেই অনেক সময় গূঢ় গভীর মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

গল্পের নাটকীয় সেই বিবর্তন মনোযোগী পাঠক পদে পদে লক্ষ করবেন, বিস্তারিত আলোচনার সম্ভাবনা অথবা প্রয়োজনও নেই। গল্পের পরেই নাটকটি পড়তে গেলে আরো-একটি উপলব্ধির স্বতই উদয় হবে— বিভা এবং উদয়াদিত্য দুজনেরই চরিত্রের বিশেষ পরিণতি হয়েছে, ব্যক্তিত্ব স্ফুটতর। এমন-কি, স্বভাবনির্বোধ রামচন্দ্রেরও কিছুটা বয়স অবশ্যই বেড়েছে। আরো অনেকের সম্বন্ধে এ কথাই বলা চলে। প্রত্যেকে বিশেষ ব্যক্তি, সজীব পুতুল কেউই নয়। প্রতাপাদিত্য 'আদর্শ' চরিত্র না হলেও, উচ্চাভিলাষী অভিমানী ও বলদর্পী রাজা হিসাবে যথোচিত।

বিভার বিষাদকরুণ অপরিণামী জীবন নিয়ে মূল কাহিনীটি দ্বিধা-বিভক্ত নয় এই নাটকে। অন্যান্য ঘটনা ও চরিত্র নানা ভাবে তার সঙ্গে সুসম্বদ্ধ। নানাভাবে, অর্থাৎ এই ট্র্যাজেডির হেতু ও পরিণাম -রূপে কিম্বা পরিবেশ-রূপে।

প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণের অন্তর্বর্তীকালে মুক্তধারার রচনা, নাটক হিসাবে তার জাত আলাদা— আলোচনা পরে করাই সংগত হবে। প্রায়শ্চিত্তের আরো পরিচ্ছন্ন ও পরিণত রূপ হল পরিত্রাণ। ১৩৩৪ সনের শারদীয়া বসুমতীতে প্রচার। পুরাতন রচনার রূপান্তর হলেও জাত্যন্তর হয় নি।

পরিত্রাণে তেইশটি দৃশ্য / এক অঙ্ক বর্জিত বা বিভিন্ন দৃশ্যে সংবৃত; তাই প্রায়শ্চিত্তের তুলনায় বহুগুণে সংহত এ কথা চোখ বুজেই বলা যায় কিন্তু বিশেষ পর্যালোচনারও বিষয় বটে।[৩৮]

পূর্বের মতো উদয়াদিত্য ও সুরমাকে নিয়ে এর প্রথম দৃশ্য নয়, ধনঞ্জয় ও মাধবপুরের প্রজাদের নিয়ে এর সূচনাটি নূতন পরিকল্পনা। এই রাজপথের দৃশ্যেই বসন্তরায় আর হত্যাব্যবসায়ী পাঠানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকার— প্রায়শ্চিত্ত নাটকের তৃতীয় দৃশ্য এইভাবে পরিত্রাণের প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত আর বহুগুণে সংহত। প্রতাপাদিত্যের দুরভিসন্ধি অন্যের অগোচর এবং এ ক্ষেত্রে বিভারও তা জানবার অথবা

জানাবার কারণ ঘটে নি। ঘটনাচক্রে মনিবের হুকুম তামিল করা অসম্ভব দেখে পাঠান নিজে থেকে সব স্বীকার করেছে; উদয়াদিত্যকে এ দৃশ্যে আনবার কোনো প্রয়োজন হয় নি। প্রায় সমধর্মী বসন্তরায় আর ধনঞ্জয়ের মিলনে সূচনাতেই এ নাটকের মূল সুরটি ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ ঘটেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যেই প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের ব্যাপার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে সংহতভাবে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত যেমন প্রায়শ্চিত্তের প্রথম দৃশ্য, তেমনি 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' গাইতে গাইতে বসন্তরায়ের প্রবেশে পঞ্চম দৃশ্যের পরিবর্তিত কিয়দংশ আর একাদশ দৃশ্যেরও পরিবর্তিত পরিবর্ধিত বিষয়-বস্তুর সন্নিবেশ। জামাতা রামচন্দ্রকে যশোরে আনার উদ্যোগপর্ব এ নাটকে নেই; তাঁর সঙ্গে রমাই ভাঁড় এসে রাজমহিষীকে অশোভন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে এবং বিভা রামমোহনকে ডেকে অন্তঃপুর থেকে তাকে বহিষ্কারও করেছে এই সংবাদ নিয়েই পরিত্রাণের তৃতীয় দৃশ্যের মাঝখানে হঠাৎ লজ্জিতা ভীতা বিভার প্রবেশ, উদয়াদিত্য ও সুরমার সঙ্গে পরামর্শ ও প্রস্থান, অধিকতর উত্তেজিত হয়ে পুনঃপ্রবেশ—কেননা, নির্বোধ রামচন্দ্রের দল রমাইয়ের ধৃষ্টতার কাহিনী ইতিমধ্যে নিজেরাই প্রচার করেছে আর মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরও কানে উঠেছে।

প্রায়শ্চিত্তের আলোচনায় আমরা পূর্বেই বলেছি বউঠাকুরানীর হাটের বহু পাত্রপাত্রী 'পুতুলের ধর্ম' সর্বথা পরিহার করে জীবৎসত্তা আর স্ফুটতর ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঐ নাটকে দেখা দিয়েছে — নেহাতই কাল-ধর্মে সাহিত্যস্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই যেন ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমান নাটকে আরো যে পরিবর্তন তা মূল চরিত্রের বিবর্তন বলা চলে, আরো বিস্ময়কর। পূর্বোক্ত দৃশ্যে বিষয়বস্তুর নূতন বিন্যাসের অবকাশে বিভার বাক্যে ও আচরণে তা সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ নির্বোধ স্বামীর অবিবেচনায় ও বিদূষকের স্থূল বেয়াদবিতে লজ্জিতা ও মর্মাহতা বিভা নিজে যথোচিত তার প্রতিবিধান করেছে রমাইকে বিদায় করে। দ্বিতীয়তঃ কুলগরিমার বোধও তীব্র, এজন্যই প্রতাপাদিত্য যখন তাকেই

জিজ্ঞাসা করলেন জামাতার অপরাধের জন্য তার প্রাণদণ্ড দিলেও সেটা কি অন্যায় হবে, বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে তবু উচ্চারণ করল— 'না।' এই স্বল্পাক্ষর একটি কথায় তার কতটা দুঃখ বেদনা লজ্জা ও হতাশা আর আত্মনিগ্রহ তা নিঃশেষে বলা যায় না— দৃঢ়তাও। এই দৃশ্যেই দেখি প্রতাপাদিত্য জেদী অথচ অপদার্থ ব'লে পুত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন না, উপেক্ষার যোগ্য নয় উদয়াদিত্য— প্রকারান্তরে শিক্ষা অথবা শাস্তি দেবার অভিপ্রায়ে জামাতা সম্পর্কে নির্মম দণ্ডাদেশ শুনিয়ে দিয়ে তাঁর উপরেই ভার দিলেন অন্তঃপুররক্ষার। উদয় বললেন — 'পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই ... তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ... আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।' প্রতাপ বলেন— 'লোক থাকবে আমার কিন্তু দায় থাকবে তোমার।' উদয় দৃঢ়ভাবে বলেন— 'আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারব না।' 'না পারো তো তারও জবাবদিহি আছে' ব'লে রুষ্ট প্রতাপ চলে গেলেন এবং দাদামশায়ের উদ্‌বেগপ্রকাশে কান না দিয়ে উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে রক্ষার চেষ্টায় উদ্যোগী হলেন।

প্রায়শ্চিত্তের সপ্তম নবম ও ত্রয়োদশ দৃশ্য পরিত্রাণ নাটকে বর্জিত। সপ্তমে ছিল চন্দ্রদ্বীপে চাটুকারপরিবৃত রামচন্দ্র রায়ের 'রাজসভা' আর রমাইয়ের স্থূল ভাঁড়ামি— যতটা স্থূল করে লেখা আমাদের কবির পক্ষে সম্ভব। নবমে যশোর-রাজপ্রাসাদে বিভার কক্ষে রামমোহনের উপস্থিতি, মোহনের কণ্ঠে রাজমহিষীর আগমনীর গান শোনা, বিভার সুখে বসন্তরায় আর সুরমার আনন্দকৌতুক। ত্রয়োদশে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা— কিভাবে রামচন্দ্রকে রক্ষা করা যায়— ভীত রামচন্দ্র, ক্রন্দনমুখী বিভা, উতলা উদ্‌বিগ্ন বসন্তরায় আর উদয়াদিত্য, এ দিকে নির্ভীক রামমোহন— সে'ই শেষে উপায় একটা উদ্ভাবন করেছিল। অনাবশ্যক অথবা অসংগত বোধ হওয়ায় পরিত্রাণে এ-সবই বর্জিত। এখন পরিত্রাণের এই তৃতীয় দৃশ্যে বিভাতেও যেমন দৃঢ়তা ও ধৈর্য দেখি, উদয়েরও তেমনি স্থিরবুদ্ধি ও নিশ্চিত সংকল্প, পলায়নের উপায়-

উদ্ভাবনে বা আয়োজনে নাটকের বেশি জায়গা জোড়ে নি— বস্তুতঃ দণ্ডাদেশ-ঘোষণার পূর্বেই উভয়ের নির্দেশে রামমোহনকে দিয়েই তার ব্যবস্থা এগিয়েছে। রামমোহন গেল যখন তখনি বিভা ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। বসন্তরায় বলেন— 'দিদি, ভয় করিস নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে তোর ভয় নেই রে!'

'ভয় না, দাদামশায়, লজ্জা! ছি ছি কী লজ্জা! ... জন্মের মতো আমার যে মাথা হেঁট হয়ে গেল। ... অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। ... এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।'

কার্যকালে মাপ চায় নি, সেও আমরা দেখেছি। অথচ স্বামী তার জীবনসর্বস্বই। কী ধাতুতে এই নারীচরিত্রের গঠন তা কল্পনা করা যেতে পারে— হিন্দুঘরের যে মেয়ে শান্ত অশঙ্কিত-চিত্তে স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতারোহণ করে, এ সেই মেয়েই বটে।

প্রায়শ্চিত্তের দশম দ্বাদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দৃশ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্রাণের চতুর্থ দৃশ্যেই সংগৃহীত। স্থান যশোররাজের অন্তঃপুর। পুনঃ পুনঃ বিপদের সংকেত এসে রামচন্দ্রের নাচ-গানের আসর ভেঙে গেল। 'বাতিগুলো নিবে আসচে', বাদকেরা ঢুলছে, 'গা ছম্‌ছম্‌ করছে', একটা না-জানা আতঙ্কের আবহাওয়া, নটীরা বলাবলি করছে 'আমাদের কয়েদ করল নাকি'— রাজমহিষী বুঝছেন না 'মোহন' কোথায় গেল, প্রহরীরা কোথায়, এ মহলে ও মহলে দরোজা বন্ধ কেন— এই অবস্থায় রামচন্দ্র কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলেন আর প্রতাপাদিত্যের উদ্যত রোষ গিয়ে পড়ল উদয়াদিত্য ও সুরমার উপর— এইখানেই চতুর্থ দৃশ্য তথা প্রথম অঙ্ক শেষ হল।

আসন্ন বিপদের কালো পটভূমিতে অচিরস্থায়ী প্রমোদের সমুজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্র, এ থেকে উপস্থিত সামাজিকগণের চিত্তে যে বিশেষ উপলব্ধির শিহরণ- পরিত্রাণে দৃশ্যসমাবেশের পরিবর্তনে তা অনায়াসে সিদ্ধ হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তে এরূপ ছিল না ; দুটি দৃশ্যের স্থলে অনেকগুলি

দৃশ্যেরই প্রয়োজন হয়েছিল।

পরিত্রাণের পঞ্চম দৃশ্যে (দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে) মাধবপুরের পথে ধনঞ্জয় ও প্রজাদল। অভয়ের দ্বারা ভয় আর প্রেমের দ্বারা হিংসা জয় করতে হয়— 'অর্ধেক রাজত্ব প্রজার', রাজার উপরেও যে রাজা আছেন শেষ পর্যন্ত তাঁর দরবারে দীন দুর্বলের ন্যায়বিচারের আবেদন গিয়ে পৌঁছয়—বৈরাগী এই কথা বোঝাতে চান তাঁর অনুগত ভক্তদের। উদয়াদিত্য তাদের হৃদয়ের রাজা, প্রতাপাদিত্যকে তারা মানবে না, অথচ সামনে এসে দাঁড়ালেই ভয়ে ভক্তিতে নত হয়ে পড়ে— তখন রাজায় আর ফকিরে হয় বোঝাপড়া। প্রতাপ ঠিকমত বুঝতে পারেন না, ধনঞ্জয়কে কয়েদ করে উপস্থিত সংকটের সমাধান করতে চান। প্রায়শ্চিত্তের ষোড়শ দৃশ্যে যা আছে এখানেও তাই, তবে সূচনা থেকে উদয়াদিত্যের প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে মুক্তধারা থেকে গৃহীত। পঞ্চম দৃশ্যের এই প্রথমাংশে গান আছে— 'আরো আরো, প্রভু, আরো আরো', 'আমরা বসব তোমার সনে', 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে', 'কে বলেছে তোমায়, বঁধু, এত দুঃখ সইতে'। তুলনার্থে বলা যায় মুক্তধারায় চতুর্থ গানটি নেই এবং দ্বিতীয় গানের সাদৃশ্যে আছে 'ভুলে যাই থেকে থেকে'— দ্বারকাধীশের দ্বারে বৃন্দাবনের গোপ-গোপীর সহজ সরল সুরের আবেদন মনে পড়ে বৈকি।

পরিত্রাণের ষষ্ঠ দৃশ্যে প্রায়শ্চিত্তের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সংহত। বিষৌষধিতে সুরমার মৃত্যুর পরে উদয়াদিত্য রাজপুরী ত্যাগ করে যাবেন, নীচে মাধবপুরের প্রজাদের কলরব শুনে বলেন— 'ওদের বিদায় করে দিয়ে আসি গে।'

বর্তমান সপ্তম দৃশ্যে আর প্রায়শ্চিত্তের উনবিংশে প্রভেদ অল্পই। 'আমাদের মালক্ষ্মী কোথায় গেল রাজা? আমাদের দয়া করেছিল বলেই সে গেল' ইত্যাদি কয়েক ছত্র বর্জিত।

অষ্টম দৃশ্যে প্রায়শ্চিত্তের একবিংশ চতুর্বিংশ ষড়্‌বিংশ সপ্তবিংশ আর ত্রিংশ দৃশ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ সংকলিত আর এরই মাঝামাঝি

রামমোহন তার মাকে নিতে এসে— ভাই কারাগারে, বিভা যেতে চাইলেন না— হতাশাক্ষুণ্ণ-মনে ফিরে চলেছে। সীতারামের দল কারাগারে আগুন লাগালো। উদয়াদিত্য মুক্ত হয়েও অন্যদের বিপদের জালে জড়িয়ে পালাতে রাজী হলেন না— 'যদি পালাই মুক্তি আমার ফাঁদ হবে'। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের তুলনায় এতেই তাঁর চরিত্রের বিশেষ পরিণতি ও অপ্রমত্ততা পরিস্ফুট হল। গল্পের জালটিও অনর্থক জটিল হয়ে উঠল না। কেননা, বসন্তরায়ের রাজ্যে ফেরা হল না; রায়গড়ে তাঁর হত্যার ব্যাপারও সম্পূর্ণ বর্জিত হল। কারাগার-থেকে-মুক্ত ধনঞ্জয়ের গান শোনা গেল— 'আগুন আমার ভাই'। প্রতাপাদিত্য সবিস্ময়ে দেখলেন এ মানুষ কারাগারের রুদ্ধদ্বার আর লোহার গরাদের ভিতরেও মুক্ত, বুঝলেন না 'গারদে এত আনন্দ কিসের' ('মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ'), জিজ্ঞাসা করলেন— 'এখন তুমি যাবে কোথায় ?'

'রাস্তায়।'

তাই শুনে বলতেই হল— 'বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।'

এ-সবই প্রায়শ্চিত্তেও আছে কিন্তু বহু পূর্বের উপন্যাসে কল্পনাই করা যায় না। তাই বলতে হয় প্রতাপাদিত্য-চরিত্রেরও কিছু পরিণতি অবশ্যই হয়েছে। যা হোক, দেখা গেল উদয়াদিত্য ধরা দিতেই ইচ্ছুক। প্রতাপাদিত্য বিস্মিত হলেন— 'কী, তুমি যে মুক্ত দেখি ?'

'কেমন করে বলব মহারাজ! কারাগার পুড়লেই কি কারাবাস যায় ?'

'তুমি যে পালিয়ে গেলে না ?'

'মেয়াদ না ফুরোলে পালাব কী করে ? মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ সেটা যখন নিজে ছিন্ন করে দেবেন, সেই দিনই তো ছাড়া পাব।'

রাজপুত্র স্বেচ্ছায় সকল স্বত্ব ত্যাগ করে রাজত্ব হতে অব্যাহতি

চাইলেন। পূর্বের নাট্যপ্রযোজনায় 'দাদামশায় কোথায় দাদা' ('দাদামহাশয় কেমন আছেন') বিভার এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। এখন উদয়াদিত্য বললেন— 'এখনি দেখা হবে।'

প্রতাপাদিত্য— 'না, দেখা হবে না। কোনোদিন না। ···তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব ··· তোমাদের ভাববার কথা নয়!'

উদয়াদিত্য— 'না হতে পারে কিন্তু এই বলে গেলুম, মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল পুণ্যের ; সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদামশায় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।'

প্রতাপাদিত্য—'এখন এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।'

প্রায়শ্চিত্তের দ্বাবিংশ পঞ্চবিংশ অষ্টাবিংশ আর ঊনত্রিংশ দৃশ্য সংগত কারণেই বাদ গিয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চবিংশের ক্ষুদ্র পরিসরে, কারাগারে আগুন লাগাবার পূর্বে, উদয়াদিত্যকে দেখা গিয়েছিল। অন্য দৃশ্যগুলি ছিল রায়গড়ের — প্রথমতঃ সীতারাম যুবরাজকে মুক্ত করবার মন্ত্রণা নিয়ে খুড়ো-মহারাজের কাছে গিয়েছিল, যুবরাজ মুক্ত হয়ে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্তমনে দাদামহাশয়ের সঙ্গে গেলেন, উদয়কে ধরে আনবার এবং বসন্তরায়কে হত্যা করবার পরোয়ানা পাঠানো হল মুক্তিয়ারের হাতে— এই সমুদায় ঘটনা আসল নাট্যব্যাপারকে অহেতু বাহুল্যে কতকটা শ্লথ বা শিথিল করে তুলেছিল মাত্র। পরিত্রাণে যুবরাজ স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়াতে সে-সবই অবান্তর ও অনাবশ্যক হয়ে উঠল।

পরিত্রাণে নবম দৃশ্যের সূচনা বরবেশী রামচন্দ্র আর পুরাতন বিংশ দৃশ্যের আদি-অন্ত-বর্জিত অল্প একটু নিয়ে ; সেই সঙ্গে যুক্ত ত্রয়োবিংশ দৃশ্যের শেষাংশ আর দ্বাত্রিংশ। দৃশ্যশেষে নূতন গান— 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'।

দশম বা শেষ দৃশ্যে প্রায়শ্চিত্তের একত্রিংশ আর ত্রয়স্ত্রিংশ দৃশ্য সামান্য পরিবর্তনে গৃহীত। চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে নৌকা ভিড়ল বটে— ময়ূরপংখি সাজানো, দীপাবলি জ্বলছে, বাঁশি বাজছে, সবই বুঝি প্রত্যাশিত, যথোচিত। না, ঐ ময়ূরপংখি, ঐ আলো, ঐ গান, কিছুই বিভার জন্য নয়— আর-এক রানীর আগমনীতে।

বিভা—'আর-এক রানী?'

রামমোহন— 'হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।'

বিভা— 'ওঃ! আজ বিবাহের লগ্ন!' শেষ আশাভঙ্গের এ দুঃখের কোনো ভাষাই নেই।

রামমোহন কেঁদে ওঠে— 'অমন চুপ করে রইলে কেন মা? কেমন করে কাঁদতে হয় তাও কি ভুলে গেলে?'

এর পরেও স্বামীসন্দর্শনে যেতে চেয়েছিল বিভা কাঙালিনির মতো পায়ে হেঁটে, মোহন যদি সঙ্গে না'ও যায়। কিন্তু যাওয়া হল না। উদয়াদিত্য সামনে আসতেই মনে পড়ল দুস্ত্যাজ্য কুলগৌরব— 'আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।'

মোহন সত্য বলেছে— 'মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ, আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। ··· সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারালো।'

এর পরেই বৈরাগীর প্রবেশ ও গান—

'আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর,
ফিরব না রে!'

যাত্রার গান, অভয়ের গান, মুক্তির গান, হয়তো মৃত্যুঞ্জয় আনন্দের গানে কোনোদিন কোনো লোকে শেষ হবে।

'আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম— শেষ হয়ে গেছে,

তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয়বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই। সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে [তেমনি বিভাকে] এতে পাবে না।' ৪ মাঘ ১৩২৮ —ভানুসিংহের পত্রাবলী। পত্র ৪৩

'পথ' নিশ্চয়ই কালভৈরবের পরিক্রমাপথ, যে পথে নিরন্তর চলার সূত্রেই এ নাটকের সকল নরনারীর জীবন গ্রথিত। 'পথ' থেকে 'মুক্তধারা' অবশ্যই আরো অর্থদ্যোতক, শ্রুতিমধুর, কিম্বা অভিনব; পরে সেই নামেই নাটকটি ১৩২৯ বৈশাখের প্রবাসীতে প্রচারিত।

কবি বলে দিয়েছেন ধনঞ্জয় ব্যতীত পুরাতন পরিচিতের আর কেউ নেই। ঠিকই। তবে ধনঞ্জয়ের সঙ্গের সাথিরা আছে গণেশ-সর্দার-সমেত; মাধবপুর থেকে এসে উত্তরকূটের সীমানায় শিবতরাইয়ে বসবাস করছে। আর, প্রতাপাদিত্য বসন্তরায় রাজসচিব এঁরাও নামন্তর এবং জন্মান্তর গ্রহণ করেছেন এই নাটকে। সুরমা এবং বিভা নেই নাট্য-ব্যাপারের ভিতরে এ কথা সত্য; তবে সকালে অভিজিতের পূজার আসনের পাশে শ্বেতপদ্মটি গোপনে যে সাজিয়ে রেখে যায়, জানতে দেয় না সে কে, না-দেখা না-জানা পুষ্পের সৌরভে যেমন হয়— তার অস্তিত্বের অনুভবেই আমাদের উন্মনা করে দেয় না কি? 'এই-যে তার পূজার ফুলগুলি এখনো শুকায় নি, সকাল বেলার পুজোর পরে ··· দিয়ে গেল, তখন তার মুখে দেবীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিলুম'[৩৯]— সে ছিল বিভা, আর এ যেন আত্মনিবেদিতা উমার মতো কুমারী সুরমা, অথবা কী নাম তাও তো জানি নে।

সে কথা যাক্। 'পথ' শব্দটি এবং বস্তুটি রবীন্দ্রমানসে বিশেষ অর্থদ্যোতক সন্দেহ নেই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাট্যে পথ এবং মেলার দৃশ্য কতবার ফিরে ফিরে এসেছে, কবির তরুণ বয়সে শিলাইদা সাজাদপুর পতিসরে পল্লী-বসবাসের স্মৃতির সঙ্গে কিভাবে জড়িত রয়েছে, সুধীজন[৪০] তার আলোচনা

অবশ্যই করেছেন। কিন্তু 'মুক্তধারা' আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ; আরো বেশি ব্যঞ্জনা ঐ কথাটিতে —সকলেই স্বীকার করবেন। পথের অবারিত বুক বেয়ে বিশ্বের নরনারী রাত্রদিন চলে আর ঝর্ণার ধারা, শতধারার মিলনে বেগবান নদীর প্রবাহ, সে যে নিজেও ক্ষণমাত্র থেমে থাকতে পারে না —নিরন্তর চলার, সর্বসত্তা আর সর্বাঙ্গ দিয়ে চলার সেই তো সার্থক প্রতিমা। সে তৃষ্ণা মেটায়, জীবনদান ও অন্নদান করে। সেই মুক্তধারাকে কয়েদ করা মহাপাপ, মহা-অপরাধ। অবরুদ্ধ ধারার মোচন সেই তো বীরের ব্রত, সমাজের সেবা, শিবের আরাধনা।

প্রায়শ্চিত্তে মুক্তধারায় অন্তরের মিল কোথায়, সম্পর্ক কিসের, সেটি বিচারের বিষয়। এমন যদি হয় যে প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গবিশেষ ছিন্ন করে নিয়ে মুক্তধারায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা হলে সেটি বাহ্যিক যোগ মাত্র, অন্তরের মিল নয় — মুক্তধারাকে প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তন বা বিবর্তন বলাই বৃথা। আসলে, যে সমস্যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে প্রায়শ্চিত্তে আকার পরিগ্রহ করেছিল, মুক্তধারার বাহ্যতঃ-ক্ষুদ্র পরিসরে সেটি প্রায় জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে। এক দিকে কল্যাণ, অন্য দিকে কামনা ; এক দিকে প্রাণ, অন্য দিকে জড়জঞ্জাল, যন্ত্র ; এক দিকে স্নেহ প্রেম, অন্য দিকে শক্তির উপাসনা, হিংসা ; এক দিকে জীবন, অন্য দিকে মৃত্যু —এই মীমাংসারহিত দ্বন্দ্বই ব্যক্তির জীবনে, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায়, মানবসভ্যতার স্তরে স্তরে দেখা দিয়েছে আর নাটক দুটির বিষয়বস্তুও তাই। জীবন বলতে অন্নময় জীবন শুধু নয়, মৃত্যুও নয় শুধু দেহের। অমর জীবনে যাদের অভিলাষ ও আস্থা, বরং তারা দেহের মৃত্যুকেই সহাস্যে বরণ করে বীর্যের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে। অহংমুখী যার জীবন, বিষয়সংগ্রহই যার লক্ষ্য, ছল বল হিংসা যার অস্ত্র, বাহ্যতঃ জয়শীল হলেও অন্তরে অন্তরে তার মৃত্যু। যে বীর মারে না, মরতে প্রস্তুত, আসলে সেই অমর। সেই বীরজীবনের আলেখ্যে প্রথম রেখা-

পাত যেমন উদয়াদিত্যে, অভিজিৎও সেই পরম বীরত্বেরই প্রতিমূর্তি। প্রতাপাদিত্য বা রণজিৎ এক দিকে আছেন নিজেদের যন্ত্রী, মন্ত্রী, স্তাবক, আশ্রিত হত্যাব্যবসায়ী সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে; অন্য দিকে উদয়াদিত্য বা অভিজিতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন — বসন্তরায়, ধনঞ্জয়, সুরমা, বিভা, বিশ্বজিৎ, সঞ্জয়, মাধবপুর আর শিবতরাইয়ের সর্ব-সাধারণ প্রজা, আরো অনেকে— সজ্ঞান সচেতনভাবে না হলেও প্রাণের আকর্ষণে। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে উদয়াদিত্য ও বিভা তীর্থ-যাত্রা করেছেন কামনার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে, প্রাপ্তি তাঁদের পথে-পথে পদে-পদে; আর, মুক্তধারায় অভিজিতের মৃত্যুই বন্দীজীবনের বন্ধনমোচনের ইঙ্গিত দিচ্ছে—অতঃপর স্থির হয়ে কেউ বসে থাকতে পারবে না গৃহ পরিবার রাজ্য সাম্রাজ্যের গড়-বন্দী হয়ে, জড়বস্তু স্তূপীকৃত ক'রে কিম্বা নির্জিত শোষিত শঙ্কিত হয়ে চিরপরাভবের কয়েদ-খানায় —দ্বন্দ্ব হয়তো শীঘ্র শেষ হবে না— তবু মনুষ্যত্ব অপরাজিত থাকবে, জীবনের পথ বাধামুক্ত হবে আরো শত সহস্র বীরের জীবন-দানে।

অহংবুদ্ধি স্বার্থ ও বিষয়বাসনার অন্ধ ক্ষুদ্র কারাগার থেকে মুক্তি, ক্ষেম ও প্রেমের পথে এগিয়ে চলা, এ যেমন প্রায়শ্চিত্তের ইঙ্গিত তেমনি মুক্তধারার নিহিত তাৎপর্য।

কিন্তু যে বিষয় ছিল ব্যক্তি বা ব্যষ্টির স্তরে সেইটেই মোটের উপর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্তরে উন্নীত হওয়ায় নাটকের রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে, 'টাইপ' প্রাধান্য পেয়েছে, ঘটনা সাংকেতিক-ও ভাষা ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে— নইলে সংহতি বা পরিমিতি রাখা যেত না। রক্তকরবীতে এই সংকেতধর্মের বা ইঙ্গিতময়তার পরবর্তী পদক্ষেপ এটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মুক্তধারায় (তেমনি রক্তকরবীতে) গল্প স্বল্পই, ঘটনাধারার দ্রুতি অত্যদ্ভুত। অঙ্ক বা দৃশ্য -বিভাগের দ্বারা নাটকে স্থান ও কালের বহু ব্যবধান ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। মুক্তধারায় (রক্তকরবীতে) দৃশ্য

একটিই, সে হল পথ। চলাই যে জীবনের ধর্ম— মানুষের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, সেও যে পথেরই অথবা চলারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ—এটি রবীন্দ্রনাথের একটি মৌল আদর্শ বা ভাবনা। পথেই যা-কিছু ঘটছে অবিচ্ছেদে; বিচিত্র নরনারী বিবিধ জনতা ফিরে ফিরে আসছে, যাচ্ছে। তত্ত্বনাট্য বা সংকেতনাট্য হোক, তবু তো প্রয়োজন ছিলই নারীচরিত্রের —জীবননাট্যের মূল-সুরটি না হলে বাজবে কেন নানাভাবে মধুরে করুণে মিলে। অভিজিতের জীবনের অন্তরালে আছে যে নামহারা পূজারিনী তাকে নাইবা জানলেম, নারীর বিচিত্র ব্যথা ও সুখ এই নাটকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করেছে পাগলিনী অম্বা, দেওতলীর দুখ্নি ফুলওয়ালি আর ঐ যে মেয়েটি মাসির সঙ্গে মেলায় এসেছে, রাজপুত্র তার কৈশোরকল্পনায় দেবতার মতোই এ কথা যে নির্ভয়ে বলেছে।

উত্তরকূটে দেবতার বেদীতে কখন্ তৃষ্ণা-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ভৈরবের নামে তারই পদতলে সকলে অর্ঘ্য আনছে, মন্ত্র উচ্চারণ করছে 'মারো মারো' আর যন্ত্রাসুর নিরীহ প্রজার ধন মান প্রাণ কবলিত করে উদ্ধত মাথা তুলে আকাশের আলো'কে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। বিভূতি এই যন্ত্রশক্তির অধিকারী, বিষয়লোলুপ বৈশ্যের প্রতিভূ, নূতন 'ক্ষত্রিয়'। রাজা তাকে ক্ষত্রিয় ব'লে না মেনে পারেন না। আজ শুধু বাহুবলে রাজ্যরক্ষা বা পররাজ্য- শাসন ও শোষণ অসম্ভব। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি এক আসন্ন ক্রান্তির মুখে। নিঃস্বকে শোষণ করতে আর নিরন্নেরও অন্ন হরণ করতে তার লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত তার ছলনাজাল। মিথ্যাপ্রচারের কুহকে সত্য আচ্ছন্ন; পাঠ-শালার গুরুমশায় অবধি সেই প্রচারের বাহন আর নিষ্পাপ সরল শিশুরাই তার শিকার। 'ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য' যেখানে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যায় সেখানে অন্যায় আর নয়; নৈর্ব্যক্তিক পার্টি বা রাষ্ট্রই হল ন্যায়ের 'রক্ষক' বা ভক্ষক। কুলক্রমাগত রাজাকে সরিয়ে বা শিখণ্ডী-রূপে রেখে যন্ত্ররাজ বিভূতি তার স্থান নিতে প্রস্তুত। 'উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয় ··· দেবতাও আছেন' এ কথায় তার আস্থা না

থাকাতেই বুক ফুলিয়ে বলে—'যন্ত্রের জোরে দেবতার স্থান নিজেই নেব'। যেমন রাজা তেমনি ভৈরবও যদি নিঃস্ব দুর্বলের ধন প্রাণ -হরণে তার সহযোগী হন, ভালোই— 'তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ ক'রে ··· উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন'— নইলে তিনি উত্তরকূটের দেবতা নন।

রাজার মধ্যে পুরাতন নীতিধর্মের কিছু অবশিষ্ট আছেই, তাই তাঁর মধ্যে আছে দ্বিধা, আছে পুত্রস্নেহ। অভিজিৎকে তিনি রক্ষা করতে চান প্রজাসাধারণের ক্রোধ থেকে, হয়তো রাজধর্মে (কিছু ধর্ম কিছু অধর্ম) প্রবর্তিত করতেও চান।

অভিজিৎ কিন্তু কুলছাড়া, অভিনব। মুক্তধারার ঝর্নাতলায় তার জন্ম এ তার কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ।[৪১] 'যে-সব পথ এখনো কাটা হয় নি' দুর্গমের উপর দিয়ে 'সেই-সব ভাবীকালের পথ' দেখে সে চোখ-মেলা ধ্যানে— 'দূরকে নিকট করবার পথ'। সত্যই রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ যার, উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই তাকে আটকে রাখা যাবে কেন! বিশ্বে তার অধিকার, সকল জাতি সকল মানুষই তার আপন। সেই অধিকার সেই আত্মীয়সম্বন্ধ প্রাণ উৎসর্গ করে সে প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত করে যাবে। প্রত্যেক মানুষকেই দিয়ে যাবে দুর্লভ এক উত্তরাধিকার।

অভিজিৎকে পুত্ররূপে পালন করলেও, অভিজিৎকে বোঝবার ক্ষমতা নেই রাজার। ধনঞ্জয়ই অভিজিতের সজাতি। বাইরে তার বৈরাগীর বেশ, ভিতরে বিশুদ্ধ অনুরাগেরই রঙ, আসক্তির মলিনতা নেই— সকলের কল্যাণই তার একমাত্র অভীষ্ট। অভয় তার মন্ত্র। 'মরব তবু মারব না' এই তার সংকল্প। 'শত্রুকে জয় করব প্রেম দিয়ে / মৈত্রী দিয়ে— আসলে সে তো শত্রু নয়' এই তার ব্রত। রবীন্দ্রকল্পনায় ধনঞ্জয় নূতন নয়, বহু পুরাতনই বটে। রাজর্ষি গল্পের বিল্বনেও তার প্রতিরূপ, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অহিংসানিষ্ঠার যিনি পরি-পোষক। নানা নাটকে নানা পরিবেশে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর রূপেও

তাঁর উপস্থিতি। কবিমর্মের কথাটি সহজেই সহৃদয়ের মর্মস্পর্শী মর্মঙ্গম হবে ব'লে গানই তাঁর ভাষা। এ দেশের যাত্রায় পালা-গানেও এমনটি ছিল না তা নয়, মূর্তিমান বিবেক বা নারদমুনি রূপে, ক্ষ্যাপা বা বাউলের বেশে। কবি সেই কৌশল তাঁর নানা নাটকে আরো সূক্ষ্ম সুচারু রূপে প্রয়োগ করেছেন। বাংলার (তেমনি ভারতের) লোক-জীবনেও এর প্রতিরূপ আছে যে। একাধিক বাউল দর্বেশ ফকিরের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনে। এক কালে তারাই ছিল যেন পল্লীবাংলার প্রাণ, দ্বারে দ্বারে মন্দিরে মেলায় তাদের গতাগতি, পথ তাদের প্রাণাধিক প্রিয়, গান তাদেরও ভাষা। ভেবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বাউল ছিলেন অন্তরে অন্তরে। ধনঞ্জয় ঠাকুরদা কবিশেখর বা অন্ধবাউল চরিত্রের তাই বিশেষ তাৎপর্য বিশেষ সার্থকতা। সে যে কবিরই আপন স্বরূপ, নিজস্ব সত্তা।

এই স্বভাব-অনুরাগী বা বৈরাগীর সঙ্গে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের সম্পর্ক কিসে প্রতিষ্ঠিত? বুদ্ধিবিদ্যায় জ্ঞানে তো নয়। স্বাভাবিক প্রাণের টানে। অথচ 'সহজ' মানুষকে সহজে বোঝাও যায় না। সমাজ যে কৃত্রিম, মানুষের জীবনও। 'তোমাকেই আমরা বুঝি / কথা তোমার নাই বা বুঝলুম' এ ব'লে যেমন গোঁজামিল দিতে চায় শিবতরাইয়ের মানুষ, তেমনি কুম্ভও তো বলে— 'ঠাকুরদা, তোমার কথা ··· তেমন বুঝি নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা, আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম— কিন্তু ঠকলুম না তো?' [৪২]

গুরুঠাকুর বা দাদাঠাকুর হওয়ার এই এক যন্ত্রণা।[৪৩] তবু সাধারণকে নিয়েই অসাধারণের কারবার; তারা অজ্ঞানও হতে পারে কিন্তু জ্ঞানপাপী নয়। সব কথার অর্থ তারা বুদ্ধি দিয়ে বোঝে না। না বুঝলেও সাড়া দেয় অবিলম্বে। তারা খুঁজে বেড়ায় কোথায় তাদের হৃদয়ের রাজা— তাদের উদয়, তাদের অভিজিৎ। তাকে বাইরের থেকে হারিয়ে 'হায় হায়' করে, বাউল বা বৈরাগী আশ্বাস দেয় —'চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।' সে কথার অর্থ বুঝতে সময় লাগে।

প্রথাসম্মত 'চিরায়ত' ট্র্যাজেডি যখনি কবি মনীষীর ব্যাপক গভীর জীবনদর্শনের বা সমাজভাবনার বাহন হয়েছে, তত্ত্বনাট্যের রূপ নিয়েছে, তার 'মানবিক' আবেদন হ্রাস পেয়েছে সন্দেহ নেই—এরা যে ঠিক-ঠিক রক্ত মাংসের মানুষ নয়, টাইপ অর্থাৎ ভাব ও আদর্শের মূর্তি অনেকেই। তবু কী পর্যন্ত এই নাটকের (তেমনি রক্তকরবীর) অভিনয়যোগ্যতা সেই এক আশ্চর্য। গানের সুরে সুরে রচিত অলৌকিকের এক ইন্দ্র-জালে যেমন আকাশ-ছোঁওয়া পটভূমিকা, পাগলা বটুক বা পাগলিনী অম্বার ব্যথায় ও আর্তিতে এর স্পন্দমান হৃদয়ের ধ্বনি প্রতিধ্বনি—সেটি সহৃদয় সামাজিকেরও হৃৎস্পন্দন দ্রুততর ক'রে তোলে। ভাবী যুগের নাটকের এই হয়তো পূর্বাভাস, তত্ত্ব বা ভাবনা যে কালে সম্পূর্ণ সচল শরীরী হয়ে উঠবে। ব্যাস বাল্মীকি হোমার দান্তের কাব্যে তাই হয়ে ওঠে নি কি ? অথচ সম্ভাবী নাট্যরূপ তারই যে পুনরাবৃত্তি হবে তাও নয়। কেননা, এক কৃতযুগের নকল হয় না আর এক কৃতযুগে। রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ, সে পথ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। দিগ্‌যবনিকা সরিয়ে যে-সব নটনটী ভবিষ্যতে দেখা দেবে, যে নাটকের অভিনয় হবে, আজ সে আমাদের কল্পনার অতীত।

মুক্তধারার যে আলোচনা করা গেল তা অপ্রচুর আর অসম্পূর্ণ হয়তো। সন্তোষজনক নয়। অগত্যা মূল নাটকের উপরেই বরাত দিয়ে এ আলোচনা শেষ করতে হয়।[৪৪] অথচ শেষ হয়েও শেষ হয় না, রক্তকরবীর উল্লেখ না ক'রে। উল্লেখের বেশি নয়।

মুক্তধারার অনতিকাল পরে লেখা হয় রক্তকরবী।[৪৫] একটি থেকে আর-একটির উদ্ভব না হলেও গোত্রকুল একই— সংকেতময় প্রতীকী নাটক-রচনায় পরবর্তী শুধু নয়, সর্বশেষ প্রযত্ন।[৪৬] চরম বা পরম বলাই সংগত। নাট্যকল্পনার এই বিশেষ ক্ষেত্রে এতটা শক্তির প্রকাশ, কবিপ্রতিভার এমন স্ফূর্তি, পূর্বে বা পরে আর দেখা যায় নি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে কবি সর্বগ্রাসী industrial civilization বা যন্ত্র-সভ্যতা যতটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তার জন্য যে গভীর

বেদনা বোধ করেছেন, প্রতিভা দিয়ে তারই এমন সার্থক বিগ্রহ-রচনা একান্ত বিস্ময়কর। একটি দৃশ্যে ও অব্যাহত একই কালে ঘটনাধারা ছুটে চলেছে যার-পর-নেই দ্রুত গতিতে।[৪৭] একা নন্দিনীর প্রাণ-স্পন্দনে সমস্ত নাট্যব্যাপার —মাটি জল আকাশ বাতাস— বিদ্যুন্ময়, প্রাণময়। সে'ই এ নাটকের প্রাণ। সে'ই প্রাণই মারণব্রতী সর্বনাশা সভ্যতার নিশ্চিত মরণ এবং নূতন জীবনের এক ধ্রুব আশ্বাস।[৪৮] একই কালে জ্ঞান বিজ্ঞান যন্ত্রশক্তি— ব্রাহ্মণের বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষত্রিয়ের বলবীর্য উৎসাহ আর বৈশ্যের নৈপুণ্য ও চাতুরী উত্তুঙ্গ শরীর / অদৃশ্য দানবীয় আকার পেয়েছে রক্তকরবীর রাজায়। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের সে বিগ্রহ —সমাজ যখন নামমাত্রে পর্যবসিত কায়াহীন ছায়া মাত্র। মানুষ কি হারিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল তবে? সেই হয়তো পরিণাম, তারই প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে বহু দিক থেকে— মানুষ তবু আছে খণ্ড-বিখণ্ড বিকৃত-বিধ্বস্ত বা খর্ব-অপরিণত আকারে। ৪৭ ফ আর ৬৯ ঙ শুধু? না, বিশু, ফাগুলাল, কিশোর। আর, নন্দিনীর মতোই অনুক্ষণ পথ চেয়ে আছি আমরা রঞ্জনের। সেই প্রাণের মানুষ, পূর্ণসচেতন মানুষ এই জড়ের জগতে— যন্ত্রের রাজত্বে। না জেনে রাজা তাকে মেরেছে, তার পরে নিজের সৃষ্টিকেই চুরমার্ করে ভাঙতে ছুটেছে নন্দিনীর প্রেরণে, আহ্বানে। কেননা, ভয়াবহ পরিণাম আজ প্রত্যক্ষ। দেখেছে যন্ত্র তাকে মানছে না, জেনেছে **যন্ত্রই প্রভু হয়ে উঠছে যন্ত্রচালিত যন্ত্র-তাড়িত মানুষের।**

কেউ বা[৪৯] বলেন রাজাই রঞ্জন, জন্মান্তরে, রূপান্তরে। সে কথাও ভেবে দেখবার মতো। কারণ, রাজা কি আসলে মানুষ নয়? তবে আনন্দরূপিণী প্রাণস্বরূপিণী মানবনন্দিনীর দিকে কেন তার এই দুর্নিবার আকর্ষণ?

এ নাটকেই প্রতীক-রচনার পরিপূর্ণতা। প্রাচীন দেবতারা কেউ নেই; ধ্বজাপূজার শুধু উৎসব— জড়োপাসক যন্ত্রবাহন রাষ্ট্রেরই জয়ধ্বজা।[৫০] নন্দিনী নিখিল নারীর প্রতীক হয়েও প্রতীকই শুধু নয়—

জীবন্ত, সত্য। রবীন্দ্রনাট্যের আর-এক স্তরে সুদর্শনা সম্পর্কে আমাদের যেরূপ উপলব্ধি এ ক্ষেত্রেও তাই। বাস্তব সংসারে দুর্লভ হলেও, সত্য-লোকে সে শরীরিণী।[৫১]

মুক্তধারা রক্তকরবীর পর রবীন্দ্রনাথ অন্য জাতের নাটক লেখেন পুরাতন গল্প কবিতা কিম্বা নাটক প্রহসনের আধারে। তারও পরে মনোনিবেশ করেন নৃত্যনাট্যে।

এই প্রবন্ধের টীকাগুলির সন্নিবেশ পরপৃষ্ঠা থেকে। টীকাবোধক ক্রমিক সংখ্যার পরেই মূল প্রবন্ধের যে পৃষ্ঠার বক্তব্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তারও নির্দেশ পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়ে।

উত্তরটীকা

১। পৃ ১ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রচনা-শেষে, রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশ করেন এবং বাংলা সাহিত্যকে সত্যই বিশ্বসাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করে দেন— বাংলা সাহিত্যে আনেন যুগান্তর। উত্তরকালে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে (১৯০৭) রবীন্দ্রনাথ এই যুগান্তকারী সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। বাল্যকালেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্যখানি পড়েন— 'আমরা যখন মেঘনাদবধ পড়িতাম তখন আমার বয়স বোধ হয় নয় বছর হইবে'। সেই 'বাধ্যতামূলক' কাব্য-পাঠের আশু ও সচেতন প্রতিক্রিয়া ভালো না হলেও স্বীকার করতেই হয়— প্রতিভায় ও প্রকৃতিতে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথই মধুসূদনের যথার্থ উত্তরসাধক, উত্তরাধিকারী। মধুসূদনের নূতন ছন্দের যা-কিছু গুণ আত্মসাৎ ক'রে বাংলা কাব্যের ক্রমিক উত্তরণে রবীন্দ্রনাথের মতো অভূতপূর্ব সফলতা আর কেউ অর্জন করেন নি।

২। পৃ ১ কিছুকাল পূর্বে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সহ-যোগিতায় শ্রীপুলিনবিহারী সেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার ও 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যের বিস্তারিত পাঠভেদ-সংকলনে এরূপ কাজের যথার্থ সূত্রপাত করেছেন। এর গুরুত্ব কতদূর বলে শেষ করা যায় না। কাজ চলছে আজও। তন্মধ্যে পাঠপঞ্জীকৃত 'সন্ধ্যাসংগীত' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (সবই নূতন সংস্করণ) বিশ্বভারতী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত।

৩। পৃ ৩ বিশ্বভারতী-প্রচারিত বাংলা ১৩৬৬ সন ও তদুত্তর মুদ্রণে বহুবিধ ক্রমিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে গ্রন্থপরিচয়ে। ১৩৬৮ সনের মুদ্রণে শেষ পৃষ্ঠায় একাঙ্কর একটি পাঠপ্রমাদ যেভাবে ও যে কারণে সংশোধিত হল কবির পরলোক-প্রয়াণের প্রায় ২০ বৎসর পরে, তার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮) গ্রন্থের '৩৮০' পৃষ্ঠায়।

৪। পৃ ৪ স্বয়ং কবির কাছে সম্পূর্ণ 'সন্তোষজনক' হতে পারে নি খৃষ্টীয় ১৯১৬ তথা ১৯২৩ সনের পূর্ব পর্যন্ত, এই নিগূঢ় তথ্য ও সত্য অনাবিষ্কৃত থাকে ১৯১৭ সনের ***Sacrifice*** তথা ১৯২৩-এর স্ব- প্রযোজিত ও অভিনীত বিসর্জন নাটকের সবিশেষ পর্যালোচনা না করলে। সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবু অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে তার বিশেষ উপ-যোগিতাই রয়েছে। বিশ্বভারতী-প্রচারিত বিসর্জনের সম্পাদনাকালে পরিবর্তনের রূপরেখা মাত্র যে ভাবে দিতে পেরেছি গ্রন্থপরিচয়ের শেষাংশে, কৌতূহলী পাঠক তা দেখে নিতে পারবেন বিসর্জনের প্রচল সংস্করণে বা মুদ্রণে (১৩৮১-৮৬)।

৫। পৃ ৪ দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে দীর্ঘকাল ধরে এ কথাই আমরা 'জানি' বা মানি। অথচ, অন্যরূপ মনে করার বিশেষ কারণও আছে, এ বিষয়ে পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে তৃতীয়-সংখ্যা রবীন্দ্রবীক্ষায় (১৩৮৪ শ্রাবণ, পৃ ৪৪), তার সংক্ষেপসার—

রাজার প্রথম মুদ্রণ ১৩১৭ পৌষে এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয় ১৩১৭ মাঘের প্রবাসী পত্রে 'প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়', পৃ ৫০০। দ্বিতীয় মুদ্রণ যে ১৩২৬ সনের প্রথম দিকেই কোনো সময়ে (১৩২৬ মাঘে

অরূপরতন-প্রকাশের পূর্বে) তারও ইঙ্গিত কি দেয় না ১৩২৬ আষাঢ়ে প্রবাসীর একটি প্রবন্ধ, পৃ ২০৯-১২ : “রাজা” / রাজা —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নাটক ইত্যাদি ? এ প্রবন্ধের লেখক ‘শ্রীঃ’ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অধিবাসী ও কবির সমীপস্থ ব্যক্তি তা লেখা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। সীতাদেবী-প্রণীত পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে (১৩৭১, পৃ ১২৮) উল্লেখ দেখা যায়, ১৩২৪ আশ্বিনে কলিকাতায় ‘ডাকঘর’ অভিনয়ের পর ‘রাজা’ অভিনয়েরও পরিকল্পনা ছিল। এজন্যই কিছুকালের মধ্যে পুনর্বিবেচনার ফলে ‘রাজা’র প্রথম পাঠের এই পুনরুদ্ধার এবং ১৩২৬ আষাঢ়ের প্রবাসীতে পূর্বোক্ত আলোচনা —এমন মনে করাই সংগত। ‘শ্রীঃ’ কোন্ বিশেষ সংস্করণ সামনে রেখে আলোচনা করেন তার অন্য কোনো সংকেত আবিষ্কার করা যায় না; কেবল এটুকু দেখি ‘রাজা’র ১৩১৭ পৌষের মুদ্রণে ‘ঠাকুরদাদা’ বানান প্রায় সর্বত্র আর পরবর্তী মুদ্রণে ‘ঠাকুর্দ্দা’— আলোচনাকারী প্রায়শঃ ব্যবহার করেছেন শেষোক্ত শব্দরূপ আর বানান।

যদি মনে করা যায় ‘রাজা’ পুনরায় ছাপা হওয়ার আগেই ‘অরূপরতন’এর প্রথম প্রকাশ, তা হলেও যার-পর-নেই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আলোচ্য ‘রাজা’র বিজ্ঞপ্তিতে (‘লেখকের নিবেদন’) ঘুণাক্ষরে কোথাও তার উল্লেখ নেই। ফলতঃ একবার অরূপরতনে রূপান্তরিত করার প্রায় অব্যবহিত পরে রাজায় পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন, এর প্রত্যাশা সম্ভাবনা অথবা যুক্তিযুক্ততা কিছুই রয়েছে কি ? অপর পক্ষে ‘রাজা’ দ্বিতীয় বার ছাপানোর পরেও রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারলেন না ব’লেই অল্প কালের মধ্যে অরূপরতনের উদ্ভব —এটি এই কবিপ্রতিভার প্রকৃতিসিদ্ধ

ব্যাপারই মনে করা চলে।

৬। পৃ ৫ 'রাজা' নাটক নূতন করে লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট পাতা লেখা হয়ে গিয়েছিল। ···লেখা এগোত না, অনেক দিন এমনিতে তা পড়েই ছিল। 'রাজা' নাটক অভিনয়ের সময় একদিন যখন খোঁজ পড়ল, দেখা গেল সেটির পাত্তা নেই কোথাও। ···বছর খানেক বাদে··· নব-পরিণীত দৌহিত্রীজামাতা শ্রীকৃষ্ণকৃপালনীর কাছে প্রকৃত ব্যাপারটা শুনা গেল,— কে বলে হারিয়েছে, সেটা যে রয়েছে সযত্নে তাঁর কাছেই। কবিই একদিন দান করেছেন সেটি নিজ কন্যা মীরাদেবীকে। সেখান থেকে স্নেহোপ-হারে জিনিসটি হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র··· কবিকে এক সময়ে বলা গেল ব্যাপারটা।··· .সে লেখা আর এগোল না।

—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। কবি কথা পৃ ৪১-৪২

মনে হয় সুধীরবাবু জাপানি খাতায় লেখা কবির এই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির কথাই বলেছেন (রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১৭১)। ৫০/৬০ পাতার পরিবর্তে আসলে ৮৪ পৃষ্ঠার লেখা। এই অসম্পূর্ণ লেখার আধারে, বহুবিধ পরিবর্তনে ও সংযোজনে, পরে সম্পূর্ণ যে পাঠ প্রস্তুত করা হয়, সম্ভবতঃ তাই সভাস্থলে পঠিত ১০ নভেম্বর ১৯৩৫ তারিখে— তারই প্রথমাংশ কবির-হাতে-লেখা বর্জিত প্রেসকপি রূপে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত।

অরূপরতনের শেষ সংস্করণ ছাপানোর কাহিনী, অবিরাম পরিমার্জন ও পরিবর্জনের কথা, পূর্বোক্ত 'কবি-কথা' (১৯৫১), গ্রন্থের পৃ ৮৫-৮৬-ধৃত।

৭। পৃ ৫ 'Cancelled' প্রেস-কপির ক-খ-গ তিনটি গুচ্ছে যথাক্রমে ১১, ২ ও ৮, মোট ২১ পাতা তথা পৃষ্ঠা। এগুলি ব্যবহৃত

প্রেস-কপির প্রথমাংশ, যথারীতি ছাপাখানার কালিমা-লাঞ্ছিত। (শান্তিনিকেতনের ছাপাখানায় ১৯৩৫ সনের কোনো 'রেকর্ড' থাকলে অবশ্যই তা সন্ধানের বিষয় হত)। 'ক' এর ৮ পাতা (সুরঙ্গমা সুদর্শনা ও অদর্শন রাজাকে নিয়ে) এবং 'খ' ২ পাতা (ঠাকুরদা ও বিদেশিনী মেয়ের দল) ১৩৪২ সনের অরূপরতনে প্রায় সবটাই নেওয়া হয়েছে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে।

৮। পৃ ৫ এই তারিখি তথ্যের দিকে যথাকালে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সদৈবানুকূল বন্ধুবর শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৯। পৃ ৬ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রণীত *The Sanskrit Buddhist Story of Nepal* (pp 124-25) গ্রন্থে সংকলিত। মিত্রমহাশয়ের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থে এই আখ্যানই সামান্য পরিবর্তনে ও সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংকলন করে দিয়েছেন আমার স্নেহভাজন বন্ধু—অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু।

১০। পৃ ৬ শাপমোচন নৃত্যনাট্যের বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। ঐ নৃত্যনাট্যে নাট্যরস বা কথাবস্তুই মুখ্য নয়। নৃত্য গীত সাজ সজ্জা সব মিলিয়ে যা দাঁড় করানো হয়েছিল, কবির জীবদ্দশায় প্রত্যেক অভিনয়-কালে নাচে গানে পরিকল্পনায় প্রচুর পরিবর্তনও করা হয়— শুধু সাহিত্যজিজ্ঞাসায় বা কাব্যবিচারে তার মর্মে প্রবেশ করা যাবে না। কবিকে প্রত্যেকবার অনেকের মুখাপেক্ষা করতে হয়েছে ; কে কেমন গাইতে পারে বা নাচতে পারে, সমাগত সামাজিকবৃন্দের অভিরুচি ও গ্রহণক্ষমতাই বা কিরূপ, কিছুই উপেক্ষিত হয় নি। ভূয়ঃ ভূয়ঃ পরিবর্তনের

মধ্যে, ১৩৪৭ পৌষে কবিজীবনের সর্বশেষ প্রযোজনায় শাপমোচন যে রূপ পরিগ্রহ করে সেটি সর্বোত্তম বিবেচিত হয়ে থাকে, সুপরিণত, সমুজ্জ্বল— দ্বাবিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে (বিশ্বভারতী পৃ ৫০৮-৫০৯) দৃশ্য-বিভাগ ও সংগীতসূচী দ্রষ্টব্য।

১১। পৃ ৬ ইংরেজি ভাষান্তরে : elephant park।

১২। পৃ ৮ Critics and detectives are naturally suspicious. They scent allegories and bombs where there are no such abominations...... the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarsana is not more an abstraction than Lady Macbeth who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature ... it does not matter what things are according to the rule of the critics. They are what they are, and therefore difficult of classification.

—Rabindranath : *Letters to a Friend*

১৫ নভেম্বর ১৯১৪ তারিখে সি. এফ. এণ্ডরুজকে লেখা চিঠির একাংশ, বিষয় 'রাজা' অথবা *The King of the Dark Chamber*। এণ্ডরুজ সাহেবের যে চিঠির (তা° ১৩ নভেম্বর ১৯১৪) উত্তরে লিখেছিলেন কবি, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ-ভুক্ত তারও কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করা যায়—

Brajendra Babu's criticism astounded me. রাজা not human! Allegorical! What next? Why! The character of the Queen so absorbed me that I could think of nothing else for days. It was a living soul going through an agony of conflict and entering at last into peace, a soul so living that I know her intimately and could almost speak to her.

—C. F. Andrews

দেখা যাচ্ছে সুদর্শনার সজীব সত্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে রসিক পাঠকের প্রত্যয় স্রষ্টা কবির প্রতীতির থেকে একটুও পৃথক্ নয়। এই সাক্ষ্যের বিশেষ মূল্য আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাক্, *The King of the Dark Chamber* শ্রীক্ষিতীশ সেন -কৃত প্রথম-মুদ্রিত রাজা নাটকের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ; মধ্যে মধ্যে কিছু বাদ দেওয়া হয়, কিছু গানও' বর্জিত। এ-সবই কবি-কর্তৃক নির্দেশিত বা অনুমোদিত মনে হয়।

১৩। পৃ ৯ অন্য দৃষ্টান্ত। নাটক না হলেও, *The Hound of Heaven* কবিতায় ত্রিকাল-ত্রিলোক-ব্যাপী যে inner dramaর যবনিকা সরে গেছে সে কি জীবন্ত সত্য না অলীক দিবাস্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন? উপলব্ধির যাথার্থ্যে ঐক্যে ও নিবিড়তায় সব কি প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব নয়?

১৪। পৃ ১১ শেষ বাক্যটি এবং তার পরে সুরঙ্গমার গান 'আমি কেবল তোমার দাসী' দ্বিতীয় পাঠে (প্রথম মুদ্রণে) বর্জিত। বলাই বাহুল্য, সুরঙ্গমার মধুরভাবের মধ্যে দাস্যভাব বা দাসীভাব প্রাধান্য পেয়েছে। অপর পক্ষে পুরোপুরি মধুর

ভাবের দুরূহতম সাধনায় সুদর্শনাকে বহু দুঃখদহন ভ্রান্তি অপরাধ পার হয়ে যেতে হচ্ছে— নাটকের শেষ দিকে সেই প্রেমের মাধুরী যখন শুচি শুদ্ধ হয়ে উঠেছে, পূর্ণতা পেতে চলেছে, তখন দাসীভাবও তার মধ্যে সহজ স্বতঃসিদ্ধ হয়েছে। বৈষ্ণবেরা বলেন, মধুরভাবেরই অঙ্গীভূত হয়ে থাকে শান্ত দাস্য সখ্য এবং বাৎসল্য।

১৫। পৃ ১১ রাজা (প্রথম পাঠ) পৃ ১১২। তুলনীয় : মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান ইত্যাদি।

১৬। পৃ ১২ উদ্‌ধৃতির স্থানে স্থানে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণের অনুরোধে বিশেষ-রকম হরপের ব্যবহার করেছি আমরা। আমাদের আরোপিত এরূপ হরপের বৈশিষ্ট্য আরো বহু স্থলে দেখা যাবে ; উদ্দেশ্য একই।

১৭। পৃ ১৪ এমন-কি ফাল্গুনীতেও ত্রিশটির বেশি গান নেই। এ ক্ষেত্রে গানের সংখ্যা, উনচল্লিশ হলেও তন্মধ্যে দশটি গান রাজার উভয় পাঠে এবং অতিরিক্ত একটি প্রথম পাঠে পাওয়া যায়, এগারোটি গীতিমাল্য গীতালি থেকে সংকলন আর সম্ভবতঃ সতেরোটি গান নূতন রচনা।

রাজা-অরূপরতনের পূর্ণাঙ্গ চারটি পাঠের কোন্‌টিতে কোন্ কোন্ গান আছে তার বিস্তারিত তালিকা দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রবীক্ষার তৃতীয় সংখ্যায়, শ্রাবণ ১৯৮৪, পৃ ৪৬-৪৮।

১৮। পৃ ১৪ রাজা'র প্রথম পাঠে রানী সুদর্শনার কাছে রাজারই এই প্রেমের আবেদন আর সেইভাবেই সার্থকতর।

১৯। পৃ ১৪ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত (১৩৬৯), পৃ ২৩২।

২০। পৃ ১৪ তদেব, পৃ ২৩০। বিশেষ হরপ-ব্যবহার আমাদের।

২১। পৃ ১৪ তৃতীয়-খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৬৮), পৃ ১৯২। বিশেষ হরপ আমাদের।

২২। পৃ ১৪ রবীন্দ্রসংগীত (১৩৬৯), পৃ ২৩৭।

২৩। পৃ ১৬ প্রথম পাঠে ছাব্বিশটি গান ছিল। সর্বশেষ পাঠে পঁচিশটি, তার মধ্যে একটি প্রস্তাবনায় ও একটি উপসংহারে— নাটকের ভিতরেই গান তেইশটি। শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয়ে নানা কাব্য থেকে নানা গান আহৃত, যখন যেগুলি প্রযোজনার পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়েছে। অরূপরতনের প্রথম প্রকাশ বা অভিনয় -কালে অনুরূপ প্রক্রিয়াই দেখা যায় না কি? রাজা অরূপরতনের অপর তিনটি পাঠ সম্পর্কে এরূপ অনুযোগের সম্ভাবনা নেই, হয়তো কিছুই 'অতিশয়' মনে হয় না, সমস্তই যথাযথ এবং সুন্দর— গানগুলি নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

২৪। পৃ ২১ এই অনুচ্ছেদেও বিশেষ হরপ-ব্যবহার আমাদের।

২৫। পৃ ২১ নূতন অরূপরতন কলিকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ১৩৪২ সনের ২৫-২৬ অগ্রহায়ণ তারিখে (১১-১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫); কবি ঠাকুরদাদার বেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন (রবীন্দ্র-সংগীত। পৃ ২৩১)— 'তাঁর বয়স ৭৪ বৎসর। ...কণ্ঠে আগের মত আর শক্তি না থাকায় ঠাকুরদার কতকগুলি গান তিনি আমাকে গাইতে নির্দেশ দেন। ... চেলা সেজে সব সময় তাঁর পিছনে রঙ্গমঞ্চে ঘুরব ... তাঁর সঙ্গে গান গাইব। এই ভাবেই কয়েকটি গান আমি গেয়েছিলাম।' নাটকের ভিতরেও ঐ ইঙ্গিত আছে— 'ওরে, তোরা ধর্-না ভাই, গান।' শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর ও দৌহিত্রী নন্দিনী যথাক্রমে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা সেজেছিলেন (রবীন্দ্রসংগীত। পৃ ২৩১)। পূর্বের অরূপরতনে সুরঙ্গমার গান ছিল না একটির বেশি, বর্তমানে অজস্র— গানে গানে তার বিরাম বিচ্ছেদ কুণ্ঠা বা ক্লান্তি ছিল না। শুধু গানের দিক দিয়েই নয়, সুরঙ্গমার স্বচ্ছন্দ সত্তা আরো নানা দিকে নানা

ভাবেই স্ফুটতর। তার বিস্তারিত বিবরণ না'ই দেওয়া গেল, এটুকু স্পষ্ট যে কুমারী সুদর্শনার বিশেষ নির্ভরস্থল সুরঙ্গমা —দিশারী নয় তাই বা বলি কেমন ক'রে? ভণ্ড রাজার ছলনা ধরা পড়তেই সুদর্শনা আগুনে ঝাঁপ দিতে গেলেন আবার ভয়ও পেলেন, তখন সুরঙ্গমাই এসে বলল— 'ঐ আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।'

'সেকি কথা!'

'রাজাই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে। ...আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।'

অতঃপর উভয়ের প্রস্থান, 'আগুনে হল আগুনময়' এই গানটি, উভয়ের পুনঃ প্রবেশ। তখন সুরঙ্গমাই আশ্বাস দিচ্ছে সুদর্শনাকে 'ভয় নেই তোমার ভয় নেই', আবার সুরঙ্গমাই প্রশ্ন করছে— 'কেমন দেখলে?'

'ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো! আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো!'

সুদর্শনার প্রস্থানের পর সুরঙ্গমা বলে— 'যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?'

'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' ইত্যাদি। (বৈষ্ণবের প্রাণবল্লভ ভগবান্‌ও কালো, তবে 'ভয়ানাং ভয়ং' কখনো নয়—আচারী সংস্কারবদ্ধ বৈষ্ণব কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিশ্বরূপ-সহ বর্জন করেন।) বলা বাহুল্য নয়—রাজার প্রথম পাঠে এটুকু এবং আরো অনেকটা নাটকের মাঝখানেই অন্ধকার কক্ষের ঘটনা, পাত্রপাত্রী কেবল

অদৃশ্য রাজা ও সুদর্শনা। বর্তমানে সমস্ত ব্যাপারটি আশ্চর্য-ভাবে সংহত আর রাজার কথাগুলিও সুরঙ্গমার উক্তিতেই আমাদের শ্রুতিগোচর। সুরঙ্গমার ব্যক্তিত্ব স্ফুটতর, 'নটীর পূজা'র শ্রীমতীর সাজাত্যও স্পষ্ট— এ-সবই অসম্পূর্ণ পাণ্ডু-লিপির তথা বর্জিত প্রেস-কপির অনুস্মৃতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৬। পৃ ২৩ রাজা অরূপরতনের অন্যোন্য তুলনায় কোন্‌টিতে আমাদের পক্ষপাত, সেটি হৃদয়বোধের দিক থেকে বলা কঠিন হলেও বিচার-বিতর্কের পথে অগ্রসর হয়ে না ব'লে উপায় আছে কি ?

২৭। পৃ ২৩ এ স্থলে 'করুণা'র উল্লেখ প্রাসঙ্গিক ও সংগত ছিল। অথচ অধিকাংশের বিচার-বিবেচনায় 'কাঁচা লেখা' সাব্যস্ত হওয়ায় রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির পূর্বে যার প্রচারই হল না গ্রন্থাকারে, কবি কেনই বা তার উল্লেখ করতে যাবেন ? এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের চেতন বা অবচেতন মনের কোন্‌খানে ছিল কবির প্রথমসৃষ্ট নারী-চরিত্রটি তা আমরা অনুমান করতেও পারি নে।

২৮। পৃ ২৪ রুক্মিনী বা মঙ্গলাকে হীরার (বিষবৃক্ষ) কনিষ্ঠা ভগিনী বলা চলে।

২৯। পৃ ২৪ তৃতীয় খণ্ড গীতবিতান (১৩৮১) পৃ ৯৭০, পাদটীকা ৭ দ্রষ্টব্য।

৩০। পৃ ২৫ রবীন্দ্রস্মৃতি (১৩৬৯), পৃ ৩৪। লক্ষ্য করবার বিষয় : ন্যাশনাল, মিনার্ভা, এমারেল্ড্‌, স্টার (?), এতগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন সময়ে 'রাজা বসন্ত রায়' নাটক অভিনীত। বর্ধমান শহরে পেশাদারি দল -কর্তৃক এর অভিনয় ২ জুন ১৮৯৯ তারিখে (২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে, রমাই ভাঁড় / অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী

—এ খবর পাই আমরা বর্ধমানের বিজয়তোরণ পত্রে, ১৩৮১ শারদীয় সংখ্যা, পৃ ১০-১১।

৩১। পৃ ২৫ রাজা বসন্তরায় বিচিত্র উপাদানে গঠিত (ইতিহাস-আশ্রিত কতটা জানা নেই) —রবীন্দ্রনাথের আপন সত্তা ও আদর্শ-ভাবনা, সেই সঙ্গে রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহের চমৎকারজনক ব্যক্তিসত্তা মিলিত মিশ্রিত হয়ে যেন এই আকার পেয়েছে। আবার, পদকর্তা বসন্তরায় পৃথক ব্যক্তি হলেও (পৃথক কিনা আমাদের জানা নেই) তিনিও কি এই কবিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়ে নেই? (১২৮৯ শ্রাবণের ভারতীতে 'বসন্ত-রায়' প্রবন্ধে উক্ত পদকর্তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর প্রশংসা করেন।) ফলতঃ এই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি, ঠাকুরদা দাদাঠাকুর ধনঞ্জয় প্রভৃতির অগ্রজ। বঙ্কিমের অভিরাম (দুর্গেশনন্দিনী), রমানন্দ (চন্দ্রশেখর) বা সত্যানন্দ (আনন্দমঠ) আরেক জাতের মানুষ।

৩২। পৃ ২৬ এককালে এই নাটকে 'মুখের হাসি চাপলে কী হয়' গানটি রবীন্দ্রনাথের বলে বিশ্বাস থাকায়, নাটকে তাঁর আংশিক সহযোগিতা কল্পনা করা যেত। কিন্তু ঐ গান যে রবীন্দ্র-নাথের নয় এ কথা এখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে (১৩৭৩-পরবর্তী) বর্জিত গানের তালিকা দেখলে। রবীন্দ্রনাথের নয়, তবু তাঁরই ভাব-ভাষার অনুসৃতি, তার প্রমাণ বউঠাকুরানীর হাটের অষ্টম পরিচ্ছেদে বিভাকে লক্ষ্য করে বসন্তরায়ের উক্তি :

হাসিরে পায়ে ধরে / রাখিবি কেমন ক'রে,
হাসির যে প্রাণের সাধ / ঐ অধরে খেলা করে।

'রাজা বসন্ত রায়' নাটকের 'মুখের হাসি চাপলে কী হয়' গানটি ত্যাগ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রবীন্দ্রনাথ নতুন যোগ করেন : 'হাসিরে কি লুকাবি লাজে' ইত্যাদি।

ঠাঁকার বাঁশি মাতের মাড়ি -
বল ভাই ধন্য হরি!
ধন্য হরি সুখের নাটে, ধন্য হরি রাজ্যপাটে -
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে ধন্য ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতাও যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি -
ব্যথা দিয়ে কাঁদাও যখন ধন্য হরি ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসিমুখে
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে ধন্য হরি ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে ধন্য হরি ধন্য হরি -
খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে - ধন্য হরি ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়পদ্মদলে চরণ-আলোয় আলো করি।

১৬ই চৈত্র ১৩১৬

আমাকে যে বাঁধবে ধরে - এই হবে যার সাধন
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনতে আপনবশে
সে কি অমনি হবে!

তার আলো তার সাজানো-দিয়া সন্ধ্যেতে কোন সুরে
সে কি এমনি হবে?
আমারে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি এমনি হবে?
আপনারে সে বাঁধন দিল, আমায় কেন বাঁধন
সে কি এমনি হবে!

সান্ত্বনা

কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে?
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে?
~~আমার~~ ~~দুখের~~ প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
~~সুখের~~ ~~বন্ধু~~ ~~দুখের~~ সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
~~কে বলেছে এই অধিক দুঃখ সইতে~~?
(তোমায়) দেব না দুখ পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে।
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

৩৩। পৃ ২৭ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রথম প্রচার-কালে রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থে যে 'বিজ্ঞাপন' দেন তার তারিখ : ৩১শে বৈশাখ / সন ১৩১৬ সাল। / শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে ৩৫৮-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে (মূলতঃ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় -সংগ্রহ-ভুক্ত গান-রচনার একটি খসড়া-খাতা বা 'গানের খাতা') ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ তারিখের 'অন্তর মম বিকশিত কর' গানের পিঠোপিঠি প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অধিকাংশ নূতন গান (তারিখ-যুক্ত বা বে-তারিখ) অবিচ্ছেদে এই ভাবে পাওয়া যায় (মধ্যে '৪' ও '৫' সংখ্যা প্রায়শ্চিত্ত-বহির্ভূত)—

১। ও যে মানে না মানা
২। নয়ন মেলে দেখি আমায়
৩। ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না
৪। তিমিরদুয়ার খোলো ফাল্গুন ১৩১৫
৫। হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই

৯ই চৈত্র ১৩১৫। বোলপুর

৬। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি—
বল ভাই ধন্য হরি ১১ই চৈত্র ১৩১৫
৭। আমাকে যে বাঁধবে ধরে
৮। কে বলেছে তোমায় বঁধু
৯। রইল বলে রাখলে কারে ১৩ চৈ
১০। আমারে পাড়ায় ২
১১। ওরে আগুন আমার ভাই ১৪ চৈত্র
১২। গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ
১৩। ওরে শিকল তোমায় কোলে করে
১৪। সকল ভয়ের ভয় যে তারে
১৫। আরো আরো প্রভু ১৯শে চৈত্র

১৬। [ওর] মানের বাঁধ কি টুটবে না
১৭। আমরা বসব তোমার সনে
১৮। জগৎ জুড়ে উদার সুরে   বোলপুর। আষাঢ় ১৩১৬

বলা বাহুল্য, শেষ গানটিও প্রায়শ্চিত্তের নয়। / গানের এই খসড়া-খাতায় গানগুলির পারম্পর্য থেকেই গান লেখারও পারম্পর্য স্থির করা যায়। বহু গানে রচনার তারিখ, কদাচিৎ রচনা-স্থানও, দেওয়া আছে। (প্রায়শ্চিত্ত-রচনার স্থান কি শান্তিনিকেতন আশ্রম নয়?) ফলে জানা যায় সব গানের রচনা ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ তারিখের পরে, ১।২।৩ সংখ্যা ১৩১৫ ফাল্গুনে বা তার আগে আর ৫ সংখ্যা থেকে বাকি সবই ১৩১৫ চৈত্রে— তবে ১৬ এবং ১৭ সংখ্যার গান ১৩১৬ বৈশাখে লেখা হতেও পারে কিন্তু তার সম্ভাবনা অল্প।

৩৪। পৃ ২৭ অভিনবত্বের কার্যকারণ বা প্রকৃতি বুঝতে হলে রচনা-কালের পটভূমিটি পর্যবেক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এ-জন্য সাধারণভাবে আমরা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী-২ (১৩৬৮), শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের অগ্নি-যুগ (১৯৪৮ ?) এবং শ্রীটেণ্ডুল করের Mahatma গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (১৯৬০), এগুলির উপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। উপস্থিত প্রসঙ্গের বিচার বিবেচনায় আমাদের কাজে লেগেছে এরূপ অন্যান্য পুস্তক পত্র পত্রিকার উল্লেখ যথাস্থানে।—

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'কলিকাতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট' কিংস্‌ফোর্ড্ সাহেবকে হত্যার চেষ্টা হয় ১৩১৫ বৈশাখে। ভ্রমক্রমে 'ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা বোমার আঘাতে নিহত' হন। 'হত্যাকারী দুইজন যুবক—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকী।' (ইতিপূর্বে ১৮৯৭ জুন পুনায়

মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী-পালনের দিনে 'প্লেগ-কমিশনার Mr. W. C. Rand এবং তাঁহার সহকারী Lt Ayerst'কে হত্যা করেন 'দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই চিৎপাবন ভ্রাতা'।) কিংস্‌ফোর্ড্-হত্যার ব্যর্থ প্রয়াসের অল্পকাল পরে কলিকাতার মানিকতলায় বোমার কারখানা ও বিপ্লবের ষড়্‌যন্ত্র ধরা পড়ে।

এই হল এক দিকে রক্তাক্ত বিপ্লবের পূর্বসংকেতও প্রস্তুতিতে নানা মর্মান্তিক ঘটনা। অন্য দিকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ক্রান্তিকাল আসে এই সময়েই ; সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমাদের জানা দরকার—

১) ঘটনাচক্রে খৃস্টীয় ১৮৯৬ সনেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও অপমানের প্রতি-বিধানে নবীন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষে এসে বোম্বাই মাদ্রাজ কলিকাতায় বহু প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে এ সম্পর্কে কথাবার্তা বলেন, সংবাদপত্রে প্রচার করেন, সভাতেও বক্তৃতা দেন— টিলক গোখলে ভাণ্ডারকর প্রভৃতির সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেন। অল্পকালের মধ্যে দেশে বিদেশে এই আন্দোলনের প্রতি সমাজসচেতন অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ নয়, অন্য দেশপ্রেমিক মানবপ্রেমিক মহাজন মনীষীরাও কতটা অবহিত হয়েছিলেন তার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আভাস পাই স্বামী বিবেকান্দের এক চিঠিতে (জয়পুর থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৭ তারিখে গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে লেখা)—

Mr. Setlur of Girgaon, Bombay ...writes to me to send somebody to Africa to look after the religious needs of the Indian emigrants.... The work will not be very congenial at present, I am afraid, but it is really the work for a perfect man. You know the emigrants are not liked at all by the white people there. To look after the Indians, and at the same time maintain coolheadedness so as not to create more strife —is the work there. No immediate result can be expected, but in the long run it will prove a more beneficial work for India than any yet attempted. I wish you to try your luck in this.... And godspeed to you !

—*Complete Works of S. V.* (1963),
Vol. VIII, pp 440-41

২) কলিকাতায় ১৯০১ ডিসেম্বরে ভারতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের বোম্বাই, বারাণসী ও কলিকাতার অধিবেশনে উক্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়।

৩) ১৮৯৬ খৃস্টাব্দ থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে দক্ষিণ আফ্রিকার এই আন্দোলন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে বহু সংবাদ, পত্র ও প্রবন্ধ, প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতের রাজধানী কলিকাতায় *The Englishman, The Statesman, The Amrita Bazar Patrika, The Bengalee* এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন। তন্মধ্যে শেষোক্ত পত্রিকা থেকে একটি এবং *The Modern Review* থেকে অন্য একটি উদ্ধৃতি দিলেই জনমানসে তৎকালীন প্রতিক্রিয়া

সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মডার্ন্ রিভিয়ুর উল্লিখিত সংখ্যায় গান্ধীজির ছবিও ছাপা হয়।

The Bengalee, January 1, 1908

Passive Resistance in the Transvaal.

The following telegram will be read with interest in this country :—

Gandhi, the Indian leader in the Transvaal, besides five other Indians and three Chinese residents, have been sentenced at Johannesburg to quit within forty-eight hours for refusing to register their names. There are about 70,000 Indians at present in the Transvaal and they have declined to conform to the Act. Gandhi says he awaits arrest.

So the Government of the Transvaal must now be face to face with a serious situation. 70,000 Indians declining to conform to the Registration Act is a spectalce which is as humiliating to the authorities as it redounds to the glory of the Indians themselves.

The Modern Review, February 1908, p. 192

Mr. M. K. Gandhi
and Other Passive Resisters.

Mr. M. K. Gandhi, the well-known Indian leader of the Transvaal, with many others of his way of thinking, have been sent to jail for not registering themselves according to the notorious anti-Asiatic regulations of that colony. All honours to

these sturdy patriots. May we be able to follow their example in thousands when the occasion comes!

৪) ফলতঃ ট্রান্স্‌ভালে ১৯০৮ থেকেই সত্যাগ্রহীরা দলে দলে অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সাহস শৃঙ্খলা ও বীর্যের সঙ্গে, প্রভূত দুঃখ ক্লেশ ও কারাবাস বরণ করতে থাকেন আর গান্ধীজিকেও কয়েদ করা হয়। ১৫ অক্টোবর তারিখে দ্বিতীয়বার তাঁর সশ্রম কারাদণ্ডের পরে ১৬ তারিখেই লণ্ডনে যে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে লালা লাজপত রায়, সভারকর, খাপার্দে, বিপিনচন্দ্র পাল ও আনন্দকুমারস্বামী যোগ দেন।

৫) ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ঋষিকল্প টলস্টয় *A Letter to a Hindu* পত্র-প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন: পশু-শক্তির দ্বারা পশুশক্তিকে ঠেকাতে পারে নি ব'লে ভারত পরাধীন; শতগুণে মহত্তর আত্মিক বলের দ্বারাই অত্যাচার-অবিচার-পরায়ণ যূথবদ্ধ শাসকের বাহুবল অস্ত্রবল ও কূট রাজনীতির পরাজয় সুনিশ্চিত। এই বহুপ্রচারিত প্রবন্ধের নিহিতার্থ গান্ধীজি স্পষ্টই অনুধাবন করেন এবং ১ অক্টোবর ১৯০৯ তারিখে যখন টলস্টয়কে প্রথম চিঠি লেখেন, প্রবন্ধটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতিও প্রার্থনা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস প্রতিরোধের বিবরণ জেনে টলস্টয় অত্যন্ত খুশী হন এবং ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে লেখেন: Therefore, your activity in Transvaal ...is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but all the world, will unavoidably take part.

উল্লিখিত বিবরণ থেকে এটুকু স্পষ্ট হয় যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই সূচনা (১৯০৮ জানুয়ারিতে সহকর্মীগণ-সহ গান্ধীজির এবং আরো বহুশত সত্যাগ্রহীর কারাবরণ) তার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব ঐ সময়েই বা অব্যবহিত পরে দেশবিদেশের মনীষী ও মানবপ্রেমিকদের দৃষ্টি এড়ায় নি; তার গভীর গম্ভীর ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যও কেউ কেউ বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে 'প্রসঙ্গকথা'য় (ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৫) বলেন 'ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই' আর প্রায়শ্চিত্তের প্রায়-সমকালীন এক প্রবন্ধে ('সমস্যা', প্রবাসী। আষাঢ় ১৩১৫) পুনশ্চ লিখলেন: 'য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হোক-না কেন, সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসী মাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্য তাহার সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।'

ফলতঃ বিংশ শতাব্দের সূচনায় 'নৈবেদ্য'[১] রচনা-কালেই ইংরেজের ঔপনিবেশিক নীতি যেমন কবির চিত্তকে বিচলিত ও চিন্তাকে উদ্দীপিত করেছিল, এ সময়ে তেমনি তাঁর নানা প্রবন্ধ—পথ ও পাথেয়, সমস্যা, সদুপায়, দেশহিত—মোটের উপর একই সুরে বাঁধা আর একই বক্তব্য-খ্যাপনে বাংলা ১৩১৫ সনের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ

১ তন্মধ্যে ৬৩-৬৮ অঙ্কে চিহ্নিত কবিতা-কয়টি দ্রষ্টব্য। '৬৫' ও '৬৭' বাদে অন্য কয়টি রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০৮) মুদ্রিত।

ও আশ্বিনের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। শেষোক্ত প্রবন্ধের সূচনাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'এ কথা নিশ্চিত মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে [নিত্যধর্মকে] অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই। অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।'[২]

অতএব, রবীন্দ্রনাথ নানা লেখায় দীর্ঘকাল ধ'রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় চরিত্রে তাই সাকার করে তুলেছেন এই সময়ে আর সমুদ্রপারে গান্ধীজির অভিনব সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে তা বহু জীবনে জীবন্ত এবং বহু ঘটনায় বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে — এই যৌগপদ্য যতই চমৎকারজনক মনে হোক, অহেতু বা আকস্মিক নয়।

ধনঞ্জয় গান্ধীচরিত্রের মুকুরিত প্রতিচ্ছবি না হলেও, রূপান্তর বলা চলে। স্বরূপের পার্থক্য ঘটে নি ; উভয়ের জীবনদর্শন মূলতঃ একই। এই আন্তরিক ঐক্যের বিশেষ কারণ এটিও, কবির ধ্যান-ধারণায় স্বভাবে অসত্য ও অন্যায় সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, পৌরুষ, বীর্য, এই গুণগুলি

---

২ দ্রষ্টব্য দশমখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী)। এ দুটি অনুচ্ছেদের বিশেষ তথ্য ও উদ্‌ধৃতি উক্ত গ্রন্থ থেকেই গৃহীত।

যতই থাক্, সবার উর্ধ্বে ছিল প্রেম মৈত্রী ও করুণার স্থান —হিংসা দ্বেষ বৈরভাব ও উগ্র জাত্যভিমান ছিল অধর্ম বা পরধর্ম। অর্থাৎ, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথে ও গান্ধীতে ছিল স্বভাবের মূলগত সাদৃশ্য। তবে, একজন কবি ও মনীষী, আর-একজন ছিলেন কর্মযোগী ও তপস্বী। নিজ নিজ পথে এগিয়ে চলেছিলেন একই লক্ষ্যে।

ফলতঃ সামাজিক ও স্বাদেশিক কল্যাণসাধনার একই প্রেরণা অন্তরে নিয়ে কিছু আগে আর পরে এই দুই মহা-পুরুষ ভারতের পূর্ব আর পশ্চিম প্রান্তে জন্ম নিয়েছিলেন সে বিষয়ে আজ কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পারস্পরিক সাক্ষাৎ পরিচয়ে কিছু বিলম্ব হলেও, সম্ভবতঃ কবি যে কর্মযোগীকে চিনে নিয়েছিলেন অনেক আগে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পরিকীর্ণ আছে নানা পুস্তকে পত্রিকায় ও নানা জনের উক্তিতে। এ কথাও সত্য লোকোত্তর মনীষার ও মহত্ত্বের যাঁরা অধিকারী, উৎতুঙ্গ পর্বত-চূড়ার মতোই অনেক উর্ধ্বে মাথা তুলে অনেক দূর পর্যন্ত তাঁরা দেখে থাকেন —দেশ কাল ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের থাকে এক-প্রকার global view বা বিশ্ববীক্ষা। সে বিচারেও বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকার তৎকালীন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে (সত্যাগ্রহের যখন থেকে সূচনা) বিশেষভাবে অবহিত থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে কতটা জানতেন গান্ধীকে তা না জানলেও, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়সমাজে গান্ধী-চরিত্রের বীরত্ব ত্যাগ ও মহত্ত্ব উত্তরোত্তর কিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষ্য দেয় ১৩০৭ বা ১৩০৯ সনের ভারতী পত্রিকা। 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে কবির ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরানী বলেন (পৃ ১৬৭): 'আর একজন

'বিদেশী'ও সেই সময় ভারতীর লেখক-তালিকায় ধরা পড়লেন —নাম তাঁর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ··· সেবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কলিকাতা কংগ্রেসে এসেছেন। আমাদের বাড়িতে একদিন একটি সায়াহ্ন পার্টিতে অন্যদের সঙ্গে এলেন।' ইত্যাদি। গান্ধীজির ইংরেজি লেখা সংগ্রহ করে বাংলায় যা ছাপানো হয় ১৩০৯ বৈশাখের ভারতীতে (পৃ ৩৭-৪২) সে হল : দক্ষিণাফ্রিকায় ভারতোপনিবেশ। প্রবন্ধশেষে পাদটীকায় বলেন অনু-বাদিকা তথা সম্পাদিকা সরলাদেবী : 'যে গুজরাটী বীর-পুরুষ তাঁহার বঙ্গবাসী ভ্রাতাদের তাঁহার বীরত্বের পদাঙ্কানু-সরণ করিতে আহ্বান করিতেছেন, দক্ষিণাফ্রিকায় তাঁহার কীর্ত্তি কতদূর অসাধারণ, ভারতীর পাঠকেরা সম্বাদপত্রের স্তম্ভে তাহার বিবরণ যথাকালে পাঠ করিয়াছেন আশা করা যায়। ১৩০৭ সালের ভাদ্র মাসের 'ভারতী'তে "বুয়র ও ভারতবাসী" নামক প্রস্তাবে [পৃ ৪৩০-৪৬][৩] ইহার সবিশেষ উল্লেখ ছিল।' বলা আবশ্যক ১৩০৯ বৈশাখের ভারতীতেই ছাপা হয় (পৃ ৭৩) একটি চতুর্দশপদী কবিতা : মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি। / যখন আমরা সবে জগৎ সমক্ষে ইত্যাদি। শ্রীদক্ষিণপ্রসাদ বসু -লিখিত এ কবিতার পাদটীকাটি বিশেষভাবেই সংকলনযোগ্য : গত ১৯শে জানুয়ারি [১৯০২ / ৬ মাঘ ১৩০৮] রবিবার অপরাহ্নে এলবার্ট হলে যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে মহোদয় এই মহাত্মার অলৌকিক জীবনের এক একটী ঘটনা ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করিতেছিলেন, তখন সমবেত

৩ ভারতী পত্রে এরই অব্যবহিত পরের রচনা রবীন্দ্রনাথের : চিরকুমার সভা। ধারাবাহিকভাবে মাসে মাসে ছাপা হচ্ছিল তখন ঐ পত্রিকায়।

শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়, সম্ভ্রম ও প্রীতির প্রবাহ ছুটিয়াছিল তাহা শুধু অনুভবেরই যোগ্য। সেদিন সভাতে অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন [রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না ?], এবং অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় প্রীতিগদ্‌গদ্‌স্বরে শ্রীযুক্ত গান্ধির আত্মবিলোপের সাময়িক একটী উদাহরণ বিবৃত করিয়া বিস্ময় ও সম্ভ্রম আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। — লেখক।/

১৯০১ ডিসেম্বরে কলিকাতা রাজধানীতে কংগ্রেস-অধিবেশনের সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে গান্ধী আসেন প্রচারার্থে সে কথা তাঁর জীবনকথার পাঠক জানেন। নেতৃস্থানীয় বহুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়; তন্মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভগিনী নিবেদিতা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁদের কথা বিশেষভাবে জানা যায়। যেমন বেলুড়-মঠে স্বামীজির সঙ্গে তেমনি জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে এসেও দেখা হয় নি গান্ধীর, ওঁদের অসুস্থতা-নিবন্ধন। রবীন্দ্রনাথ ঐসময় জোড়াসাঁকোয় ছিলেন কিনা জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকে কেবল একটি সভায় একই কালে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের উপস্থিতির কথা পাই যে বিবরণে, এ স্থলে তাই সংকলন ক'রে এ প্রসঙ্গের পঞ্জীকরণ শেষ করা চলে। 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৬। পৃ ৮) কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী বলেন : ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ··· আমি যখন কলেজের ছাত্র ··· বীডন পার্কে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বোধ করি উহা ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন। এই সভার উদ্‌বোধন-দিবসে শত গায়ক পরিবেষ্টিত হইয়া একত্র 'কোরাসে' রবীন্দ্রনাথ নিজে

সুর যোজনা করিয়া বন্দেমাতরম্ গান গাহিয়াছিলেন। তাহার তুল্য মাতৃবন্দনাগান আর জীবনে শুনি নাই।··· সেই অধিবেশনে আমি স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছিলাম। ঐ সভায় গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রথম ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ও বক্তৃতা দিয়াছিলেন।'[৪]

৩৫। পৃ ২৭ অরূপরতন (১৩৪২), সুরঙ্গমার উক্তি। রাজার প্রথম পাঠেও অনুরূপ।

---

৪ বর্তমান টীকার তথ্য প্রমাণ ও মন্তব্যাদির আংশিক সংকলন শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'গান্ধী-পরিক্রমা' গ্রন্থে (মিত্র ও ঘোষ। বৈশাখ ১৩৭৬) বর্তমান লেখকের স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে : গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ (পৃ ৩৩৪-৪৯)। কৌতূহলী পাঠক সে প্রবন্ধ দেখে নিলে ভালো হয়। এ স্থলে নূতন তথ্য অনেক যোগ করা হলেও, নূতন বক্তব্য কিছু নেই। ধনঞ্জয় বৈরাগীর রাজনীতি প্রজানীতির অভূত-পূর্ব ঘোষণায়, আলাপে ও গানে, গান্ধীজির জীবনাদর্শের তথা সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সার-কথাই যদি পাই, গান্ধী-চরিত্রের স্বরূপ উদ্ভাসিত কোন্‌খানে? ধনঞ্জয়ে যেমন তেমনি উদয়াদিত্যে তথা **অভিজিতে**। কেননা, গান্ধী অভিনব লোকনীতির প্রবক্তা ও প্রচারক শুধু নন, তারই অতন্দ্র সাধক, সৈনিক, সেনাপতি —একাধারে সবই। অস্ত্র কেবল অহিংসা, সহায় কেবল সত্য। সুতরাং একাধারে তিনি **ধনঞ্জয় আর অভিজিৎ, লোকগুরু ব্রাহ্মণ ও লোকনেতা ক্ষত্রিয়**। এভাবে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্তে যার সূচনা মুক্তধারা নাটকেই তার পরিপূর্ণতা। গান্ধী-জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেন কবিকল্পনারও ক্রমপরিণতি।

৩৬। পৃ ২৭ এ নাটকে নেই; ধনঞ্জয়ের এই গান মুক্তধারায়। প্রায়শ্চিত্তে পরিত্রাণে বৈরাগীর অন্যান্য গানের তাৎপর্য এ থেকে অভিন্ন।

৩৭। পৃ ২৮ মাধবপুর ঈশ্বরের পুরী আর শিবতরাই কল্যাণের ভূমি (উপত্যকা), এমন মনে করা চলে। মাধবপুরই মুক্তধারা নাটকে হয়ে উঠেছে শিবতরাই।

৩৮। পৃ ৩০ পরবর্তী আলোচনার সুবিধার জন্য নাটকের অঙ্ক-বিভাগ আমরা সাধারণতঃ উপেক্ষা করেছি এবং পর পর দৃশ্যগুলি গণনা ক'রে পরিত্রাণ ও প্রায়শ্চিত্তের তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ বিশ্বভারতী-প্রচারিত রবীন্দ্ররচনাবলীর যথাক্রমে নবম ও বিংশ খণ্ডে মুদ্রিত।

৩৯। পৃ ৩৮ প্রায়শ্চিত্ত, কারাগারের দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে পঞ্চম।

৪০। পৃ ৩৮ যেমন শ্রী প্রমথনাথ বিশী।

৪১। পৃ ৪২ ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ ও পরিনির্বাণ সবই তরু-তলে, পথিপার্শ্বে —সুবিশাল প্রকৃতির ক্রোড়ে। রবীন্দ্র-নাথের অন্যতম মানসপুত্র গোরার জন্মলাভ রাষ্ট্রবিপ্লবের রাত্রে ঠিক -যে ঘরে তা বলা যায় না। ১৩৩৫ বৈশাখের এক পত্র-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেন : মেয়েদের উপর প্রকৃতির তাগিদ যেমন মা হওয়ার, পুরুষের উপর সমাজের তাগিদ কেবল 'কেজো' লোক হবার। 'কিন্তু দৈবক্রমে একদল মানুষ আসে তারা তাগিদের ক্ষেত্রের বাহিরে জন্মায়। আকবর বাদসাহের মতো তাদের জন্ম ঘরে নয়, পথে।' ('নারীর মনুষ্যত্ব' । বিচিত্রা। ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭৬৯)

৪২। পৃ ৪৩ রাজা (দ্বিতীয় মুদ্রণ), তৃতীয় দৃশ্য।

৪৩। পৃ ৪৩ মহাত্মাজি হওয়ার একই বিপদ, 'বাপু' তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন আর নাটকে প্রবন্ধে কবিও বারে বারেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

৪৪। পৃ ৪৪ রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারার ব্যাখ্যা করেন শ্রীকালিদাস নাগকে লেখা ২১ বৈশাখ ১৩২১ তারিখের এক চিঠিতে। প্রচল পুস্তকের অথবা চতুর্দশখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর (বিশ্বভারতী) গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

৪৫। পৃ ৪৪ প্রথমে 'যক্ষপুরী', পরে 'নন্দিনী' নাম ছিল। রচনা ১৩৩০ সনের গ্রীষ্মে শিলঙ শৈলাবাসে।

৪৬। পৃ ৪৪ 'কালের যাত্রা' বা 'কবির দীক্ষা'কে আমরা ঠিক নাটক বলতে চাই নে, রঙ্গমঞ্চে রূপায়ণ অসম্ভব না হলেও।

৪৭। পৃ ৪৫ বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তবু উল্লেখযোগ্য — মুক্তধারা থেকে রক্তকরবীর নাট্যগতি যেন দ্রুততর। এ কথা অনুভব থেকেই বলছি, ঘড়ি ধ'রে বা অঙ্ক ক'ষে নয় —নাটক ছুটির অভিনয়ও দেখি নি।

মুক্তধারার পথটি প্রদক্ষিণপথ, 'সানুতে সানুতে আরোহণ' করলেও কম্বুরেখায়িত তার আকার প্রকার, তাই পাত্র-পাত্রীরা সকলেই ফিরে ফিরে আসছে। এর তুলনায় যক্ষপুরীর জটিল জালায়নের সামনে যে পথ, সোজা চলছে কোন্ লক্ষ্যে বা নির্লক্ষ্যে তা কে বলবে! যাত্রী নর-নারীদেরও সেই গতি, সেই মতি। ঈশান কোণে ঝঞ্ঝা-বাতের সংকেত আছে, সর্বনাশের। মানুষগুলো কেউ সুস্থ স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ মুক্তধারার 'পেট্রিয়ট' মানুষ-গুলোর থেকেও অসুস্থ ও অস্বাভাবিক। কাজেই নাট্য-ব্যাপারের দ্রুতি যে চরম সীমায় পৌঁছুবে তার আর আশ্চর্য কী।

৪৮। পৃ ৪৫ 'জগতের মেহনতি মানুষ এক হও' এই জয়ধ্বনি বা যুদ্ধঘোষণার মতোই আজও কি বলবার সময় আসে নি —'স্ত্রীজাতি এক হও। ঐক্যবদ্ধ হও সব দেশের মেয়েরা জাতি ধর্ম বর্ণ (ফর্শা কালো তামাটে পীত) রূপ গুণ বিদ্যা

বুদ্ধি বল -নির্বিশেষে' ? দেহ প্রাণ মন উৎসর্গ করে জীব-সৃষ্টি ও জীবনের পালন পোষণ নারীর কাজ; নারী স্বভাবে স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, কল্যাণময়ী। পুরুষশাসিত যে সভ্যতার আবহমান কালের অন্যতম লক্ষণ আর গর্ব ও গৌরবের বিষয় হল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব এবং রেষারেষি —জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম— নারীর কাছে তা অধর্ম ও অস্বাভাবিক। 'একমাত্র পুত্রের কারণে একপুত্রী জননীর যে স্নেহ সেবা প্রেম, সর্বজীবে সেই ভাব রক্ষা কোরো' —মহামানবের এ কথার অর্থ নারী ছাড়া আর কে বুঝবে? বুদ্ধ খৃষ্ট শ্রীচৈতন্য গান্ধী যদি বুঝে থাকেন ও আপন আচরণে অপরকে শিখিয়ে থাকেন, তার কারণ এই যে, তাঁদের ছিল মাতৃহৃদয়। মানবসভ্যতায় আমূল বিপ্লব আনবে নারী, তার সকল সম্ভাবনা সকল শক্তি তার আছে— এটা কি কবিকল্পনা মাত্র? দিবাস্বপ্ন? আমরা তা মনে করি নে। তবে, সেজন্য নারীকে সচেতন হতে হবে, শুদ্ধ হতে হবে, জীবধাত্রী জগজ্জননীর স্বরূপে প্রকাশ পেতে হবে— মোহমুগ্ধা আর মোহিনী হলে চলবে না। পুরুষও হবে তার সহযোগী। দুর্ভেদ্য কর্মজাল (প্রাক্তন দুষ্কর্মজাল) ও প্রাণহীন যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসবে 'রাজা' (এ ক্ষেত্রে মানুষ বা সর্বমানুষ) নূতন দিনের আলোয়— তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে। সেই নূতন সম্ভাবনার অভিযাত্রিনী, অভিসারিণী, তাঁর নন্দিনী।

৪৯। পৃ ৪৫ 'কবিগুরুর রক্তকরবী' (১৩৫৯) গ্রন্থে শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫০। পৃ ৪৫ জড়োপাসকদের প্রতীক নিজেদের বানানো ধ্বজপতাকা আর অপর পক্ষে প্রাণপূজারিদের প্রতীক ঈশ্বরের বা বিশ্ব-

প্রকৃতির আপন সৃষ্টি— রক্তকরবীর ফুল।

৫১। পৃ ৪৬ একাধিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীর আলোচনা করেছেন; গ্রন্থের প্রচল সংস্করণে (১৩৬৭ থেকে) কিছু তার পাওয়া যাবে। তন্মধ্যে *The Manchester Gurdian*'এ লেখা কবির বক্তব্যটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। অনেক সময়ে রবীন্দ্রকূটের ব্যাখ্যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, উপমায় অলঙ্কারে বক্রোক্তিতে বা সকৌতুক পরিহাসে তা সুন্দর হলেও অল্পবুদ্ধি অরসিকের কাছে যথেষ্ট প্রাঞ্জল নয়। এদের প্রতি কবির নিবেদন যেন এই : 'যদি বুঝে না থাকো, তোমার বুঝেও কাজ নেই।' ইংরেজি লেখাটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত, সুন্দর।

রবীন্দ্রনাট্যের অন্তঃপ্রেরণা

(পত্র)

প্রেরণা এক-প্রকার নয়। কোনো প্রেরণা অন্তর থেকে (অন্তরের নানা স্তর নানা গভীরতা আছে), কোনো 'প্রেরণা' বাইরে থেকে, কোনো প্রেরণা বাইরে থেকে মনে হলেও আসলে ভিতর থেকেই। আনুপূর্বিক-ভাবে ও সামগ্রিকভাবে সমুদয় তথ্যের সমাহার, স্তরবিন্যাস ও বিচার-বিশ্লেষণ থেকেই এ-সব স্থির করা সুসাধ্য বা নিরাপদ। কিন্তু সেরকম অন্তর্দৃষ্টিবান্ রসিক বা সুধীজন একমাত্র রচনার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পর্যালোচনা ক'রেও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না এমন নয় আর কদাচিৎ সেই বিচারে বা প্রত্যয়ে বাইরের থেকে সংগৃহীত রাশি রাশি 'প্রমাণ' বাতিল হয়ে যায় না অথবা অপ্রত্যাশিত নূতন তাৎপর্যে কোনো রচনা নূতন কোনো স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে না এমনও নয়। তবে, সাধারণ সমালোচকের পক্ষে বাইরের তথ্য ও প্রমাণ আর ভিতরের সর্ত্য বা তার আকার ইঙ্গিত একই কালে বিচার ক'রে দেখা অথবা 'জোঁকা' দিয়ে দেখা এইটেই প্রশস্ত রীতি। অর্থাৎ, যথাসম্ভব তথ্য সংকলন করা হোক (যদিও সব তথ্য কোনো কালেই জানা যাবে না) আর রচনার গভীরে যতটা সম্ভব প্রবেশ করা যাক্, সমগ্রভাবে রচনার ধ্যান ধারণা করা যাক্— রসিকের বা সমঝদার সমালোচকের এই হবে ঐকান্তিক প্রযত্ন। সম্পূর্ণ রচনাই তো আমাদের সামনে বর্তমান, সেখানে কোনো অভাব অসম্পূর্ণতা নেই, থাকবার কথা তো নয় —এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

মনে করা যাক্ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বিশুদ্ধ অন্তঃপ্রেরণা থেকেই লেখা। ও দিকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা' বাইরের তাগিদে রচিত এরকম মনে করার উপযোগী বহু তথ্য ও প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। তবু, অন্তঃপ্রেরণা, ভিতরের তাগিদ, গোপনে সঞ্চিত হয়ে অবশেষে উপচে-ওঠা স্বানুভব, কিভাবে কতটা সক্রিয় এ-সব ক্ষেত্রেও, সেটাই বিচার করে দেখতে হবে। স্বভাব-কবি বা খাঁটি-কবি

যিনি, তাঁর রচনায় ভিতরের প্রেরণা থাকবে না —এ হতেই পারে না। তার ভাব ভঙ্গী নিয়ে, মাত্রা নিয়ে, মূল্য ও মর্যাদা নিয়ে কথা। যেমন 'শারদোৎসব' তেমনি 'ফাল্গুনী' ভিতরের প্রেরণাতেই লেখা এটা মনে করবার কারণ আছে, বাইরের উপলক্ষ্য যাই ঘটে থাক্। বিশেষভাবে স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে— ব্যাবসাবুদ্ধির ইশারায় প্রকাশক তাড়াতাড়ি একখানি 'বিবাহের উপহার' বার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেও, কবি বললেন : না হে, না, শুধু পুরোনো কবিতা-গানের সংকলন হলেই চলবে না। রবি ঠাকুর তো আজও সশরীরে বর্তমান! রোসো, বাপু, দু-চারটে অন্তত নতুন কবিতা লিখে দিই! / বলতে না-বলতেই এক-ঝাঁক নতুন কবিতা গান এসে উপস্থিত। তখন তো শ্বেত কেশ শ্বেত শ্মশ্রু কবির, প্রেমের কবিতা লেখবার বয়সই নয়। প্রণয়িনী কেউ চোখের সামনে বা ঈষৎ গুণ্ঠন টেনে একটু আড়ালে রয়েছেন, তাও বলা চলবে না। ফলে, 'মহুয়া'র আশ্চর্য কবিতানিচয় বিশুদ্ধ অন্তঃপ্রেরণা থেকেই যে উৎসারিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'প্রবীণ যুবা' রবীন্দ্র-নাথের অনুভবে আর কথায় ছন্দে সুরে প্রেমের এমন এক অত্যাশ্চর্য স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে যা অন্যের কথা দূরে থাক্ কিশোর বা তরুণ কবিরও জ্ঞান-অগোচর ছিল। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র সৃষ্টিও ঐভাবে। শীতান্তে বা বসন্তে একই কালে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্তেরও আবাহন অথবা আবির্ভাব একটুও অসাময়িক বা অস্বাভাবিক নয়। 'গা-জুয়ারি' বলা চলবে না। কেননা, অন্তরে একই কালে সকল বয়স, সব ভাব, সব ঋতু না থাকবে কেন? থাকাটাই তো বড়ো কবির বড়ো কবিত্বের লক্ষণ।

ঐভাবে সৃষ্ট হয়েছে 'তাসের দেশ' 'শ্যামা', নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' আর 'মায়ার খেলা', 'বিসর্জন' ও 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এবং 'তপতী', সবই। বৌমা অপটু হাতে অপরিণত প্রতিভায় কিছু-একটা খাড়া করতে গেলেন অথবা অত্যুৎসাহী অমুক-কোম্পানি কবির রচনায় (বউঠাকুরানীর হাট না রাজর্ষি ?) অকস্মাৎ স্থূলহস্তাবলেপে

উদ্ভত আর তারই মুশকিল-আসানে তাড়াতাড়ি লেগে গেলেন রবীন্দ্রনাথ নতুন রচনায় বা পুরাতনের নবকলেবর-দানে, এ-সবই বাইরের খবর। এর তাৎপর্য বেশি দূর যায় না আর বেশি গভীরেও যায় না। বাইরের প্রয়োজন বা দাবি অথবা আবদার এখানে হেতু নয়, হেত্বাভাস মাত্র। এ ব্যাপারে ন্যায়শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা ভালো। সোজাসুজি এই বুঝি— গ্রামোফোন রেকর্ডে গান যে বাজে, ঐ যন্ত্র বা যন্ত্রের করধৃত সূচী, অথবা যন্ত্রনিবদ্ধ ঘুরন-চাক্তি সে গানের স্রষ্টা নয়। অজস্র আগুনের ফুল কাটে তুবড়ি, দেশলাই-কাঠি বা কাঠি জ্বেলে দেয় যে ব্যক্তিটি অবশ্যই তার কারণ হতে পারে না। এমন-কি বীজ মাটিতে পুঁতে যে জল দেয় —মাটি জল বাতাস রোদ এরাও— চারা গাছের, পরিণামে তার পল্লব ফুল ফলের, যথার্থ হেতু বা নিয়ামক বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে কারও 'প্রেরণা' অর্থাৎ সহায়তা এক আনা, কারও বা এক পাই, কারও বা আরো কম।

কোন্ প্রেরণায় কী লেখা হয়েছে? 'রাজর্ষি' আর 'চিত্রাঙ্গদা' কেমন করে লেখা হল আর কেন? 'বিসর্জন' কী করে হল? 'প্রায়শ্চিত্ত'? 'পরিত্রাণ'? 'মুক্তধারা'? 'ডাকঘর' কী ও কেন? কেন 'ভগ্নহৃদয়'— 'মায়ার খেলা'— 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা'? নিরস্ত প্রশ্নমালা আর বারংবার একই প্রশ্ন। অথচ অল্পই তার জবাব মিলেছে বা মিলতে পারে। বড়ো জটিল তত্ত্ব। বড়ো দুর্বোধ্য দুর্ভেদ্য এই প্রসঙ্গ। শার্লক হোমের পক্ষেও ঘটনার সব সূত্র আবিষ্কার ক'রে, রটনার সকল আবর্জনা সরিয়ে ফেলে, একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা এ ক্ষেত্রে খুব সহজ হবে না। না হোক, তবু এই মানসিক মৃগয়া বড়োই শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আপাত-প্রতীয়মান যেটা যেমন, সেই-যে আসল ঘটনার আকার প্রকার বা প্রকৃতি এমন নয়। তারই জলজ্যান্ত বড়ো একটা দৃষ্টান্ত হল রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। ছবি কেন এঁকেছেন? কে আঁকিয়েছে? কি-ভাবে আঁকা হয়েছে? প্রকরণ-গত বিশ্লেষণের ফলে এ প্রশ্নের যা উত্তর

দিতে পেরেছেন আচার্য নন্দলাল তা শ্রীপুলিনবিহারী সেন - সম্পাদিত রবীন্দ্রায়নের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যাবে। কিন্তু নেই রসের প্রেরণা ? এ রচনায় আঙ্গিক বা তন্ত্র অভাবই আগে ? এটা কেমন ক'রে হল— অভাব থেকে ভাব! (নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ।) মন্ত্রমুগ্ধ কবিকর্তৃক শূন্যমনে শূন্যপটে ক্রমে ক্রমে রেখাছন্দ রূপছন্দের আরোপ ? তার পরেই ভাব— ভাষা (মুখ ফুটে যা বলতে চায় ছবি)— তাৎপর্য— রস ? হাঁ বটে, না'ও বটে। তবে 'না' ই বেশি জোরদার।

স্বপ্নস্মৃতির মতো। উল্টোপাল্টা দেশ থেকে ফিরে এসে, জেগে উঠে, বিপরীত পারম্পর্যেই আমরা সব স্মরণ ক'রে থাকি। 'উলট-পুরাণ' আর-কি। মনে করো-না কেন অতল গভীর পাতালে প্রবেশ করলেন বীর হনুমান রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার করতে। সুরঙ্গের মুখে তাঁর অনন্তনাগোপম ন্যাজের ডগাটুকু আমাদের হাতে ঠেকল। সেইটে ধ'রে ধ'রে ধীরে ধীরে এগোলে (সূচীবেধ্য অন্ধকার তো!) হনুমান তো হনুমান, শেষ পর্যন্ত রাম লক্ষ্মণ আর মহীরাবণের বেটা অহীরাবণও মিলে যেতে পারে। এখন বিচার করো কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে। লেজের হনুমান কিম্বা হনুমানের লেজ ? শ্রীরামের হনুমান অথবা হনুমানের শ্রীরামচন্দ্র ?

ফলকথা, রচনা ব্যাপারটা আসলে র-চ-না নয়, জোড়া-তাড়া দিয়ে যা-হোক-একটা-কিছু বানানো নয়। নির্মাণ নয়। সে হল উদ্‌ভেদ, উদ্‌ঘাটন, আবিষ্কার। কদাচিৎ আবির্ভাবও বলতে পারো। যা আছে / ছিল / থাকবে তারই প্রকাশ। আপাতদৃষ্টিতে 'নিয়মরহিত' হলেও আসলে 'নিয়তিকৃত' কিনা inevitable। সুতরাং প্রেরণা ব্যাপারটা কী ? প্রেরণা তো কর্তা নয়, ক্রিয়া বা করণ বা কারণ। কিন্তু কারণেরও কারণ আছে। যথার্থ শিল্পসৃষ্টির, কবিতা মূর্তি বা ছবির, যথার্থ স্রষ্টা কে বলা বড়ো কঠিন।

একটু আশ-কথা পাশ-কথায় দোষ নেই। রীতিমত প্রবন্ধ যখন নয়। আপাতত যা মনে আসে তাই লেখা ভালো। কাঁচা মাল। পরিচ্ছন্ন চিন্তা, ভাবমূর্তি, প্রাঞ্জল ভাষা, গভীর গম্ভীর তাৎপর্য, সে-সব পরে জেগে উঠবে যদি ভাগ্যে থাকে আর যার ভাগ্যে থাকে।

অধ্যাপক অশ্রুকুমার বলেছেন নাট্যকেন্দ্রের কথা। 'নাট্যকেন্দ্র' —আনন্দময় বেদনাময় মর্মস্থল, হৃৎপিণ্ড বা প্রাণকেন্দ্র, সব রচনাতেই থাকবে বৈকি। রসাত্মক রচনাই তো আর্ট্, কাব্য। সেই রসের একটি বিশেষ 'কেন্দ্র' থাকবেই যা নিয়ে রসরূপটি দানা বেঁধেছে। চেতনাত্মক রচনাই কাব্য। সেই চেতনার থাকবে একটি সংহত বিন্দু (focussing point)— তাই না? ট্র্যাজেডিতে তা প্রকট হবে অথবা তার আভাস ফুটে উঠবে, সুস্পষ্ট ইঙ্গিত জাগবে পরিণামে —এটাই দস্তুর; এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু, ব্যতিক্রম কি নেই? শ্রীঅশ্রুকুমার শিকদার শ্যামার ক্ষমাহীন পরিণামে সেই আনন্দবেদনাময় চেতনার উদ্ভাস খুঁজে পান নি? সত্যই কি কবি এখানে তাঁর স্বভাবসংগত প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হয়েছেন? 'শ্যামা' তাঁর অন্য সব নাট্যসৃষ্টির তুলনায় দল-ছাড়া? সৃষ্টি-ছাড়া? আমার মনে হয়, বস্তুতঃ তা নয়। অন্যত্র বলেছি এই নাটকের চূড়ান্ত বক্তব্য (যা 'নাট্যকেন্দ্র', কেমন?) তা এর পরিণামে নয়, এর মধ্য-স্থলেই উত্তীয়ের অকুণ্ঠ আত্মদানে বিগ্রহান্বিত হয়েছে। এক হিসাবে সে এই নৃত্যনাট্যের প্রাণ, এর পরম বিশিষ্ট চরিত্র, এর নায়ক, এর ভাস্বর মধ্যবিন্দু।[১] এজন্যই বলব রবীন্দ্রনাথ কবি বা দ্রষ্টা হিসাবে তাঁর স্বধর্ম থেকে তাঁর স্থির প্রত্যয় থেকে এই নৃত্যনাট্যেও স্বেচ্ছায় বা অবশে ভ্রষ্ট হন নি (বরং তার বিপরীত)— সেটিকে প্রকাশ করেছেন কেবল ভিন্ন ভাবে, অপূর্বভাবে।

১ স্রষ্টা স্বয়ং কতটা সচেতন ছিলেন এ ব্যাপারে তা আমি জানি নে। হয়তো সৃষ্টির পরেই চোখ কচ্‌লে চকিত বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছেন এর পানে— যেমন বিস্মিত, তেম্‌নি প্রীতও হয়েছেন।

পুনশ্চ

পুরোনো লেখাই আজ যখন নতুন করে নকল করছি, অধ্যাপক অশ্রুকুমারের সুচিন্তিত সুলিখিত বইখানি হাতের কাছে নেই। না থাকলেও আর অনবধানে বা অন্য কোনো কারণে ভুল বুঝে থাকলেও, সেই উপলক্ষ্যেই আমার কিছু বক্তব্য বলবার সুযোগ পেয়েছি এখানে। রবীন্দ্রনাথ গ্রীক বা শেক্‌স্‌পীরীয়ান ট্র্যাজেডি প্রায় লেখেন নি। 'রাজা ও রানী' ব্যতিক্রম, উত্তরকালে তা নিয়ে তাঁর প্রচুর অস্বস্তি ও অসন্তোষ ছিল। 'বিসর্জন' থেকেই রচনার মোড় ফিরেছে।[২] কেবল নেতি-নেতি-নেতি নয়; ইতিবাচক অস্তিসূচক স্থিরপ্রত্যয় জেগে উঠেছে।

---

২ অবশ্য, ১২৯৭ বঙ্গাব্দে যে নাটকের প্রথম প্রচার তাতে এ কথা তেমন স্পষ্ট হয় না। ১৩০৩ আশ্বিনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম-সংগ্রথিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে 'বিসর্জন'-গ্রহণকালে প্রচুর পরিমার্জন পরিবর্জন আর কিছু সংযোজন হয়ে থাকলেও, এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাট্য-ভাবনার মৌলিক পরিবর্তন কিম্বা চমৎকারজনক নূতন পরিণতি উহ্যই থেকে যায়। সেটি স্পষ্ট হয়, যে মুহূর্তে নাটকের সব-শেষে যোগ করেন রবীন্দ্রনাথ (১৩০৬ বঙ্গাব্দের "দ্বিতীয় সংস্করণ" থেকেই এই রূপটি দেখা দিয়েছে)—'পুষ্পঅর্ঘ্য লইয়া রাজার [গোবিন্দ-মাণিক্যের] প্রবেশ।' যার ভিতরের কথা হল রাজার উদ্দেশে রাজা ও রাজ্য -ত্যাগিনী অভিমানিনী রাজরানীর অপ্রত্যাশিত এই উক্তি : আজ দেবী নাই,—

তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা!

আর শেষ কথা হল দেবী-অর্চনার প্রচলিত প্রথার সংরক্ষক ব্রহ্মণ্য-অভিমানী রঘুপতির এই ঘোষণা :

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,— জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী! অমৃতময়ী!

বিষয়টি টীকায় বা পাদটীকায় বিচার্য কতটা বলতে পারি নে । খুলে বলতে হলে বড়ো আকারের বই লিখতে হয়। সে অভ্যাস সাধ্য আর প্রবৃত্তিও নেই। ধীমান্ ব্যক্তির পক্ষে বোধ করি ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

পরিভাষায় বলতে গেলে—

অন্তঃপ্রেরণা— অন্তরের নানা স্তর থেকে প্রেরণা।

অনুপ্রেরণা— এক কালের প্রেরণা অন্য কালে ধ'রে রাখা অথবা আচম্‌কা স্মরণে বা স্বানুভবে জেগে ওঠা।

পরিপ্রেরণা— ভিতরের প্রেরণাই বাইরে চার দিক থেকে, পরিবেশ থেকে, কুড়িয়ে পাওয়া। ভিতরে বাইরে একাকার।

যাতে সার্থক কবিতা ছবি নাচ গান বা মূর্তি হয়, আসলে সেরকম সব প্রেরণাই ভিতরের। বাইরে উপলক্ষ্য ঘটে নিত্য নতুন। থেকে থেকে চমকে উঠতে হয় ব্যাপার দেখে, কোনো বস্তু বা বিষয় লক্ষ্য ক'রে। তখন আপনা থেকে মুখে এসে পড়ে : তোমায় / হিয়ার ভিতর হৈতে / কে কৈল বাহির ! / যা প্রেরণা নয় তা প্রেরণ বা প্রেরণম্। কেবল সেইটুকু ধ'রে, রাষ্ট্র সমাজ রাজা বাদশা বণিক ধনিকের ফর্মাশে বা ফতোয়ায়, রসাত্মক কোনো কিছুরই উদ্ভব হতে পারে না। জীব বা উদ্‌ভিদ যে হয় সে এক আশ্চর্য তত্ত্ব। শুক্‌নো তত্ত্ব নয়— সত্যই। যা ভাবতেও মন খুশি হয়ে ওঠে। আর, নির্ভুল মাপ-জোপে উত্তম মাল-মশলায় বাড়ি বানায় রাজমিস্ত্রি খেটেখুটে দিনের পর দিন ইটের সঙ্গে

কোথায় ট্র্যাজিডি! অন্তত বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি কিছুতেই বলা চলে না। ক্ষমাহীন ট্র্যাজিক পরিণামের নির্মম নিরবধি কুহেলী কী আশ্চর্যভাবে সরে গেল, মুছে গেল, দেখা দিল রবীন্দ্রজীবনবীক্ষার দূরবিসর্পিত এক নূতন দিগন্ত। চৈতন্যলাভ হল পক্ষ বিপক্ষ উভয়েরই, দ্বন্দ্ব দূর হল— সঙ্গীত পৌঁছল তার পরিপূর্ণ শমে।

ইঁট গেঁথে গেঁথে। তার আগে স্থপতি / ইঞ্জিনিয়ার তাঁর আপিসে ব'সে, ঘূর্ণিপাখার বাতাসে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে, আপন বিদ্যাসাধ্যমত একটা নক্সা ছ'কে দেন। একটা কোণার্ক খাজুরাহ গোবিন্দমন্দির বা তাজমহলের রূপ, পরিপূর্ণ রূপ, কোনো-না-কোনো রূপভাবুক কবি বা আর্টিষ্টের জাগরস্বপ্নে দেখা দিয়ে, যেন 'বৃন্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি' পরিপূর্ণ-যৌবনে-গঠিতা উর্বশীর মতোই, তাঁকে চকিত বিস্মিত পুলকিত ক'রে তোলে— অস্থিরও করে। তবে তো ? কত বিনিদ্র রাত, কত স্বপ্নময় সাধনাময় দিবা, তপোময় মুহূর্ত, কত আশা-নিরাশা সম্ভব-অসম্ভবের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, সবই পার হয়ে সে যখন বাস্তবে রূপ নেয় বা নিতে থাকে, ঐ মিস্ত্রি মজুর এসেই খোন্তা শাবল কর্ণিক ও ওলন ধরে— সাধারণ লোক তাই ছাখে চেয়ে চেয়ে ; স্বপ্নকে জানে না। কোথাকার জিনিস কোথায় এল, কেন এল, কেই বা আনল, কেউই জানে না। সাধারণের জানবার কথাও নয়। স্রষ্টা নিজেই কি জানেন ? রসিক তবু জানতে চায় আর ঠিক 'জানা' না গেলেও 'বোধে বোধ' করতে পারে। ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর হল সেই রসের অনুভব।

পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার[১] না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। ···পরীক্ষা করেছি, লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায়[২] সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি,[৩] বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ। ···আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে-একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে[৪] তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। ···সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। ···কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে[৫] কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন— তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলি এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে তাঁর নিজের ভাষাতেই গদ্যছন্দের স্বরূপপরিচয় ও তার ক্রমিক অভিব্যক্তির ইতিহাস অনেকটা স্পষ্ট হবে। ধ্যানে ও কল্পনায় জানেন তিনি ধলেশ্বরী-নদীতীরে এক স্বপ্নের স্বর্গকে, যেখানে 'সমস্ত আকাশে বাজে অনাদিকালের বিরহবেদনা' আর—

'অনন্ত গোধূলিলগ্নে ···
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।'

এ দিকে চোখের সামনে না দেখেও উপায় নেই কিনু গোয়ালার

গলিটাকে, যার— 'কোণে কোণে জমে ওঠে, প'চে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভুতি,
মাছের কান্‌কা, মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী-যে!'

সুন্দর অসুন্দর, সত্য ও কল্পনা, সম্পূর্ণ এবং ছিন্ন, এদের মেলাবার সমস্যা চিরদিনই রয়ে গেছে। আভাসে জানা যায় না তা নয়—

'আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।'

কিন্তু তা হলেই লক্ষ্যলাভ হয় কি? 'বাঁশি' কবিতায় কিনুগোয়ালার গলির অধিবাসী হরিপদকে নিয়ে যে রসরূপের সৃজন, তাতে 'মিল' না থাকলেও পদ্যছন্দ রইল তো, লক্ষও রইল সুরের স্বর্গের দিকেই। এই ছন্দে এই পরিবেশে আর এই ভঙ্গীতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো না 'ছেলেটা', অতি 'সাধারণ মেয়ে' কিম্বা যে-কোনো 'একজন লোক'— 'আধ-বুড়ো হিন্দুস্থানি
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো। ...
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগ্‌ড়া' —

ছাতাটা যে তালি-বসানো আর জুতো-জোড়া ওঠে লাঠির আগায় নালা নর্দমা পাঁক পার হতে গেলে, সে তো না বললেও চলে। কথা এই যে, বিশেষ করে চেয়ে দেখবার মতো লোকটা কি? কেন নয়? কবি বল্লেন— 'সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,

যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি,— একজন লোক মাত্র।'

অর্থাৎ, লোকটি কবিকে দেখেও দেখে নি; ঐ শ্বেতশ্মশ্রু শুভ্রকেশ লোকটি কে, সমস্ত বিশ্বসংসারের সঙ্গে— প্রত্যেকের সঙ্গে— কী তাঁর সম্পর্ক কতখানি আত্মীয়তা কিছুই না জেনে সে বঞ্চিত হয়েছে বৈকি। কবিও যখন তেমনি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, যখন তাঁর চোখ দেখলেও তাঁর মন দেখে না, হৃদয় দেখে না, তখন তিনি কি কবি ?—

'কবি বলো চিত্রী বলো আপনার রচনার মধ্যে সে কী চায় ? সে বিশেষকে চায়।··· বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম।··· সুন্দর সেই বিশেষের কোঠায় এসে পড়ে তো ভালো, নইলে সুন্দর ব'লেই তার গুমোর নেই। আর্টের এলেকায় সাহেব-পাড়ার সরকারী বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের।' —এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের।

এই বিশেষ দৃষ্টিতেই দেখেছেন তিনি— রামের চেয়ে লক্ষ্মণ মনোহারী, কলঙ্কাঙ্ক ভাঁড়ুদত্ত হীরামালিনী বিশিষ্ট রূপের ও চরিত্রের গুণে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। আর্টিষ্ট্ জানেন— মৃগ ময়ূর সিংহ শার্দুলের থেকে গর্দভের রূপ গুণ কিম্বা আর্ট্-যোগ্যতা কিছুমাত্র অল্প নয়, বিশেষতঃ ওদের নিয়ে যখন বহুদিন ধ'রে বহু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে অথচ ধোপার বাড়ির গাধার দিকেই এতদিন কেউ চেয়ে দেখে নি। বিশ্বের সব-কিছুই বলছে: অয়মহং ভোঃ! এই-যে আমি! জীবনের এই পর্বে অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ— সেই আহ্বান শুনে তাকে প্রত্যক্ষ করা, আর্টের আঙিনায় ডেকে এনে স্বীকার করা, সমাদর করা, এটাই হল এ যুগের বিশেষ কবিকৃত্য। অচ্ছুৎ ব'লে অসুন্দর ব'লে কাউকেই প্রত্যাখান করা চলবে না।

এই মতে আর এই পথেই ইংরেজি সাহিত্যে ইতিপূর্বে হুইট্‌ম্যান বা কার্পেণ্টার গদ্যছন্দে সৃষ্টি করেছেন যে কাব্য, তাতেও আছে বিশ্বের

বিস্তার। নেই বাহ্যিক শুচি-অশুচি সুন্দর-অসুন্দর উচ্চ-নীচ নিয়ে সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি।

অনুরূপ বিশ্বব্যাপকতাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। আশ্চর্য এই যে, বিস্মৃতপ্রায় 'পুষ্পাঞ্জলি'র স্বপ্নাবিষ্ট অপরিণত গদ্যছন্দ, পরিণত বয়সের 'লিপিকা'তেও ভীরু উপক্রম, এগুলির পরে এটাই রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে লেখা প্রথম কবিতা। *The Child* লেখেন ইংরেজিতে; এ তার আক্ষরিক ভাষান্তর নয়, রূপান্তরই, পূর্ব প্রেরণাই নবজন্মে নূতন শরীর ধারণ ক'রে হয়েছে— নূতনতম— সার্থকতম কবিতা।

সীমাহীন দেশ কাল ও নিসর্গের ভূমিকায় সর্বমানবের স্মৃত বিস্মৃত 'ইতিহাস', তারই ভিতরে ভিতরে চিরবিকাশশীল মানবাত্মার চিরসন্ধান চির-অভিযান— শুভ অশুভ, সুন্দর কুৎসিত, সূক্ষ্ম স্থূল, স্বপ্ন ও বাস্তব, প্রেম ও হিংসা, এ-সবেরই নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে সব-শেষে ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে জ্যোতি ও আনন্দের রূপ : মানুষের গৃহে মাতৃ-অঙ্কে নগ্ন শিশুর বেশে অপরাজিত চিরপ্রাণ : শুচি, সুন্দর, অপাপবিদ্ধ।

রবীন্দ্র-গদ্যছন্দের এক প্রান্তে থাকে যদি এই 'শিশুতীর্থ', অন্য প্রান্তে আছে মনে করতে পারি পত্রপুট কাব্যের 'পৃথিবী'। সমগ্র মানব-ইতিহাস বা সকল যুগ সকল জাতি নয়, একক ব্যক্তির মানব-জীবনই এর প্রস্থানভূমি। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ প্রাণের আবাস এই পৃথিবী থেকে যাবার আগে বলে যেতে চান—

> 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী!...
> মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা,
> বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
> মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে,
> মানুষের জীবন দোলায়িত করো তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।...
> শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে
> তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে

আজ রেখে যাব আমার ক্ষতবিক্ষত লাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।...
অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী,
মেঘলোক উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎমৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।...
স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি; পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা।...
দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার
একটি তিলক আমার কপালে।'

গদ্যছন্দই বটে, তবু মনে হয় না কি অদৃশ্য মৃদঙ্গে পাখোয়াজে বোল বাজছে আর অবিশ্রুত সেই মধুর গম্ভীর মন্ত্রের তালে তালেই অপূর্ব এই কবিতার বাক্যগুলি স্তবকগুলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত?

সত্য বটে 'গদ্যছন্দ' কথাটি শুনলেই 'সোনার পাথর-বাটী' মনে হতে পারে। অথচ নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিকেই যদি প্রতিভা বলা হয়, অতীতের যে-কোনো নজিরেই তার নিত্যনূতন সাধনা ও সিদ্ধিকে নিন্দিত বা নিষিদ্ধ করা চাল না। কাব্যলোকের সীমানাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে প্রায় সমস্ত সংসারটি তার সামিল করবেন ব'লেই গদ্য-ছন্দ নিয়ে কবির এই পরীক্ষা। আসলে কেবল শব্দগত ওজনের, ছক-বাঁধা মাত্রা ও যতির, ছন্দ এ নয়— ভাবেরই ছন্দ। তাই বিশেষ আবেগে ও আবেশে বিশেষ কথায় জোর দিতে কিম্বা দরদ ফোটাতে, কর্তা কর্ম ক্রিয়া পদের পারম্পর্যভঙ্গ, যেটা মৌখিক আলাপেরই চিরায়ত বা অন্তর্নিহিত এক প্রবণতা, সেটুকুই এর বিশেষত্ব। এ কথা মনে রাখা দরকার, ছন্দের বন্ধনে যিনি ছিলেন চিরমুক্ত (তটের বন্ধনে যেমন নদী), তার বাইরেও তাঁরই মুক্তি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই গদ্যছন্দে। বিষয়ভেদে এর যে বহু বৈচিত্র্যও ঘটেছে তার সাক্ষ্য দেয়— কোপাই, ছেলেটা, সাধারণ মেয়ে, শিশুতীর্থ, প্রথম পূজা অথবা পৃথিবী।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে এই গদ্যছন্দেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আবেগ ও চিন্তা, সামগ্রিক জীবনদর্শন ও প্রাণপূর্ণ অনুভূতি, দুয়েরই একীভূত প্রেরণায় রবীন্দ্রকাব্যে অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল বলাকায়। পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী পার হয়ে প্রায় সার্ধ এক দশকে সেটি এসে থামল পরিশেষ কাব্যে। সপ্ততিবর্ষের পদবীতে উঠে দাঁড়ালেন কবি। ভাব ও ভাষার সিদ্ধি এমনি অনায়াসলভ্য, যে, নূতন কোনো বিষয় আর নেই, পুলকশিহরণ নেই নব নব আবিষ্কারের, তাই 'প্রেরণা' বা আন্তরিক তাগিদও নেই নূতন রচনার —এইটেই মনে হয়েছিল।

শিল্পী ও কবি -জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, নূতন ভাব না হলেও নূতন ভাষা, নূতন ছন্দ, নূতন উপায় উপকরণ ও কলাকৌশল। ফলে পুরাতন রসসামগ্রীই, চিরদিনের এই জগৎ ও জীবন, দুঃখ সুখ, রাগ বিরাগ, বিরহ মিলন —নিমেষে সবই নূতন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্ষেত্রে গদ্যছন্দ দিয়ে সেই উদ্দেশ্যই বিশেষ-ভাবে আর বিস্ময়কর-ভাবেই সিদ্ধ হয়েছে। দেখা যায়, জীবনের এই পর্বে তিনি এমন অনেক কবিতা লিখেছেন রীতিমত ছন্দে, যার ভাব ভাষা অলঙ্কার শব্দসঙ্গীত কিছুই নিন্দার নয় অথচ কী যেন সংহত আবেগ ও আবেশের ন্যূনতা ঘটেছে —এটি হয়তো অনুমান করেছেন রসিক আর বিশেষভাবে অনুভব করেছেন স্বয়ং কবি। তাই ঐ কবিতা ঐ বিষয়-বস্তুই গদ্যছন্দে ভেঙে গড়েছেন তিনি আর নূতন প্রাণসঞ্চারে নূতন রসের দ্যোতনায় পুলকিত হয়ে উঠেছেন একই কালে কবি ও রসিক। এটি তো বাস্তব ঘটনাই, যে, গদ্যছন্দ-অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নবযৌবন ও নববল লাভ করেছে রবীন্দ্রপ্রতিভা। কবিপ্রতিভার চরিত্রগত বিশেষ বিবর্তনেরও অনুষঙ্গী এই গদ্যছন্দ।

অন্য কবির ক্ষেত্রে এ প্রয়োজন হয়তো নেই। এ ছন্দে অধিকার-লাভ ও সার্থক সৃজন হয়তো যার-পর-নেই দুরূহ হবে —এ কথা ইঙ্গিতে ইশারায় রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন আর আমাদেরও মনে রাখা

ভালো। —'বড়ো কঠিন সাধনা যার / বড়ো সহজ সুর'।[৬]

১৩৩৮ সনের শ্রাবণে শুরু করে কিছুকাল পর্যন্ত নব-উদ্ভাবিত এই গদ্যছন্দকে রবীন্দ্রনাথ নূতন হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পরে নূতন আবেগ আনন্দ ও প্রেরণা নিয়ে ফিরেছেন চিরায়ত কবিতায়, ছন্দে, মিলে, বিশেষতঃ সঙ্গীতে। কেননা, গীতিকবিতাই রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্ব-শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক, সব দেশে সব যুগের সাহিত্যে ও সৃষ্টিতে সেই তাঁর অলৌকিক শ্রেষ্ঠতার সীমা।[৭]

পুরোগামী পৃ ৮৩ - ধৃত কিছু বক্তব্যের অনুকূলে ব্যাখ্যা ও বিবৃতি দেওয়া গেল পরবর্তী ১-৫ সংখ্যক উত্তরটীকায় আর এই পৃষ্ঠার বিষয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে পরের দুটি টীকায়।

উত্তর- টীকা ও টিপ্পনী

১ নৃত্যভঙ্গী / লাস্যগতি অথবা সঙ্গীত মাত্র ?

২ সজ্ঞান অনুশীলনের কোনো ইচ্ছা বা অভিপ্রায় না থাকলেও, স্বতই এসে যায় নি কতকটা 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ? এ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-যোগে বিশদ আলোচনা আছে বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৬৮), পৃ ১৮৩-৮৬।

৩ বাক্য ভেঙে ভেঙে সাজানোর বিরল একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তবু ১৩২৬ আশ্বিনের ভারতীতে ; এটি হল লিপিকার প্রথম পর্বের শেষ কথিকা : প্রশ্ন। কিভাবে ভারতীতে ছাপা হয় তা দেখা যাবে লিপিকার অধুনা-প্রচলিত সংস্করণে বা মুদ্রণে, গ্রন্থপরিচয়ের শেষে।

৪ রঙ্গমঞ্চে নয়, বলতে গেলে সর্বসাধারণের বা সজ্জন সামাজিকগণের সমভূমিতে।

৫ 'মিল'-ছুট ছন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এগিয়ে যান শনৈঃ শনৈঃ 'মিল'-ছুট গদ্যছন্দের ব্যবহারে, এখানে তার একটি তালিকাও দেওয়া চলে। পরিশেষ (ভাদ্র ১৩৩৯) কাব্যে কোথাও গদ্যছন্দের ব্যবহার হয় নি ; 'মিল'-ছুট ছন্দের প্রকরণগত পরীক্ষা যে ৬টি কবিতায়, সেগুলি সবই এখন পুনশ্চ কাব্যের নূতন সংস্করণের তথা মুদ্রণের অঙ্গীভূত। অতএব কেবল প্রচলিত পুনশ্চ কাব্যের কবিতা-গুচ্ছের একটি কালক্রমিক তালিকা দিলেই এই পর্বে রবীন্দ্র-কবি-কৃতির প্রায় সব ক'টি পদক্ষেপ গুনে নেওয়া যাবে ; তার সঙ্গে যোগ করতে হবে, অবশ্য, শেষ সপ্তকের প্রথম কবিতাটি— তাতে তারিখ দেওয়া আছে ১৩৩৯ সনেরই। পুনশ্চ-ধৃত 'তীর্থযাত্রী' ও 'চিররূপের বাণী' লেখার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা নেই, লেখাও এক-রকম অন্যের অনুরোধে-উপরোধে— অতএব, ও-দুটি তালিকায় না ধরলেও ক্ষতি নেই। আলোচ্য ৪৯টি কবিতার রচনাকাল একটি সারণীর আকারে দেখানো গেল পরের দু-পৃষ্ঠায়।

রচনা : শ্রাবণ ১৩৩৮ — ১৩৩৯ ফাল্গুন।

	গদ্যছন্দে	ছন্দে	রচনা
১	শিশুতীর্থ		শ্রাবণ ১৩৩৮
২	শাপমোচন		পৌষ ১৩৩৮
৩		খেলনার মুক্তি	১৩ আষাঢ় ১৩৩৯
৪		পত্রলেখা	১৪ আষাঢ় ১৩৩৯
৫		খ্যাতি	২৪ আষাঢ় ১৩৩৯
৬		বাঁশি	২৫ আষাঢ় ১৩৩৯
৭		উন্নতি	২৬ আষাঢ় ১৩৩৯
৮		ভীরু	৫ শ্রাবণ ১৩৩৯
৯	মানবপুত্র		শ্রাবণ ১৩৩৯
১০	পুকুর-ধারে		২৫ শ্রাবণ ১৩৩৯
১১	ক্যামেলিয়া		২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯
১২	ছেলেটা		২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯
১৩	ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি		২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯
১৪	প্রথম পূজা		২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯
১৫	সাধারণ মেয়ে		২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯
১৬	খোয়াই		৩০ শ্রাবণ ১৩৩৯
১৭	শেষ চিঠি		৩১ শ্রাবণ ১৩৩৯
১৮	কোপাই		১ ভাদ্র ১৩৩৯
১৯	নূতন কাল		১ ভাদ্র ১৩৩৯
২০	সহযাত্রী		১ ভাদ্র ১৩৩৯
২১	বালক * [শ্রাবণ ১৩৩৯]		২ ভাদ্র ১৩৩৯
২২	বাসা * [১ ভাদ্র ১৩৩৭]		৩ ভাদ্র ১৩৩৯
২৩	দেখা		৪ ভাদ্র ১৩৩৯
২৪	শেষ দান		৫ ভাদ্র ১৩৩৯

	গদ্যছন্দে	ছন্দে	রচনা
২৫	বিচ্ছেদ * [৮ শ্রাবণ ১৩৩৬]		৭ ভাদ্র ১৩৩৯
২৬	স্মৃতি		৭ ভাদ্র ১৩৩৯
২৭	অপরাধী		৭ ভাদ্র ১৩৩৯
২৮	সুন্দর * [৩২ আষাঢ় ১৩৩৬]		৭ ভাদ্র ১৩৩৯
২৯	নাটক * [২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬]		৯ ভাদ্র ১৩৩৯
৩০	পত্র * [১৫ শ্রাবণ ১৩৩৬]		১০ ভাদ্র ১৩৩৯
৩১	ফাঁক * [২৭ চৈত্র ১৩৩৭]		১১ ভাদ্র ১৩৩৯
৩২	বিশ্বশোক		১১ ভাদ্র ১৩৩৯
৩৩		কোমলগান্ধার	১৩ ভাদ্র ১৩৩৯
৩৪		ঘর-ছাড়া	১৭ ভাদ্র ১৩৩৯
৩৫	ছুটির আয়োজন		১৭ ভাদ্র ১৩৩৯
৩৬	একজন লোক		১৭ ভাদ্র ১৩৩৯
৩৭		শালিখ	২১ ভাদ্র ১৩৩৯
৩৮	অস্থানে		২৩ ভাদ্র ১৩৩৯
৩৯	কীটের সংসার		২৪ ভাদ্র ১৩৩৯
৪০		মৃত্যু	২৬ ভাদ্র ১৩৩৯
৪১		ছুটি	৩১ ভাদ্র ১৩৩৯
৪২		গানের বাসা	৩১ ভাদ্র ১৩৩৯
৪৩		পয়লা আশ্বিন	১ আশ্বিন ১৩৩৯
৪৪	স্থির জেনেছিলেম পেয়েছি তোমাকে		১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯
৪৫	শুচি		অগ্রহায়ণ ১৩৩৯
৪৬	রঙরেজিনি		২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯
৪৭	প্রেমের সোনা		মাঘ ১৩৩৯
৪৮	মুক্তি		১৪ মাঘ ১৩৩৯
৪৯	স্নানসমাপন		১৫ ফাল্গুন ১৩৩৯

এ স্থলে তালিকাবদ্ধ কবিতাগুলির রচনাকাল দেখা যায় ১ বৎসর ৮ মাসের মতো ; প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতা -দুটি রচনার মধ্যে অন্যূন ৪ মাসের ব্যবধান ; তারও পরে-পুনরায় প্রক্রিয়া বা প্রকরণ -গত পরীক্ষায় হাত দিতে আরো প্রায় ৬ মাস গেল। 'মিল'-ছুট 'সাধু' ছন্দে লিখলেন কবি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬টি কবিতা : সংখ্যা ৩-৮। পরের ২৪টি কবিতার প্রত্যেকটি যথার্থ গদ্যছন্দে। এর মধ্যে অন্তত তারকিত ৭টি কবিতার ক্ষেত্রে জানা যায় পুরোনো কোন্ কোন্ পত্র-প্রবন্ধের আধারে নূতন রচনার উদ্ভব। ২১-সংখ্যক রচনার মূলে যে নিবন্ধ তাব সুনির্দিষ্ট রচনাকাল নির্দেশ করা যায় নি ; 'শ্রাবণ ১৩৩৯' নানা কারণেই অনুমান করা যায় আর কবিতা-রচনার কাল অব্যবহিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য সব-কটি ক্ষেত্রে মূল রচনা ও কবিতা-রচনার মধ্যে ব্যবধান ২।৩ বৎসরের কম নয়। তালিকায় মূল গদ্যরচনার সময়-নির্দেশ বন্ধনী-মধ্যে, সেগুলি (সেই মূল রচনাবলি) 'পুনশ্চ' কাব্যের প্রচলিত সংস্করণে বা সর্বাধুনিক মুদ্রণে গ্রন্থপরিচয়ের অঙ্গীভূত। এই 'বালক' কবিতার প্রাথমিক রূপ ও রূপান্তর নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রচারিত রবীন্দ্রবীক্ষার তৃতীয় সংকলনে, পৃ ২০-৩২।

সংখ্যা ৪৪ শেষ সপ্তকের প্রথম কবিতা। প্রথম-প্রকাশিত পুনশ্চ (আশ্বিন ১৩৩৯) কাব্যের সব দিক দিয়েই যেটি শেষ কবিতা ('প্রথমা আশ্বিন'), তার পরবর্তী কবিতাগুচ্ছের এটি অগ্রণী। বলা বাহুল্য হবে না, যেমন বর্তমান তালিকার সংখ্যা ৩-৮, তেমনি সংখ্যা ৪৫-৪৯ কোনো কবিতাই পুনশ্চের প্রথম সংস্করণে ছিল না ; থাকবার কথাও নয়। সংখ্যা ৩-৮ ছিল পরিশেষ (ভাদ্র ১৩৩৯) কাব্যের অঙ্গীভূত হয়ে আর সংখ্যা ৪৪-৪৯ লেখাই হয় নি।

গদ্যছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে রচনা-দুটি [illegible] সম্পর্কে ভিন্ন পরিধান

যোগ্য তথ্য এখানে সংকলন করা যায় প্রচলিত পুনশ্চ কাব্যের গ্রন্থপরিচয় থেকে।—

শিশুতীর্থ বিচিত্রা মাসিক পত্রে প্রচারিত হয় ১৩৩৮ ভাদ্রে। তার শিরোনাম-স্থলে ছিল :

সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ। —অথর্ব বেদ
(ইনি সনাতন ইনিই অদ্য পুনর্ণব।)

সকলেই জানেন এটি রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক ইংরেজি রচনা *The Child*-এর রূপান্তর। *The Child* লেখা হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জর্মনির মিউনিক শহরে খৃষ্টজীবনের অপরূপ নাট্যরূপ -দর্শনের প্রেরণায়। জর্মনির 'বিখ্যাত উফা কম্পানী ফিল্‌মের উপযুক্ত একটা কিছু' লিখে দিতে অনুরোধ করাতেই কবি এসময় এ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ২৬ জুলাই ১৯৩০ তারিখের এক চিঠিতে শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধ'রে ইংরেজিতে একটি নূতন রকম টেক্নীকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখচেন।'

The Child ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শীতোৎসব উপলক্ষ্যে (২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন তারিখে) শিশুতীর্থের বিষয়বস্তু নিয়েই রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও প্রযোজনা অনুযায়ী কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে সর্ব-সাধারণের সমক্ষে একটি নৃত্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়, এ কথা উল্লেখযোগ্য। এই 'শীতোৎসব' আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে (অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ / পৃ ৪০৯-১০) ; তা থেকে কবিকৃত ঐ পরিকল্পনার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

শাপমোচন লেখাটিতে রাজা (১৩১৭ পৌষ) নাটকের কথাবস্তুকেই নৃত্যনাট্যের উপযোগী রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে ১৩৩৮ পৌষের ১৫ ও ১৬ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র ছাত্রী দিয়ে এর প্রথম অভিনয়।

নৃত্যনাট্যের রূপ নানা সময়ে নানা উপলক্ষ্যে কবি-কর্তৃক বারংবার রূপান্তরিত, তার কিছু তথ্য পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলী-২২'এর গ্রন্থপরিচয়ে। মূল কবিতা তথা কথাবস্তুটুকুই বিচিত্রায় প্রচারিত (মাঘ ১৩৩৮) এবং পুনশ্চ কাব্যে সংকলিত। দুটিতে কিছু পাঠভেদও আছে। গ্রন্থে বর্জিত এই পাঠটুকু আছে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় সব-শেষে—

কখন্ দুজনেরই অগোচরে বিরহবেদনার তাপে
ইন্দ্রের শাপ স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে।

সংকলিত তালিকায় বিশেষ লক্ষের বিষয় (লক্ষ্য না ক'রে কেউ পারবেন না)— এক শ্রাবণে বিশেষ প্রয়োজনে, যুগপৎ বাইরের ও ভিতরের তাগিদে, 'শিশুতীর্থ' সমাধা ক'রে (মধ্যে অনুরূপ প্রয়োজনে 'শাপমোচন'ও লিখে দিয়ে) আরেক শ্রাবণে ফিরে যখন মন দিলেন রবীন্দ্রনাথ গভছন্দে (মানস সৃষ্টির ক্রিয়ায় ও প্রক্রিয়ায় একটা ছন্দ কি নেই এ ব্যাপারে ?), কী বিচিত্র আর কতটা দ্রুত কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ! প্রায় অবিচ্ছেদে লিখে গেছেন ২৫শে শ্রাবণ থেকে ১লা আশ্বিন অবধি। একই দিনে লিখেছেন 'ছেলেটা' 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' আর 'প্রথম পূজা' (কোন্‌টির পর কোন্‌টি সে তথ্যের উদ্‌ঘাটন হয় নি অদ্যাবধি) —এ কি অনায়াসে ধারণা করা যায় ? অথচ কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে হয়তো এরূপই ঘটেছে বারম্বার। তাঁর কবিতার ছন্দের চেয়ে আশ্চর্য তাঁর মনের গতিচ্ছন্দ, বোধ করি এ কথা আমাদের মানতেই হয়।

গভছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) এমন কথা প্রচলিত আছে। নিদর্শন দেখা যাবে 'সাহিত্যসাধক-চরিত-মালা'য়। সে ছন্দে আর রাবীন্দ্রিক ছন্দে আশমান-জমিন ফারাক মনে হয় না কি ? এ কথাই হয়তো বলা যায়— কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রয়োজন-বোধে (সে প্রয়োজন হয়তো বাহ্যিক বা স্থূল) গভছন্দ

হাৎড়েছিলেন সত্য, ঠিক যেন খুঁজে পান নি।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম-নিবাসী নিশিকান্ত রায়চৌধুরী কবির আগেই গদ্যছন্দ ব্যবহার করেন 'টুক্‌রি' পর্যায়ের কবিতায়, এমন গুজবও শুনে থাকব। কথাটা তথ্যনির্ভর ও বিচারসহ কিনা পরে দেখা যাচ্ছে। 'টুক্‌রি' সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য, রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিমন্তব্য এবং পরে তার সংশোধন, এ-সব আজ কৌতূহলী জনের অগোচর নয়, কেননা ইতিমধ্যে বহুপ্রচারিত সাময়িক পত্রে মুদ্রিত। কিন্তু 'নিশ্চিত তথ্য' সংজ্ঞার উপযোগী সব মাল-মশলা শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনেও পাওয়া যাবে কি?[৮] অভিমানী নিশিকান্ত তাঁর যা ধারণা ও বিশ্বাস কখনো বুঝি খুলে বলেন নি আর তাঁর সব কথা সঠিক ভাবে আমরাও জানি নে।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রগদ্যছন্দের উৎপত্তিবিচারে 'পুষ্পাঞ্জলি' অবধি না গেলে নয়। আর, রবীন্দ্রনাথের যথার্থ 'অগ্রজ' এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'পাহাড়িয়া' ছন্দে, বিচিত্রা মাসিক পত্রে ১৩৩৪ শ্রাবণ-কার্তিকে যে-জাতীয় কবিতার প্রথম প্রচার। (বলা বাহুল্য, সজ্ঞান সাহসিক ও সচ্ছন্দ গদ্যছন্দই যদি হয় বিচার্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথের পুষ্পাঞ্জলি ও লিপিকা আমাদের হিসাবের বাইরে রাখা ভালো।) অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষাভঙ্গিতে, যেমন আলাপে তেমনি লেখায়, এর প্রবণতা সব সময়েই ছিল। ১৩৩৪ পৌষের এক অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই মনে আছে। 'শিশুতীর্থ' রচনার প্রায় ৪ বছর আগে। অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথা শুনেই যে 'কথিকা' আমি লিখে ফেলি, তাঁকে দেখালে তিনি তা বদলাতে বসলেন যথারীতি। আমার ভাষা ভঙ্গী প্রায় কিছুই রইল না। সে সময়, হয়তো তার আগেও, আমায় বলেন তিনি বাক্যের ভিতর কর্তা কর্ম ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ পদগুলির প্রত্যাশিত পারম্পর্যের ওলোট-পালোট ঘটাতে। নিজে করলেন তাই, কেননা এ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গী বা তারই আরেকটু 'অতি'মাত্রা। (দ্রষ্টব্য :

কালি ও কলম, ফাল্গুন ১৩৭৮, পৃ ১০৭১-৭৬, 'ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ'।) তাই বলি, এক হিসাবে এ ব্যাপারে কবির অগ্রগামী হলেন অবনীন্দ্রনাথ। (ক্ষীরের পুতুল / ভূতপত্রীর দেশ, এ-সবও দ্রষ্টব্য।) পুনশ্চের ভূমিকায় সংগত কারণেই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন অবনীন্দ্রনাথের, মন্তব্য করেছেন 'অতি'টুকু নিয়ে।

৭ পরিবর্তিত ও ঈষৎ পরিবর্ধিত বেতার-ভাষণ। সময় বাঁধা ছিল বেতারে; ভালো হয়েছিল বেশি বলার সুযোগ না থাকায়। ভাষণ অতিভাষণে পৌঁছয় নি আর পাদটীকার নামগন্ধ না থাকলেও, সার-কথা সব কি বলা হয় নি? এখানে বলা আবশ্যক—*Gitanjali* এবং *The Child* পরস্পর তুলনীয় ছন্দঃস্পন্দের দিক দিয়ে (ছত্র সাজানোর স্থূলদৃষ্টিগোচর চেহারা নিয়ে নয়)—ও দুটি লেখার স্থান কাল উপলক্ষ্য বা বিশেষ প্রয়োজন সে-সবও মননীয়। ওর পটভূমিতে দেখতে হবে *Bible, Whitman, Carpenter* এবং বেদে জাবাল-সত্যকামের আখ্যান-কথন। (শেষোক্ত রচনা বিশ্বভারতী-প্রকাশিত ১৩৭২ বৈশাখের 'রূপান্তর' গ্রন্থে পাওয়া যাবে, পৃ ২০/২১।) কবির হাতে ভাষান্তরই হয়ে উঠেছে রূপান্তর / জন্মান্তর যেমন *Gitanjali*-তে তেমনি শিশুতীর্থে, না হয়ে উপায় ছিল না—এ কথা স্পষ্ট হওয়া চাই। ছন্দোলোকে নুতন সিংহদ্বার তাই খুলে গিয়েছে। বড়ো কবিপ্রতিভার ক্ষেত্রে প্রায় সব সময়েই স্থূল প্রয়োজন ও বাহ্যিক ঘটনার অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে গহনে গভীরে নিগূঢ় অন্য হেতু, অন্য প্রয়োজন, কবির নিজস্ব প্রকৃতি ও বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা— যথাকালে সে-সবই সামনে এসে কবিকৃতির পথিকৃৎ, পথপ্রদর্শক ও নিয়ামক হয়। যেখানে এরূপ প্রতিভা থাকে না, সমস্ত ঘটনাই একরূপ বাইরে বাইরে ঘটে যায়, গভীর থেকে সাড়া জাগে না, নেতৃত্ব আসে না— যথার্থ সার্থকতায় পৌঁছনো তাই দুরাশাই থেকে যায়।

৮ [পুরোগামী '৯৬' পৃষ্ঠায় প্রথম অনুচ্ছেদের যে বক্তব্য, তারই অনুবৃত্তি।] শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে- সংরক্ষিত 'টুক্‌রি'-পাণ্ডুলিপি ভালো ক'রে দেখা গেল। অধিকাংশ কবিতার দুটি রূপ— বাঁয়ে জোড় পৃষ্ঠায় আর ডাইনে বিজোড় পৃষ্ঠায় সাম্‌না-সাম্‌নি নকল করেন (শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে) শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৪৩টি কবিতা। তন্মধ্যে ৭টিতে বিশেষ বা কোনোই বদল করা হয় নি দেখা যায় আর ৩৯টির অনন্য রূপই ডাইনে আছে— অতএব এগুলিতেও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি এরূপ কল্পনা করা চলে। বাকি কবিতাগুচ্ছে পরিবর্তন-প্রক্রিয়া একরূপ নয়— বহু এবং বিচিত্র। কোথাও ৬টি বাক্যের যা-কিছু বক্তব্য তার নির্যাস একটিমাত্র বাক্যে বিন্যস্ত। কোথাও পর পর প্রত্যেক ছত্রের প্রায় আধখানা যেন কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে, এরূপ ৭।৮ ছত্র। কোথাও কোনো-একটা কাহিনীর মোড় ফেরানো হল, কোথাও সংক্ষেপ করা সত্ত্বেও বেশ স্পষ্ট অথবা ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠল আর কদাচিৎ পরিবর্তনের ফলে অস্পষ্ট হয় নি যে তাও নিঃসংশয়ে বলতে পারি নে। ছত্রে ছত্রে অন্ত্য-মিল-ছুট এই কবিতাগুলি রূপে গুণে বেশ আসর জমিয়েছে অথবা উল্লেখ-যোগ্য উৎকর্ষে পৌঁচেছে ক্রমে ক্রমে, অর্থাৎ শেষের দিকে। কলাবৃত্ত মুক্তক অধিকাংশের ছন্দোরূপ, দলবৃত্তও আছে ; দু-একটি গদ্যছন্দের গা ঘেঁষে গেলেও, রীতিমত ছন্দেই। 'টুক্‌রি' ছাপা হয় বিচিত্রায় ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুনের পর পর চার সংখ্যায়। তদতিরিক্ত একটি ('ফেরিওয়ালী') নিশিকান্তর বিশেষ এক ছবির বর্ণনা ; স্বতন্ত্র ছাপা হয় বিচিত্রাতেই (বৈশাখ ১৩৩৯ মুখপাতে) পূর্বোক্ত ছবির সঙ্গে যুক্ত ক'রে। 'ডালিমবালা' ব'লে একটি রচনা (সংরক্ষিত খাতায় সংখ্যা ১৩৭) রবীন্দ্রনাথের রুচিতে বেধেছে ব'লেই হয়তো পাঠানো হয় নি বিচিত্রায়— ছাপা হয় নি। মোটের উপর এই হল আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য।

আমি যখন বোলপুর-শান্তিনিকেতনে সবে এসেছি, মণিমোহন রায়চৌধুরী (বহরমপুর), সুতান হরাহাপ (সুমাত্রা), নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (বরিশাল) সকলেই রয়েছে শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনে— তখনকার এই লেখা। তখনকার লেখাই (অল্পকাল পরের ?) যেটি 'পণ্ডিচেরীর ঈশান কোণের মাঠ'* কবিতার অগ্রজ বা পূর্ব-অবতারই। 'টুকরি' গুরুদেবকে নির্বন্ধাতিশয়ে পড়ানো (প্রথমে তিনি এই অনাহূত অদ্ভুত 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা'টিকে মোটেই

'বাংলা কাব্যপরিচয়' (বিরলপ্রচার ১৩৪৫)-সংকলন-সম্পাদন-কালে এ কবিতাকে বহুমান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে (পৃ ২৯৭-৩০১)। ছন্দের গা ঘেঁষে গেলেও এটি যে গদ্যই সে কি লক্ষ্য করেন নি, যদিও বলেছেন ভূমিকায় (ষষ্ঠ পৃষ্ঠা শেষ অনুচ্ছেদ) 'এই সংকলন-গ্রন্থে আধুনিক বাংলার গদ্যকাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয় নি' ? অথবা লক্ষ্য করলেও উপেক্ষা করেছেন এর উৎকর্ষের উপলব্ধিতে ? সে যাই হোক, যেমন এ কবিতার বাগ্‌বিভূতি তেমনি শব্দঝঙ্কার (ছত্রের সঙ্গে ছত্রের অন্ত্যমিল অবিরল) আর তেমনি তো চিত্রময়তা। রীতিমত ছন্দোবদ্ধ না হয়েও ছন্দের বিভ্রম সৃষ্টি করে যতটা পত্রপুটের 'পৃথিবী' (তিন / অন্ত্য মিল অবশ্য নেই) তাই যেন অতিশয়িত বা বহুগুণিত এখানে। সেই "অতি"টুকুই রসিক-ভেদে কেউ যেমন ঈষৎ-একটু দোষ মনে করতে পারেন, কেউ বা গুণ ব'লেই গণ্য করবেন। কবিতা শুরু হয়েছে এইভাবে : কোন্ / সংগোপন / থেকে এল, এই উজ্জ্বল / শ্যামল / বিন্দুর শিখা। / এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত / শুষ্ক রুধির-সঞ্চিত / প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা / কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ। / অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান / কোন্ অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত—/ এই গরল-কুণ্ডলিত / ভুজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে / প্রস্ফুটিত-মাধুরীর তরঙ্গে / ইত্যাদি

আমল দিতে চান নি কিন্তু নিশিকান্ত তবু নাছোড়বান্দা), তাঁর ভালো করে দেখতে দেখতে ক্রমশ ভালো লাগা আর সেই সঙ্গে বদল করতে থাকা, অমিয় চক্রবর্তীকে দিয়ে আদ্যন্ত নকল করানো, সেগুলি বিচিত্রা মাসিকপত্রে পাঠানো আর ছাপা হওয়া, এ-সবে অন্তত এক মাস সময় লেগে থাকবে এই আমাদের অনুমান। অতএব 'টুক্‌রি'র রচনাকাল ১৩৩৮ আশ্বিন-কার্তিক ? অসম্ভব নয়।

এ কথা ঠিক, নিশিকান্তর স্কন্ধে কবিতার 'ভূত' চাপলে তার লেখায় ছেদ পড়ত না, সে প্রায় রাত-দিনের ভেদ রাখত না, হয়তো পথে প্রান্তরেও রচনা করত মনে মনে— খাতায় টোকা হোক্ নাহয় ঘরে ফিরে এসে। এই লেখাগুলির বিশেষ উপলক্ষ্য হল বন্ধু মণি-মোহনের উক্তি : 'ভাই, কবিতার ভাব তো পাই, লিখতেও চাই কিন্তু ঐ ছন্দ আর মিল-টিল-গুলো কিছুতেই বাগে আনতে পারি নে।'

'আরে, তাই নাকি ? 'মিল' তো কবিতা নয়। ওটা ছন্দের বহিরঙ্গ। বাদই দাও-না।'

'সেকি কথা ! সে আবার কেমন ?'

'এই দ্যাখো।'

এই আলাপচারির স্থলে ও সময়ে আমি উপস্থিত ছিলেম না সত্য, তবু মণি বা নিশিকান্ত কার মুখে শোনা ভুলে গেলেও ঐ ভাবেই আগাগোড়া ব্যাপারটি ধারণা ক'রে নেওয়া অসম্ভব বা অসংগত নয়। দেখা যাচ্ছে, বন্ধুবর মণিমোহন করেছিল নিশিকান্তর 'টুক্‌রি' পর্যায়ের অজস্র কবিতার অনুঘটকালি।

যা হোক, ১৩৩৮ আশ্বিন-কার্তিকে বা শরতে ঐ কবিতাগুলি লেখা আর গুরুদেবের দেখে দেওয়া যদি ঘটে থাকে, তার আগে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র 'শিশুতীর্থ' ছাড়া আমাদের এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য আর-কিছু লেখেন নি। শিশুতীর্থের আগে রবীন্দ্রনাথ, গদ্য-ছন্দ দূরে থাক্, রীতিমত কোনো ছন্দে (দল / কলা / মিশ্রকলা-

বৃত্তে) কোনোরূপ গাঢ়বদ্ধ* বা মুক্তক† কবিতাই সচরাচর লেখেন নি যার ছত্রে ছত্রে অন্ত্য মিল নেই— 'পরিশেষ' 'পুনশ্চ' ঢুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। এ সময়ে প্রায় প্রত্যেক কবিতার রচনাকাল জানা থাকায় এ বিচার সহজসাধ্য।

নিশিকান্তর 'টুক্‌রি'র বহু কবিতা গুরুদেব পুনরায় লিখে দেন (rewrite করেন) এ কথা একটুও অত্যুক্তি নয়। ভালো করেন অথবা মন্দ, সে কথা আলাদা। অনেক কবিতায় বিশেষ পরিবর্তন করেন নি এমনও হতে পারে। নিশিকান্তকে এই credit বা সাধুবাদ অবশ্যই দিতে হবে, যে, সে গুরুদেবকে ছন্দ নিয়ে নতুন পরীক্ষার দিকে বিশেষ ক'রে উস্‌কে দিয়েছিল। (আবার সেই অনুঘটকালির কৃত্য যার ফলাফল প্রায়শই আমাদের প্রত্যাশা-বহির্‌ভূত।) তার প্রভাবের কোনো কথাই ওঠে না। এক-ভাবে নিশিকান্ত রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। অন্তত তখন পর্যন্ত আর-কোনো বিরাট পুরুষের প্রভাবের বৃত্তে সে ধরা দেয় নি। পরে নিশিকান্ত চলে যান পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য-সাধনা বাঁক নেয় নূতন দিকে— সাহিত্যসৃজনে পুরাতনের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিশেষভাবেই নূতন। ‡

২১ মে ১৯৭৪

---

* চিত্রাঙ্গদা বিসর্জন প্রভৃতি নাটক বা নাট্যকাব্য বাদে আর অতি-পুরাতন কবিকাহিনীর মতো আখ্যানকাব্যগুলিও না ধ'রে।

† মিশ্র কলাবৃত্তে মানসী-ধৃত 'নিষ্ফল কামনা' (অগ্রহায়ণ ১২৯৪) বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

‡ পুরোগামী পৃ ৯৬ ছ ৫-৬ -ধৃত 'বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য, রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিমন্তব্য এবং পরে তার সংশোধন'— কথাটা আরো স্পষ্ট করাই ভালো। কেননা বক্ষ্যমাণ বিষয়ে গবেষণার দায় লেখকের যতটা, পাঠক-মাত্রের তেমন নয়। আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রায় সব দিক ধারণা

করা যাবে ১৩৮১ সনের সাহিত্য-সংখ্যা 'দেশ' দেখলে। তত্র দ্রষ্টব্য বুদ্ধদেব বসুর ২৪।৩।৪০ তারিখের পত্র ('২৫') আর রবীন্দ্রনাথের পর-পর দুখানি চিঠি (তা° ২২।৩।৪০ ও ২৮।৩।৪০ / স° ২৪ ও ২৫) যার বক্তব্য হ'ল মোটের উপর : 'বিচিত্রায় টুকরি ব'লে যে-সব টুকরো বেরিয়েছিল অল্প কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলোই আমার লেখা।' ২২।৩।৪০

'টুক্‌রির লেখার মধ্যে আমার নিজের রচনা অল্প দু চারটে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু তাদের বিশেষ মূল্য নেই। / নিশিকান্তর লেখাগুলো আমি নির্দয়ভাবে সংশোধন করেছিলুম— একেবারেই ভালো করি নি। সেগুলি তার মূলের বিশুদ্ধ মূল্যেই রক্ষণীয়। তোমাকে ভুল বলেছিলাম বলেই এ চিঠিখানা আবার লিখতে হোলো।' ২৮।৩।৪০

'টুক্‌রি'র সংরক্ষিত খাতা আর বিচিত্রা পত্রিকা দেখে আমাদের যা মনে হয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গের সার-কথা এই যে, 'টুক্‌রি' 'মিল'-হীন ছন্দে লেখা, গদ্যছন্দে নয় আর রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' (গদ্যছন্দের প্রথম কবিতা) লেখা হয় 'টুক্‌রি'র পূর্বে।

গান থেকে কবিতা

শুধায়ো না কবে কোন্ গান
কে আমায় করেছিল দান
কার প্রাণস্পন্দে কম্পমান
রবিরাগ রবির রাগিণী।
তুমি কি শুনেছ গানখানি
অন্তরে লয়েছ তারে চিনি?
যে সুরের স্বর্গে বিলসিছে অপরূপ ইন্দ্রধনু জিনি
সেথা তুমি জেনো গো ইন্দ্রাণী—
তোমার এ গান, প্রাণ, তোমারি এ বাণী॥

না। এ কবিতা সুরের গুরু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন তা হলপ করে বলতে পারি নে, বলতে চাই নে। তবু, অনায়াসে তিনি লিখতে পারতেন, তাঁর কবিমানসে এই কথাটাই ছিল, তা অনুমান করতে পারি। তাঁর অনুচ্চারিত অলিখিত কথাটা আমাদের অনাহূত ঘোষণা করার এখন একটি কারণ এই যে, যে কথা সত্য তা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা ভালো আর রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে সারগর্ভ বিশেষ কথা, প্রকার ও প্রকরণের বিচার বিশ্লেষণ, আমাদের যখন নাগালের বাইরেই, এ ব্যাপারে পারিপার্শ্বিক কথা, হেতু বা উপলক্ষ্যের কথা, এ নিয়েই যৎকিঞ্চিৎ আমরা আলাপ আলোচনা করতে পারি। অবশ্য, সেও জল্পনা-কল্পনাই, সে ক্ষেত্রেও বিশেষ অধিকার ক'জনেরই বা আছে? তবু, শ্রদ্ধা, প্রীতি, দীর্ঘকালের অভিনিবেশ ও অনুশীলন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরই পরিবেশে বহুদিন ধ'রে বসবাস, তার আকাশ-বাতাসে প্রত্যেক শ্বাসটি গ্রহণ, দৈবানুগ্রহে এ যদি ঘ'টে গিয়ে থাকে, কতকটা অনধিকার চর্চা হলেও রসিকজন আমায় ক্ষমা করবেন না কি?

দু-চার কথা শুরুতেই সেরে নেওয়া ভালো। উল্লিখিত প্রবেশক কবিতায় সুরস্বর্গে ইন্দ্রাণীর কথা আছে, অন্যান্য দেবতা ইন্দ্র চন্দ্র বিষ্ণু

শিব এঁরা কি নেই? তাও আছেন হয়তো যথোচিত আসনে ও অধিকারে। আমাদের সামনে অধিষ্ঠিতা ইন্দ্রাণী এখন সকলেরই প্রতিনিধিত্ব করুন। পৃথক উল্লেখ নাই হল? উল্লিখিত কবিতায় অতঃপর আর দুটি শব্দে হুঁচোট খেতে পারেন, রসিক ও অনুভবী জন না হলেও, সঙ্গীতশাস্ত্রী অথবা কলাবিদ্ ওস্তাদ। রবিরাগ! রবিরাগিণী! সে আবার অপূর্ব কোন্ বস্তু? অ-পূর্বই বটে। সেটি সেই জিনিষই যা আমরা চিনেও চিনি নে কিম্বা জেনেও জানি নে। যে সুরের সুরধুনীধারায় নিত্য স্নানে পান্নে আমরা ধন্য হয়ে থাকি বা হতে পারি, সে যদি অভিনব বস্তুই হয়, আমাদের উচ্চকিত চেতনাকে স্পর্শ ক'রে তাকে জাগিয়ে দিয়ে থাকে, তার জীবৎসত্তা বা স্বতন্ত্র নাম রূপ ও প্রতিষ্ঠা সেও না থেকে পারে কি? অভ্যস্ত পুরাতন নাম-রূপেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় কী ক'রে? স্বরূপ ঢাকা পড়ে না কি? স্বীকার না করে পারি নে তার স্বাতন্ত্র্য, এই সত্যেরই আভাস আমরা পাই সঙ্গীতরসজ্ঞ ধূর্জটীপ্রসাদের প্রত্যয়সূচক প্রশ্নে : 'ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে' গানটিকে কেনই বা ঠাকুরি টোড়ি বলা হবে না? নামে কিছু যায় আসে না এ কথা ভিন্ন দেশের মহাকবি বলেছেন সত্য, তবু গোলাপকে আমরা 'ঘেঁটু' ব'লে সুখ পাই নে আর বস্তুজ্ঞানও তাতে বেশ একটু ঘোলাটে হয়েই যায়। অতএব, যেমন 'রামপ্রসাদি সুর' তেমনি রবিরাগ কথাটিও, আজ কাল বা পরশু না হোক, একদিন আমাদের মেনে নিতে বুঝে নিতে হবেই। তাতে কোনো অসুবিধাই হবে না, সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের জীবনে জীবনে থাকেন সঞ্জীবিত তাঁর কথা ও সুরের ষড়ৈশ্বর্যে, অনন্ত মহিমায়, সত্যে ও সৌন্দর্যে।[১]

অতঃপর রবিরাগের অনুরাগিণী একজনের সহজ প্রত্যয়ের একটি কথা উল্লেখ করে আমরা প্রস্তুত বিষয়ে প্রবৃত্ত হব। ইনি যা বলেন সেও প্রশ্নের আকারেই—

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত!

তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,
জীবন বয়ে যেত অশান্ত।

এ গানের তাৎপর্য কী? হেতু বা পরিণাম কোথায়? এ প্রশ্নই আমাদের চমকিয়ে দেয়। রচনা ১৩১৭ সনের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তা গীতাঞ্জলি খুললেই জানা যাবে। অখণ্ড গীতবিতানে পূজা পর্যায়ে 'বন্ধু' গোষ্ঠীতে এর অভিজ্ঞান-সংখ্যা হওয়া উচিত ৬৪, বিহার সুরলোকের কোন্ দূরে দূরান্তরে তা আমার মতো অসুর বলতে পারবে না আর অন্যের পক্ষেও চমৎকারজনক— এর প্রতি পদে প্রতিটি বচনে আভাস ইশারা ঝলকিত অনির্বচনীয়ের। এত কথাতেও এ গানের গাঁইগোত্রের ঠিকানা অথবা স্বরূপ-পরিচয় কি সম্পূর্ণ হল? না। বোধ করি আর কোনো প্রকারেই হতে পারে না, কেবল স্রষ্টা কবির নন্দিত চিত্তের সঙ্গে আমাদের আনন্দিত চেতনা মেলাতে পারলেই এর সৌন্দর্যটি দেখতে পাব চোখ বুজে— অর্থাৎ ধ্যানতন্ময়তায় এর সত্যটিকে বোধে বোধ করতে পারব।

কিন্তু তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনার বহিরঙ্গনে যে মহতী জনতা সেকালে একালে বা কালান্তরে সমবেত, তাঁরা কি সন্তুষ্ট হবেন? গুঞ্জন কি শোনা যাবে না? তুমুল কলকোলাহলও উঠতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন যাঁর, উত্তরও তাঁর কাছ থেকেই আহরণ করে বলি: এ গানে কবিচিত্তের পূজা যেমন প্রেমও তেমনি অপূর্বভাবে উদ্গীত এবং ব্যঞ্জিত হয়েছে, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, যার রেশ কোনোদিনই রসিক হৃদয়ে থামতে জানে না।

সত্য কথা?

অরসিক অনুসন্ধিৎসু বা ব্যাখ্যাব্যবসায়ী, কাব্য-মেড-ইজির খুচরা কারবারী, এঁদের প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্ন তবু এখানেই থামবে না। কথা উঠবে, এই 'তুমি'টি কে? আমরা বলি এ যে সার্থক সর্বনাম। এ যে একই কালে যেমন কবির তেমনি তোমার আমার তার বুকের ভিতরের ঠাকুর আর বুকে-ধরা প্রেমিক বা প্রেয়সীও হতে পারে তাতে কি সন্দেহ

আছে? ক্ষণকালের মধ্যেই যে প্রত্যক্ষ মানব বা মানবী, চিরকালের আকাশে সেই তো অলক্ষ্য জীবনদেবতা— সে তোমার আমার অন্তর্যামী ব'লেই বিশ্বান্তর্যামী— তাকে চেনার অন্ত নেই কোনো কালে আর কোনোখানেই। নেই ব'লেই তো অপূর্ব এ পরিচয় গান হয়ে সুর হয়ে বেজে উঠেছে।

স্মরণ করা যাক্ আরেকটি রবীন্দ্রগীত বা গীতিকবিতা : তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা! স্বয়ং কবি-কর্তৃক কখনো প্রেম কখনো পূজা পর্যায়ে এর স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী এর বক্তব্য? কে এই ধ্রুবতারা? (ব্র্যাকেটের নেপথ্যে বলা যাক্ অনুচ্চ কণ্ঠে : যে গান শোনে যে শোনায় এরকম কূটপ্রশ্ন তার নয়/হতেও পারে না।) রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাস ভূগোলেই যাঁদের বিশেষ অভিনিবেশ ও রুচি, অধিকারও বটে, উপস্থিত প্রসঙ্গে তাঁদের লাফিয়ে ওঠবারই কথা। স্পষ্ট দেখিয়ে দেবেন এই গানের আদিরূপটি কী ছিল বহুযুগবিস্মৃত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে, ঘটনাক্রমে আজ যার নাম 'মালতীপুঁথি'; কী রূপ হল ১২৮৭ কার্তিকের ভারতী পত্রিকায় ভগ্নহৃদয়ের উৎসর্গপত্রে; ঐ বৎসরেই পুণ্যমাঘোৎসবের উদ্‌যাপনে কতখানি রূপান্তর হল তার; আর, পরিণামে অর্থাৎ ১২৮৮ বৈশাখে ভগ্নহৃদয় নাট্যকাব্যের প্রকাশ উপলক্ষ্যে কতটাই বা বদলে গেল। কে এই ধ্রুবতারা, তাঁর নির্দিষ্ট নাম ঠিকানা —পরিষ্কারভাবে ঘোষণার কোনো অসুবিধাই নেই। অনেকেই হয়তো বলবেন, সেই নাম রূপ পরিচয়ের মধ্যে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু কবি তা থাকতে দিলেন কি? কবির চলিষ্ণু চিত্ত পরিচয়ের কূলে চির-চেনা ঘাট থেকে অকূলে কোন্ অপরিচিত অনির্বচনীয়ের অভিসারী হল। যা ছিল প্রেম তাই হল পূজা, পূজাও প্রেম হল পুনর্বার। অথবা বলা উচিত— প্রেম ও পূজা সব সময়েই ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত; আমরাই শুধু দেখি নি, চিনতে পারি নি। সঙ্গীতস্রষ্টা তাঁর কবিবাক্ দিয়ে, বিশেষতঃ সুরের আলো জ্বালিয়ে, আমাদের তা দেখিয়ে দিলেন। কবিতায় কখনো তিনি মিথ্যা-

চরণ করেন না এও তো অভ্রান্ত ভাবে ভাষায় বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রদ্ধাবান তা অবিশ্বাস করবেন না। কবি তো মিথ্যা বলেন নি: দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা! এমন আশ্চর্য অপরূপ যাঁর মতি-গতি, মর্ত্যকে অমৃতে উড়িয়ে নেওয়া আর অমৃতকেই মূর্ত করা যাঁর সারা জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি, তাঁর কবিতা-গানের জাতিপাঁতির বিচারে সর্বক্ষণ সব দিকে হুঁশিয়ার থাকাই ভালো; বাঁধা-ধরা কোনো ফরমুলায় তাঁকে ধরবার চেষ্টা না করাই সঙ্গত। ক্লাসে পড়াবার অথবা থীসিস লেখবার যত সুবিধাই হোক্, ভাব-অনুভাব আনন্দ-বেদনা স্বপ্ন-কল্পনা ও সত্য নিয়ে স্বরচিত খোপে খোপে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে আটক রাখার চেষ্টা নাইবা করা গেল।

স্বতই মনে আসে আরেকটি দৃষ্টান্ত, সম্মিলিত কথা-সুরের আরেক ইন্দ্রজাল: তোমায় / নতুন ক'রে পাব ব'লেই হারাই ক্ষণে ক্ষণ! এটি ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বাউলের গান, তবে বিশেষ নাটকীয়তা এ গানে নেই। অনুভবনিমগ্ন বা তদাত্ম তন্ময় দরদের কণ্ঠে এ গান গাইতে শুনলেই মনে হয়, গানের প্রত্যেকটি কথায় যেন আদর সোহাগ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে— হৃদয়ের মধু। সে তো অনিবার্যই বটে। কেননা, চিরদিন যাকে নতুন ক'রে চাই, পাই, আবার হারাই বারে বারে তাকে খুঁজব ব'লেই— 'ভয়ে কাঁপে মন / প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন'— তাকে মনে ক'রে যখন যে শব্দটির ব্যবহার সে যে প্রাণে ছুঁইয়ে, হৃদয়-সুধা-সায়রে ডুবিয়ে; না হলে উচ্চারণ করাই জো যায় না। কিন্তু কে ইনি? একাধারে প্রাণের ঠাকুর ও প্রিয়জন। বাউলের গানে ঠাকুরকেই বলেছে 'মনের মানুষ'। রবীন্দ্রনাথ যে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাউল ও বৈষ্ণব সে আমরা জানি। প্রাণের প্রাণ জীবনদেবতায় আর মানুষে তাঁর গতাগতির নেই বিরাম— দেবতা থেকে মানুষে আর মানুষ থেকেই দেবতায়। বুঝি একই সম্বোধনে দুজনকে ডাকা হয়েছে একই সময়ে। কবির আপন ভাষায় এ'কেই বলা চলে: ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা! এর কোনো একটিকেই এক-মুহূর্ত স্থির থাকতে

পারি নে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির উপলব্ধি পূরা হতে পারে না। কবির যা উপলব্ধি, যথার্থ রসিকেরও তাই।

অবান্তর কথা অনেক এল কি উপস্থিত প্রসঙ্গের বহির্ভূত? কিন্তু প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি কিছু বলবার না থাকলে, প্রসঙ্গের পরিপার্শ্বে একটু নজর দেওয়ায় দোষ দেখি নে। এইমাত্র কথা উঠেছিল— 'গানের নাটকীয়তা'। সার্থক পদবন্ধ সেকি? আমরা তাই মনে করি। কেননা, রবীন্দ্রনাথের গান / গানের দেহ বা অবয়ব উৎকৃষ্ট গীতিকবিতাই বটে। তাতে যেমন আছে কবিত্বের সার এবং গানের অর্থাৎ সুরের মনোবাক্-অতীতে অভিসার, তেমনি অনেক সময়েই আছে বা থাকতে পারে কোনো কথা-কাহিনীর ক্রমিক উদ্‌ঘাটন, এমন-কি কোনো নাটকের আভাস-মাত্রে সূচিত বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত। এই আশ্চর্য গুণগুলি বাংলার প্রাণের প্রাণ থেকে উৎসারিত, বাঙালির ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের অন্তর্লোকে লালিত-পালিত ও পুষ্ট, বৈষ্ণব পদাবলীতে তথা লীলা-কীর্তনেও ছিল বা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নবযুগে নূতনভাবে রবীন্দ্র-নাথকেই সে-সবের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বলা যায়। সীমাবদ্ধ আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, নিশ্চিত বলতে পারি নে আর-কোন্ দেশে কোন্ কালে এর সার্থক তুলনা মিলবে। যা হোক, সেই স্বাভাবিক উত্তরাধিকার-সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই নাটকের যা প্রাণবস্তু তাও রয়েছে প্রভূত পরিমাণে এইটে আমরা সহজেই অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, সুরস্রষ্টা ছিলেন, আখ্যানকথক যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন নাট্যকার এমন-কি নটেশ, এর সকল অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ যদি লুপ্ত হয়েই যায় ইতিহাসের পাতা থেকে, কয়েকটি গান শুধু আপন স্বরূপে ও স্বধর্মে বর্তমান থাকলেই ঐ-সব গানের স্রষ্টা সম্পর্কে সব-কথা, সার-কথাই, নিঃশেষে জানা যাবে মনে হয়। যেমন —

তোমায় কিছু দেবো বলে চায় যে আমার মন /
কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে /

যখন   এসেছিলে অন্ধকারে /
তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার /
দূর-দেশী সেই রাখাল-ছেলে /
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি /

এক-একটি নিটোল আখ্যায়িকার নিখুঁত রূপরেখা পাই নে কি প্রত্যেকটি গানে? নাটকীয়তা আছে কি কেবল নানা জাতের নাটকের গানে? যেমন —

আমি   পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি। /
সহসা   ডাল-পালা তোর উতলা যে /
না,   না গো, না /
যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই /
পথের   শেষ কোথায় শেষ কোথায় /
ওগো   ডেকো না মোরে ডেকো না /
আমার   জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া /

নাটকীয়তা এসেছে কথাসুরের সমন্বয়ে সৃজিত এমন অনেক গানে যার কোনো অনুষঙ্গ, ঘটনা বা উপলক্ষ্য, আমাদের জানা নেই। যেমন —

অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক /
সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে /
মরণ রে,   তুঁহুঁ মম শ্যাম-সমান /

কোন্‌টি প্রেম কোন্‌টি পূজা সে প্রসঙ্গে কাজ নেই; স্বয়ং কবির কাছেই সে পরিচয় বুঝি কখনো সুস্থির ছিল না। নূতন কোনো দরদী কণ্ঠের গাওয়াতে এদের যখন নূতন ক'রে আবিষ্কার করি, মনে হয় এই-সব গানেও অপূর্ব একটি নাটকীয়তা আছে। ঘুম-ভাঙা রাত-জাগা প্রেমের পুনঃ-পুনঃ-আবর্তিত আনন্দে বেদনায় আর্তিতে তা না থাকবেই বা কেন? কিন্তু অন্তরের অন্তরঙ্গ নাটকের, কেবল সুরে তালে লয়ে, এ বড়ো স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক উদ্‌ঘাটন।

ভয় হয়, এমন দৃষ্টান্তচয়নের চমকে খুশী করা যাবে না তাঁদের, বিশেষভাবে যাঁরা কলাকৈবল্যের পক্ষপাতী — রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁদের বিশেষ অনুযোগের কারণও তাই। গানে ও কবিতায় কেন মেলানো মেশানো! এ দেশে আর এ কালে সে মিলন সেই বিমিশ্রণ কোনোক্রমে ঠেকানো না গেলেও যাঁদের মনে সংশয় থেকেই যাবে: বর বড়ো না কোনে বড়ো? কথা না সুর? কে কার আশ্রিত? সেই সঙ্গে আবার আখ্যান বা নাট্যরস যদি জোটে, বর্ণসাঙ্কর্যের চূড়ান্ত হবে না কি? ত্র্যহস্পর্শ তো নয়, তারও বেশি। কিন্তু যুগের এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার এই এক প্রবণতা। যেমন রবীন্দ্রনাথ মানুষটি স্বয়ং, তেমনি তাঁর সৃষ্টিও বহুমুখী। তাঁর নিজের কথাতেই বলি, সে যেন কমল-হীরে। একটি তো দিক নয়, সব দিকে সব সূচীমুখেই আলো ঠিকরে পড়ছে। সে যেন স্বপ্রকাশ। বিশুদ্ধ গান, বিশুদ্ধ কবিতা, বিশুদ্ধ নাটক, বিশুদ্ধ নৃত্ত, সে এক জিনিষ আর উৎকৃষ্ট জিনিষও বটে নাহয় তা মেনে নিলেম কিন্তু দুই বা ততোধিককে মিলিয়ে এক-দেহ এক-প্রাণ একাত্ম ক'রে যার উদ্ভব সেও তো উপেক্ষার নয়, বরং তার বিপরীত। এজন্যই অনেকের উপলব্ধিতে নাটকই শিল্পসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা, যাতে নৃত্য গীত বাদ্য কাব্য অভিনয় চিত্র সবেরই সার্থক সমাবেশ ও সমন্বয়। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি শ্যামা চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা নিয়েও আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। যদিও এদের প্রত্যেকটি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে শুধু নানা গুণীর একতান প্রযত্নে ও প্রকর্ষে। সে যে কেমন, কতটা বিস্ময়কর, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা দেখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। আর, তিনি সময় পান নি ব'লেই 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা' যে কী হতে পারত সে আমরা সম্পূর্ণ ধারণা করতেই পারি নে। অপরিচিত অক্ষরে লেখা অজ্ঞাত ভাষার কাব্যখণ্ডের মতো হয়তো আজও আমাদের কাছে তা নিষ্প্রাণ ও বোবা। বিশেষ অনুসন্ধান না ক'রে যে গানগুলির উল্লেখ করেছি এইমাত্র সে সম্পর্কে বলা যায় কিন্তু — বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার সারাৎসার রয়েছে ওদের অন্তর্নিহিত। যুক্তমন

নিয়ে ওদের আস্বাদন, ওদের জানা চেনা, কবির নিগূঢ় হৃৎস্পন্দন শোনা এবং গোনা আপন হৃদয়ে —শ্রদ্ধাশীল রসিকের পক্ষে তা অসম্ভব হবে কেন? বিশেষ ভাবে চর্চিত মনটি সংস্কারমুক্ত রাখা চাই সব দিকে, এই হল এ ব্যাপারে একটি কেবল শর্ত।

সানাই কাব্যের প্রায় সমকালীন ও সমান্তর যে রবীন্দ্র-গানগুলি, তার নানা গুণ ও গঠনশৈলী সম্পর্কে সবিস্তারে বলতে পারবেন শ্রদ্ধাশীল এবং সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা। কবিত্ব-সিদ্ধির বা সমৃদ্ধির আলোচনাও করবেন এ দিনের, আগামী দিনের, কবি ও কাব্যসমালোচক। সে বিষয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন এখানে নেই। রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-প্রসাদে কতকটা জানা যায় ঐ গান বা কবিতার নেপথ্যবিধান হয় কখন কিভাবে। সব জানা যায় না, কখনোই জানা যাবে না, তাতে ক্ষতি নেই বা অনুযোগ করাও চলে না। একটি কেবল রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু রসিক জনের সামনে আমরা মেলে ধরতে চাই; বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে সেটির অভিজ্ঞানসংখ্যা ১৫৯। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ এক খসড়া-খাতা: কাপড়ে-বাঁধানো, ছাপানো, দিনপঞ্জী বা 'ডায়ারি'। চিত্রবিচিত্র কাটাকুটি নিয়ে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লেখায় নানা গান কবিতা যে পারম্পর্যে এই খাতায় আবিষ্কার করা যায় সেই পরম্পরায় এদের রচনা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ অল্পই। গান ও কবিতা যেমন আছে, অন্য লেখাও থাকতে পারে। এখন কেবল গীতিকবিতাগুলির আংশিক সূচী-প্রণয়নেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। যে গানের কাব্যরূপ দেওয়া হয় নি, সানাই কাব্যে যা স্থান পায় নি অর্থাৎ সানাই-প্রেসকপির তনিমা ঘোচাবার জন্য যাদের তলব পড়ে নি, যথা-স্থানে সেগুলিরও উল্লেখ করা হবে।

কিন্তু কালক্রমিক এই তালিকা আরম্ভ করি কোন্‌খানে কোন্ গানে? 'মায়ার খেলা'র এক কাল থেকে আরেক কালের অভিসারিণী (অন্যূন অর্ধ শতাব্দের ব্যবধান মাঝখানে) 'যে ছিল আমার স্বপন-

চারিণী' সেই সুরের শরীরিণীকে দিয়ে না তাঁরও আগে যে প্রিয়ার ছায়া (এক না দুই ?) নীপসুগন্ধি বাদল-বাতাসে ভেসে ভেসে কবিমানসে আপতিত হয়েছিল ১৩৪৫ ভাদ্রের বিশেষ একটি দিনের বারি-ঝরা কোনো অবকাশে তাঁকেই আহ্বান ক'রে ? কবির 'সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান' যেমন, তেমনি তো প্রায় শেষ ফসলও ঘাটে এনে দিয়েছেন তিনি আপনার প্রসাদপবন উজান তরণীর পালে লাগিয়ে। তাঁকেই অগ্রবর্তিনী ক'রে প্রস্তুত তালিকাটি এখানে উপস্থিত করা ভালো। রচনার পারম্পর্য জানা থাকলেও, সুনির্দিষ্ট তারিখ সর্বত্র জানা নেই।[২] —

১ আমার প্রিয়ার ছায়া [৮ ভাদ্র ১৩৪৫] ২৫ অগস্ট্ ১৯৩৮
২ যে ছিল আমার স্বপনচারিণী ৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮
৩ তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে ৩ মার্চ্ ১৯৩৯
[আমি] তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
[শ্যামা নৃত্যনাট্যের সুরে লয়ে বাঁধা][৩]

৪ এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে
৫ বসন্ত সে যায় তো হেসে
৬ মম দুঃখের সাধন
৭ বাণী মোর নাহি
আজি দক্ষিণপবনে
৮ যদি হায় জীবনপূরণ নাই হল
৯ আমি যে গান গাই
ওগো পড়োশিনী
আমার আপন গান ১২ মার্চ্ ১৯৩৯
ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী ১২ মার্চ্ ১৯৩৯
১০ ওরে জাগায়ো না ১৩ মার্চ্
দিনান্তবেলায় শেষের ফসল দিলেম ১৪ মার্চ
১১ অধরা মাধুরী

১২ ধূসর জীবনের গোধূলিতে [মুক্তছন্দ]

১৩ তদেব ছন্দোবদ্ধ পাঠান্তর

১৪ দোষী করিব না ১২ এপ্রিল

১৫ দৈবে তুমি ১৩ এপ্রিল

ওগো সাঁওতালি ছেলে ১২ জুলাই

১৬ বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল ৩০ জুলাই

আজি তোমায় আবার

১৭ এসো গো জেলে দিয়ে যাও ১ অগস্ট্

আজি ঝরঝর মুখর বাদরদিনে

শ্রাবণের গগনের গায়

১৮ এসেছিনু দ্বারে তব ৪ অগস্ট্

১৯ স্বপ্নে আমার মনে হল

২০ এসেছিলে তবু আসো নাই

শেষ গানেরই বেশ নিয়ে যাও

নিবিড় মেঘের ছায়ায়

পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে

২১ মেঘ কেটে গেছে

সঘন গহন রাত্রি

২২ ওগো তুমি পঞ্চদশী

যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে
বারে বারে ফিরে ফিরে } ১০ ভাদ্র ১৩৪৬ বর্ষামঙ্গলের শেষ দুটি গান। সংরক্ষিত প্রুফে তারিখ : ১৯ ভাদ্র ১৩৪৬

২৩ কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

শেষোক্ত গানটির রচনা ডাকঘরের অভিনব নাট্যরূপের উদ্দেশে সন্দেহ নেই, তখনকার ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন রঙ্গমঞ্চে যেটির রূপ দিতে পারেন নি। যা তাঁর কবিমানসে সমুজ্জ্বল ও সম্পূর্ণ হয়েই ছিল তা আমাদের অগোচরই থেকে গেছে। অতঃপর ওই

নাটকের অন্য গানগুলিও আছে—

বাহির হলেম আমি /

আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল /

শুনি ঐ রুনুঝুনু /

সমুখে শান্তিপারাবার / ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ বেলা ১টা

এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে /

এ খাতায় এইখানেই শেষ হল এক-রকম খৃষ্টীয় ১৯৩৯ সনের স্বল্পাবশিষ্ট দিনগুলি। 'পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন' কোন্ অকূল থেকে মিলনবিরহাবেগের জোয়ারে যখন গান ভেসে এসেছে প্রায় অবিচ্ছেদে একটির পর আরেকটি। তালিকাবদ্ধ হয়েছে মোট ৪৪টি গান; দেখা যায় তার মধ্যে ২২।২৩টি কেবল্ কম-বেশি পরিবর্তনের পর কবিতা-রূপে স্থান পেয়েছে সানাই কাব্যে। সানাই কাব্যে একটি মাত্র কবিতা আছে মনে হয় যা পরে গান হয়ে উঠলেও মূলতঃ কবিতা : ভালোবাসা এসেছিল এমন সে নিঃশব্দ চরণে! / এর রচনা শান্তিনিকেতনে ২৮ মার্চ্ ১৯৪০ তারিখে। আর, অল্প দিন পরেই এর গীত-রূপান্তর হয় : প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে। / রচনাকাল ২৮ চৈত্র ১৩৪৬ বা ১০ এপ্রিল ১৯৪০। কবিতাটির চলনে বলনে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুঠাম দেখা যায় তা স্বতউদ্‌ভূত ব'লেই সুন্দর। পক্ষকালের মধ্যে যে গীতরূপান্তর তারও সুরের সৌষ্ঠব, সুর কথা উভয়তই রসের ব্যঞ্জনা, অতুলনীয়।

ফলে দেখা যায় পরিবর্তন সাধারণতঃ গান থেকে কবিতায়, কেবল বিরল একটি ক্ষেত্রে কবিতা থেকে গানে। আমরা যদি কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, ১৩০৩ আশ্বিনের কাব্যগ্রন্থাবলী -ধৃত চিত্রা / চৈতালি আর কল্পনার কথা মনে আনি সন্দেহ থাকে না, যে, সে যুগে যা ছিল কবিতা তাই গান অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন ক্ষণিকায়) হয়েছিল গান— সেজন্য ভাবে ভাষায় বেশি-কিছু অদল-বদলের প্রয়োজন হয় নি। কেননা, ঐ সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান সাধারণতঃ চার তুকে সম্পূর্ণ হোত আর না হলেও সেই গানে কাব্যিক ছন্দোবন্ধনের এতটুকু শৈথিল্য

24 Friday [83 – 282]

Fus.—19 Chyt. *Sam.*—3 Chyt (Sudee). *Mus.*—2 Safar.
Beng.—10 Chaitra, *Tritiya*, 8·55 *d.*

ভালোবাসা এসেছিল,
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে
এমনি দ্বিধায় ভাবিবার
বিদায় সে নিল যবে খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু তারে।
তখন সে স্বপ্ন হয়ে গেছে কায়াহীন
নিশীথে বিলীন,
দূর পথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

APRIL, 1939

Fuslee—Bysack, 1346. Mus.—Safar, 1358.
Samvat—Bysack (Budee), 1996. Beng.—Chaitra, 1345.

11 Tuesday [101—264]

Fus.—7 Bysack. *Sam.*—7 Bysack (Budee). *Mus.*—20 Safar.
Beng.—28 Chaitra, *Saptami*, 10-8 *d.*

নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে
দুয়ারে মম স্বপ্নের ধন সম এ যে দেখি
শুধু কণ্ঠের মালা একি গেছ ফেলে
জাগালে না শিয়রে দীপ জ্বেলে
এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে
চামেলির ইঙ্গিত আসে
যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে।
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্পভরা বকুলের ডালে
দক্ষিণ পবনের প্রাণে
রেখে গেলে বলনি যে কথা কানে কানে,
বিরহ বারতা
অরুণ আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে॥

থাকত না। তরুণী-রূপের গঠনে ও ঠামে যেমনটি হয়ে থাকে আমাদের প্রত্যাশা, তা থেকে কোনো তফাত হোত কি? অর্থাৎ কবিতার নিখুঁত নিটোল অবয়বই হোত গানেরও আশ্রয় অথবা আধার— উছলে উঠত সুরের অপার্থিব সুধা। কিন্তু, পরিণত বয়সে (আয়ুর পরিণতি কেবল নয় / সেই সঙ্গে প্রতিভারও) রবীন্দ্রনাথ অনেক দিকের অনেক নিয়মবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন স্বতই, তাঁর কাব্যছন্দের বিবর্তনেও তা অনায়াসে বুঝতে পারি, গানের তো কথাই নেই। সুর ও স্বরের ছন্দকে পুরোপুরি কাব্যছন্দের আশ্রিত হতেই হবে এই সংস্কার বা এমন অভিরুচি ধীরে ধীরে তাঁর ঘুচে গিয়েছিল দেখা যায়। কবিতায় শব্দের উচ্চারণগত যে মাত্রা আর গানে স্থিতিস্থাপক স্বরের যে মাত্রা দুটিকে প্রায় অভেদাঙ্গ করার বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না, বরং স্বরকে খেলাবার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত পদের ও পদসমুচ্চয়ের মাঝে মাঝে অবকাশ বা আকাশ ফেলে রাখাই প্রকৃষ্ট মনে হয়েছিল। কবিতা হিসাবে আবৃত্তি করতে গেলে যেখানে অভাব অসম্পূর্ণতা রয়েছে মনে হতে পারত, সুরের সমুচ্ছ্বসিত, তরঙ্গিত, বহু ভঙ্গিমায় লীলায়িত গতির পক্ষে তাই হয়েছিল এত উপযোগী, যে, একবার সে গান কানে ও প্রাণে যে শুনেছে চকিত চমৎকৃতি নিয়ে, অতঃপর কবিতা-পাঠেও তার পক্ষে নিখুঁত কাব্যছন্দ সন্ধান করা, তদভাবে কোনো দৈন্য বা ন্যূনতা আবিষ্কার করা সহজ ছিল না।

তবু এরকম গানকেই 'কবিতা' সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন যখন হল, রবীন্দ্রনাথ তাতে মাত্রাপূরণ না ক'রে পারেন নি এটাই আমরা লক্ষ্য করি সানাইয়ের আলোচ্য কবিতাগুলিতে। পরিণত বয়সে কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন যখন হয়েছে (সানাইয়ের সমকালে বুঝি একবারই) আমরা লক্ষ্য করি বিপরীত এক প্রক্রিয়া। তাই যেমন 'প্রেম এসেছিল' গানে তেমনি 'উর্বশী'র উদ্গীতরূপে কম-বেশি হরণ করা হয়েছে কবিতার আবৃত্তিগত মাত্রা; সেজন্যই শব্দগত অর্থ ভাব ও ব্যঞ্জনা অক্ষুণ্ণ রেখে অনেক শব্দ অথবা পদাবলীর যথেষ্ট

হের-ফের করতে হয়েছে।

সব সময়ে না হলেও অনেক সময়ে দেখা যায়, রসের প্রেরণা আদৌ যে খাতে বয়ে এসেছিল কবিচিত্তে তাতেই 'রূপ' হয়ে উঠেছিল অপরূপ এবং যে-কোনো রসিককে করেছিল চমৎকৃত। রূপান্তরে প্রেরণার ন্যূনতা, আবেগের বা রসাবেশের লাঘব, কখনো ঘটে নি এমন নয়। 'প্রেম এসেছিল' বোধ করি বিশেষ ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কবিতার স্বতউদ্‌ভূত প্রেরণাই আগে এসেছিল বটে কবিচিত্তে, সেই সঙ্গে গীত-স্রষ্টাও নিয়েছিলেন তাকে আপন অন্তরে প্রবাহিত সুরসুরধুনীর কোটালের বানে সুদুর্লভ কোনো লগ্নে। সানাইয়ের সমকালীন গান-গুলি ঠিক সেইভাবে কবিতা হয় নি, এ যদি আমাদের একান্তই মন-গড়া কথা না হয়, এর বিশেষ কারণ একটু তলিয়ে দেখা দরকার। রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রান্তিমুহূর্তে, যে 'মুহূর্ত'টি শতাব্দের এক দশক বা তার বেশিও হতে পারে, কেমন ছিল তার মতি গতি প্রকৃতি সেটাই তা হলে আমাদের বিচারের বিষয়। সাধারণভাবে বলা যায় না কি—রবীন্দ্র-কাব্যস্রোতে পূববী পর্যন্ত যেন ভরা জোয়ার ছুটে চলেছে অপ্রতিহত বেগে ; তার পরেও নানা দিনের নানা জোয়ার-ভাঁটা মিলিয়ে তার বেগ তার তরঙ্গভঙ্গ তার নিত্য নূতন পথ কেটে চলার প্রবণতা বিস্ময়কর তা স্বীকার করতেই হবে। মহুয়ায় আর বনবাণীতেও যেন একই কালে যৌবনের ও পরিণত প্রৌঢ়ির প্রবল আবেগ বারে বারে ফিরে এসেছে। তার পরে ? সাধারণভাবে বলা চলে না কি কবির থেকে সুরস্রষ্টার ভূমিকাই সমধিক ? অপরূপ রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলি স্মরণ করা যেতে পারে। যেখানে ছন্দস্রষ্টা সুরস্রষ্টার ভূমিকাই মুখ্য ; তাঁর হাতে বিচিত্র উপায় ও উপকরণ জুগিয়ে দিয়েছেন কবি আর তা দিতে হয়েছে ব'লেই কবিও ক্ষণে ক্ষণে পেয়েছেন নব প্রাণ নবীন যৌবন। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের শেষ বয়সের অনেক কাব্যে বা কবিতায় আঙ্গিকের অধিগত নৈপুণ্যে অথবা অভিনবত্বে আমাদের যতটা অভিভূত করে, রসের চির-তারুণ্যে ও চমৎকারে তেমনটি করে কি ? ভাব ভাষা বিষয়ের উপর

কবির অধিকার অক্ষুণ্ণ আছে, এমন-কি বেড়েছে বলাও যায়, কিন্তু তাতেই কি ষোলো-আনা তৃপ্তি হবে রসিকের? কোথায় না জেনেই একটু যেন কৃপণতা করলেন কবি, কী যেন দিলেন না। সেই সবের-অতিরিক্ত, সবার-শেষ, বিষয়াশ্রিত অথচ বিষয়াতীত 'বস্তু'টি ইচ্ছা করলেই যে দেওয়া যায় অথবা হাতে রাখা চলে এমন তো নয়। তা যদি হয়, গীতিকার সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তবু আপন প্রাতিভ আয়ুষ্কালের শেষ মুহূর্ত অবধি কখনো আমাদের একটুও বঞ্চিত করেন নি, অভাব বা অপূর্তি অনুভবের অবকাশই দেন নি— উচ্ছলিত সুরের প্রবাহে বারে বারে আপ্লুত ও পরিপ্লাবিত করে দিয়েছেন আমাদের— কী রাগ রাগিণী কেমনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে অপূর্ব কোন্ স্বরসংগতি সৃষ্টি করেছেন, রসাবিষ্ট কবি সে যেমন বোধিতে জানলেও বুদ্ধিতে জানেন নি, রসিকও জানেন না জানবার চেষ্টা যেন না করেন কেবল চিরায়ত বা পূর্বপ্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে জোঁকা দিয়ে। রসের প্রেরণে নতুন যদি কিছু হয়েই থাকে, সাদরে তাকে যেন বরণ করেন, তারই গভীরে দেন ডুব। সেই দুর্লভ সুযোগ আলোচ্য গানগুলিতে প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে, এমন কথা কোনো কোনো সঙ্গীতজ্ঞ গুণীও বলে থাকেন। এ কথার শেষ মীমাংসা হবে একদিন স্বয়ং মহাকালের দরবারে। আজ না-ই হল।

নানা উপলক্ষ্যে নানা ভাবে কবি বার বার বলেছেন— গানেই তাঁর সব সাধনার শেষ সিদ্ধি তিনি পেয়েছেন পরম সুখ। গানেই তাঁর সারা জীবনের সারাৎসার বস্তু উৎসৃষ্ট হয়েছে একাল আর ভাবীকালের উদ্দেশে। মর্ত্য পৃথিবীতে দেহ ধারণ করে গানেই তিনি যেন শেষ পর্যন্ত প্রাণবান সজাগ সচেতন ছিলেন আর থাকবেনও চিরদিন।

রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন এ যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়, সব-শেষে সঙ্গীতেই সেই কবিত্বের ও স্রষ্টৃত্বের পরাকাষ্ঠা তাঁর। সুরের স্বর্গেই তিনি অলৌকিক এবং অদ্বিতীয়।

উত্তরটীকা

১ সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতা না থাকায় টীকা-টিপ্পনীর বাহুল্য এ ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত। একটি উদ্‌ধৃতি তবু দিতেই হয়। দ্রষ্টব্য ১৩৩৪ বৈশাখের বঙ্গবাণীতে 'সঙ্গীতের কথা' প্রসঙ্গে ধূর্জ্জটী-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি :

'যতবার আলো নিভাতে [জ্বালাতে ?] চাই', 'মন্দিরে মম কে [আসিলে] ' গানগুলি হিন্দুস্থানী সুরের তর্জ্জমা। দ্বিতীয় যুগে তিনি কথায় ভাল ভাল সুর বসাচ্ছেন, যেমন 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা', 'রিম্. ঝিম্, ঘনঘন রে' প্রভৃতি গান ; তখন তিনি হিন্দুস্থানী সুরের কাঠামোটি বজায় রেখে *experiment* কোরছেন, সুরগুলি মিশ্র হয়ে যাচ্ছে ; এই সময়ের গানগুলি সকলেরই ভাল লাগে। তৃতীয় যুগে··· বাহারের সঙ্গে মল্লার মিশল, ভৈরবীর সঙ্গে খাম্বাজ, বেহাগের সঙ্গে কেদারা···। এর পরের যুগ··· বাউল কীর্ত্তনের ···। এর প্রথম স্তরে মুসলমানী কাঠামোর ভিতর বাউলের প্রাণ প্রতিষ্ঠান। এই যুগে একেবারে নূতন সৃষ্টি !··· এই শেষ যুগের সঙ্গীতকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করতেই হবে। মিশ্রণই হচ্ছে সঙ্গীতের ধারা, কেননা— ***Genius compresses the accomplishment of years into an hour glass.***

—সঙ্কলন, বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ. ১৬৫

২ প্রথম গান ও তালিকাশেষের দুয়েকটি গান রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১৫৯ -ধৃত নয় ; ভিন্ন রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি থেকে। তবুও এ-ক'টি সানাই-সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনায় অত্যাজ্য। তালিকার কেবল ২৩টি গানে সংখ্যা আরোপিত। এদের প্রত্যেকটি রূপান্তরে সানাই কাব্যের অঙ্গীভূত। ১২ ও ১৩ অঙ্কিত গানের কাব্যরূপান্তর অনন্য, অর্থাৎ একটি। অতএব গানের সংখ্যা ২৩ ও কবিতার সংখ্যা ২২। আমাদের আরোপিত সংখ্যা অনুযায়ী কবিতা-রূপান্তরগুলির পর

পর উল্লেখ করা যায় সানাই-ধৃত শিরোনাম দিয়ে—

১ ছায়াছবি
২ গান : যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
৩ ভাঙন
৪ যাবার আগে
৫ বিদায়
৬ অনাবৃষ্টি
৭ বাণীহারা
৮ উদ্‌বৃত্ত
৯ গানের খেয়া
১০ ব্যথিতা
১১ অধরা
১২।১৩ নতুন রঙ
১৪ আত্মছলনা
১৫ গানের জাল
১৬ দেওয়া-নেওয়া
১৭ আহ্বান
১৮ কৃপণা
১৯ আধোজাগা
২০ দ্বিধা
২১ মরিয়া
২২ পূর্ণা
২৩ রূপকথায়

সর্বশেষ দৃষ্টান্তে গানের ও কবিতার বাণীতে অত্যল্প ভেদ।

৩ উত্তীয়ের প্রাণের কথা? যেন রচনার কালাতিক্রমদোষেই স্থান নিল না শ্যামা নৃত্যনাট্যে।

প্রেমের গান

রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন বেদব্যাস আজ পর্যন্ত কেউ দেখা দেন নি, জন্মেছেন কিনা বলা যায় না, যিনি কবির প্রায় দু হাজার গান বিষয়বস্তু অথবা রাগরাগিণী-ভেদে অথবা উভয়তই (?) পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে ভাগ ক'রে অবিসংবাদিত এক শৃঙ্খলায় রসিক ও সামাজিক -গণের সামনে সাজিয়ে দেবেন। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন সে চেষ্টায় অকৃতকার্য হয়েছেন, সুরের দিক দিয়ে না-ই হল— প্রসঙ্গবিচারে নিশ্চিত ও নিখুঁতভাবে সব গান বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ-বিভাগ করতে হার মেনেছেন, অতঃপর আর কেউ সাহস করবে কি ? এইমাত্র বলা গেল 'সব' ; কবি-কর্তৃক সম্পাদিত দুই খণ্ড গীতবিতানের ক্ষেত্রে তা অর্থহীন মনে হবে প্রচলিত তৃতীয় খণ্ডের পাতা উল্টে গেলে। শেষোক্ত খণ্ডে গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের কতক গান নাহয় অনিবার্য কারণেই দ্বিতীয়বার, এমন-কি তৃতীয়বারও ছাপা হয়েছে, তা ছাড়া অনেক গান তবু রয়েছে যা আগের দুটি খণ্ডেই যাওয়া উচিত ছিল— যায় নি কেবল কবির এবং তাঁর সহকারীগণের অবহেলায় বা অনবধানে। 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ', 'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ', (আখর-যুক্ত) 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু' বা 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' বা 'ওহে জীবনবল্লভ' অথবা 'আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি',[১] 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে', 'অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে', 'আপনহারা মাতোয়ারা', 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে' (কত বলব / একেবারে শেষের দিকের গান নাই ধরলেম) —এগুলি কি বর্জনীয় ব'লেই স্থির করলেন রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৫ বা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে ? হয়তো কবির সদা-সৃজন-তৎপর মনের কোনো নেপথ্যে লুকোচুরি খেলার ছলে তারা হারিয়েছিল, কবি স্মরণ করেন নি আর সহকারীগণও খুঁজে পান নি বা ডেকে আনেন নি। যা হোক, আমাদের গণনাসিদ্ধ যে হাজার দেড় গান রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালেই বিরলপ্রচারিত[২] গীতবিতানের পূর্বোক্ত দু খণ্ডে দেওয়া হয়, তার শ্রেণীবিভাগ আর বিন্যাস নিয়ে স্বয়ং কবি কি খুশী হয়েছিলেন ?

কবির অন্তর্যামী না হওয়ায় এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি নে। প্রথম খণ্ডে পূজাপর্যায়ের গানগুলি (মোট ৬২৭টি) সাজানো হয় পর পর ২১টি গোষ্ঠীতে অবশ্যই ভাবসংগতির দিকে লক্ষ রেখে; দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেম-পর্যায়ের ৩৬৮খানি গান (অপর ২৭টি গান এই পর্যায়ের প্রবেশক বলা চলে), এতে কোনো উপবিভাগ এল না যে, এটা কি কম আশ্চর্যের বিষয়? অথচ যে-কোনো বৈষ্ণব মহাজন অথবা পদকর্তা যখন শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলার ধ্যান ধারণা করেন, কীর্তন করেন, সেই সঙ্গে তার অন্তর্লীন থাকে শতবিধ বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যানের বৈচিত্র্য ও পারিপাট্য— রবীন্দ্রনাথের তা অগোচর ছিল না। সেই বিচারেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস আদির পদাবলী স্তরে স্তরে পর্বে পর্বে ভাগ বিভাগ ক'রে সাজানো হয়ে থাকে গ্রন্থে। বৈষ্ণব অবশ্যই মর্ত্য প্রেমকে দিতে চেয়েছেন অমর্ত্য ভাবলাবণ্য সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত এক পরম্পরার আশ্রয়ে। রবীন্দ্রনাথ দিলেন না ঠিক সেইভাবে, তবু তাঁরও প্রেমের গানে স্বর্গ মর্ত্যের মিলন কি চমকিত ঝলকিত হয়ে ওঠে নি ক্ষণে ক্ষণে কথায় ও সুরে? বৈচিত্র্যই বা কম কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব মহাজনের পদাঙ্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে স্বক্ষেত্রে বহুবিচিত্র পর্যায় উপপর্যায় পঙ্‌ক্তি জোট বা গোঠ বেঁধে দেন নি, একই পর্যায়ে সাজিয়ে দিয়েছেন প্রায় সার্ধ তিন শতের অধিক গান, এজন্য আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা বেশি বৈ কম নয় অবশ্য। সৃষ্টির পর শ্রুতি। শ্রুতিরও পরে আসে স্মৃতির যুগ। অর্থাৎ, বেদ উপনিষদের পরে মনু-পরাশর, পুরাণ ও উপপুরাণ। আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাই, উপলব্ধি করতে ও স্মরণ করতে চাই সব সময়েই স্রষ্টারূপে। রূপরসের অপরূপ অলৌকিক ভুবনে হিসাবী বিভাগকর্তা বা বিধান-দাতা রূপে ততটা নয়। এ হল স্থূল বিচারই, সূক্ষ্ম নয়। তার পর কত গান যে আছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত গীতবিতানের 'পূজা' 'প্রকৃতি' ও 'বিচিত্র' পর্যায়ে যা প্রেমের গান ব'লেই প্রতীতি হয়— 'নয়' বলা মিথ্যা হবে— এমন কত আছে তারও হিসাব কে নিয়েছে? অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ

এমন অনেক গানই 'প্রেম' পর্যায়ে সাজিয়েছেন যা 'পূজা' বা 'প্রকৃতি' পর্যায়ে সসম্মানে স্থান পেত— পাল্টা জবাবে এই তো বলা হবে? ফলে সংশয় ওঠে, প্রশ্ন ওঠে। 'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে' (গীতাঙ্ক ১৫৬)[৩] —কী নিয়ে এই গান? 'বন্ধু, রহো রহো সাথে' (৯৩) — কার জন্য কার এই আকূতি বাদল-বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে আজ প্রস্ফুটিত দোলন-চাঁপার গন্ধের দোসর হয়ে? প্রেম নয়? শুধু বৃষ্টি বিদ্যুৎ বায়ুবেগ আর সিক্ত শ্যামল পল্লবের উচ্ছ্বাস আর কামিনী কূটজ কেতকীর সৌরভ? 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' (৫) গানে যদি জন্মবিরহিণী শ্রীরাধার আর্তি আর অভিমান ব্যঞ্জিত হয়ে থাকে অপূর্ব সুরে ছন্দে (রাধা তো আমাদেরই হৃদ্‌নিবাসিনী) 'শাঙন-গগনে ঘোরঘনঘটা' (২) দেখে বজ্র বিদ্যুৎ ধারাবর্ষণ আর সঘন বনান্ধকার উপেক্ষা ক'রে তিনিই না প্রথম অভিসারে বেরিয়েছিলেন একদা নবকৈশোরে? একটিকে আরেকটি থেকে অনড় কঠিন ভাগে বা বিভাগে পৃথক্ করে রাখা যায় কেমন ক'রে? 'ছিল যে পরানের অন্ধকারে এল সে ভুবনের আলোক-পারে' (৬৯) আর তাকেই অপলক দৃষ্টিতে দেখে দেখে প্রতীতি হল: 'তোমায় নতুন ক'রে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ!' (৬৮) তাকেই বার বার বলি: 'এসো আমার ঘরে!' (৯৭) সে মানব না মানবী, জীবনদেবতা অথবা ঈশ্বর তা বলতে পারি নে।* তবে, এই-যে ভাবঘন রসরূপ এরই নাম তো 'প্রেম'? এ যেমন লৌকিককে করে অলৌকিক তেমনি অলৌকিককেও একেবারে অস্পর্শ অধরা থাকতে দেয় না— সকল সত্তা দিয়ে হৃদয় দিয়ে অপরশ আলিঙ্গনে বেষ্টন করে। প্রেমে আর পূজায় নিত্য তাই দোলাচল আমাদের চিত্ত, গীতবিতান সম্পাদনা করতে ব'সে কবি যাই বলুন।

---

* যতগুলি গানের উল্লেখ হল এ পর্যন্ত, তার মধ্যে 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' ও 'এসো আমার ঘরে' গান-দুটি 'প্রেম' পর্যায়ে, অন্যগুলি গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ডেরই অন্যত্র সংকলিত।

দ্বিতীয়খণ্ড গীতবিতানে 'বিচিত্র' বিভাগটি নাহয় ছেড়ে দিই, বিধাতা যে হার মেনেছেন স্রষ্টার কাছে তার সাক্ষ্য আরো তো শতাধিক গানে। তারা 'প্রেম' 'পূজা' 'প্রকৃতি' যে-কোনো পর্যায়ে যেমন ধরা দিতে ইচ্ছুক, তার বাইরেও তাদের স্বরূপ-পরিচয় একটুও ঢাকা থাকে না।

বিষয়ভেদে (তেমনি সুরসঙ্গতিভেদে?) রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেণীবিভাগ যে অনায়াসে করা যায় না, ভাগ ক'রেও ভাগ মুছে ফেলতে হয়, নানা দিক থেকে নানা ভাবেই রসের আবেদন পৌঁছয় রসিকচিত্তে, সে কথাই যেমন তেমন ক'রে বলবার চেষ্টা করা গেল এতক্ষণ। আর তা যদি হয়, আগে-ভাগে জল-অচল সীমানা নির্ধারণ ক'রে বিভিন্ন পর্যায়ে গানগুলি সাজাবার প্রয়োজন কোন্‌খানে? অন্তত, রবীন্দ্রনাথের সব গান যদি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সামগ্রিকভাবে আমরা দেখতে চাই, বুঝতে চাই। যেভাবে ঊর্ধ্ব-আকাশ থেকে দেখা যায় আদিগন্ত ধরণী। রূপরসের শ্রেণীবিভাগের থেকে, কালের সরণীতে কবিচিত্তের ক্রমিক অভিসরণ বরং আমাদের বেশি শিক্ষা দিতে পারে —কোন্ সর্বসাধারণ (?) সমতল থেকে ক্রমে ক্রমে কোন্ উত্তুঙ্গ চূড়ায় উত্তীর্ণ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কোন্ রসের নির্ঝর অহর্নিশ ঝরে ঝরে পড়ছে সেই শিখর থেকে, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করছে সজন নির্জনতা (কথার খেলা হল কি? দেশ-দেশান্তরে কাল-কালান্তরে কবির রস-সত্রে অঞ্জলি পূরে নেবে কত মানুষ, কী আনন্দে আবেগে তৃষ্ণায়, তার তো গণনা নেই অথচ প্রত্যেকের রসসম্ভোগ ও উপলব্ধি একা তারই তো?)— সেটি আমরা সহজে ধারণা করতে পারি। আচ্ছা, এ কথা মেনে নিলেম— বিশেষ সময়ের বিশেষ মতি ও মেজাজ থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনিঃশেষ ভাণ্ডারে ঢুকে তাঁদের প্রিয় প্রেমের গানই নাহয় বেছে নেবেন প্রেমিক প্রেমিকা। কিন্তু প্রেম-উপলব্ধির ও অভিব্যক্তির কোনো ক্রমিক বিবর্তন কি লক্ষ্য করবেন না? কালে কালে রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমপরিণতির সঙ্গেই তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, তা অভিন্ন, তা অচ্ছিন্ন। সুতরাং গানগুলি প্রধানতঃ কালক্রমে সাজালেই রচনার সে

দিকটির ধ্যান ধারণা মনন সম্ভবপর হবে রসিক সামাজিকের পক্ষে —অন্য কোনোভাবে তেমনটি হবে না।

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখি, কবিতায় দেখি, প্রেম আর মুক্তির বিরোধ ঘুচে গিয়েছে ক্রমশ কবিচেতনায়; একটি আরেকটির পরিপূরক হয়ে উঠেছে বা একটির সঙ্গে আরেকটি হয়েছে সমন্বিত। গানেও তার প্রভাব কি পড়ে নি? 'পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে!' রবীন্দ্রনাথের পুষ্পাঞ্জলিতে যার বীজমন্ত্র, কড়ি ও কোমলে বা মানসীতে যা অনুপস্থিত নয়, লিপিকায় ও বলাকা কাব্যে অপূর্ব ভাবে ভাষায় ছন্দে যার আশ্চর্য সুন্দর অভিব্যক্তি, মহুয়ার কবিতায় গানে প্রেমের সেই একই চমৎকার-জনক নূতন মাত্রা। রবীন্দ্র- জীবনে ও প্রতিভায় সেটি বুঝি সব সময়েই বর্তমান ছিল। প্রেম তাঁকে পথে বার করেছে বার বার; পরিণামে সে তাঁর পক্ষে বলিষ্ঠ পথের প্রেম, পথিকেরই প্রেম।

এ কথা এখন থাক্। রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রিয় ও পরিচিত প্রেমের গানের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা-প্রণয়নের লোভ হয় আমাদেরও; লোভের বশে ভুলে যেতে পারি, দুর্দান্ত উকিল-ব্যারিষ্টারের জেরার মুখে শেষে টিকতে পারব না— সাব্যস্ত হব ক্ষিপ্ত ব'লেই। কেননা, যে-দুটি শব্দের জোড়-কলমে বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা, তার কোনোটির কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই লেখকের— সত্যের খাতিরে এ কথা কবুল করতে হয়। লোভ তবু হয়, কেননা, এই উপায়েই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান নিয়েও অল্প যা মননের ও উপলব্ধির অবকাশ আছে আমাদের, কিছু তার বলা যায়।

এ কথা বলা বাহুল্যই, পার্থিব এবং অপার্থিব প্রেমের (অপার্থিব / যে ক্ষেত্রে প্রেম ও পূজা একই গানের কথায় সুরে লুকোচুরি খেলার ছলে আমাদের চকিত চমৎকৃত করে) প্রেমের প্রায় এমন কোনো সূক্ষ্ম সুকুমার সুন্দর ভাব অথবা ভঙ্গী নেই রবীন্দ্রনাথ যার ভাষা দেন নি, যা রূপে রসে ছন্দে সুরে শরীরী করে তোলেন নি। যা সুতীব্র, প্রবল, প্রখর, তাও ছুঁয়ে যান নি এমন নয়। কেবল, যা স্থূল, যা অসুন্দর

অশালীন বা নিতান্ত অগভীর, স্বতই তা পরিত্যাগ করেছেন। কবির কাছে মর্ত্যজীবনের আধার প্রাণ মন দেহ কিছুরই অনাদর কোনোদিন ছিল না। বিদেহ নিরাকার নয় প্রেম। হবেই বা কী করে? যে কবি বারে বারে গেয়ে ওঠেন—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ

তিনি যেমন নিরাকারবাদী নন তেমনি আবার মাটি পাথরের হোক, রক্তমাংসের হোক, কোনো মূর্তিরই তিনি পূজা করতে পারেন না। দেহহীন নয় কিন্তু দেহের পাত্রে সর্বদা দেহাতীত এক বস্তুই উপজাত উপচিত হতে থাকে, দেহের অণু পরমাণুকে স্পর্শ করে অলৌকিক এক চেতনার আলো, যেজন্য বলতে হয়—

১ আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান
২ ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে (৩২)
৩ আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি (১৪১)
৪ আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গমাঝে
বরণের মালা সেজেছে আলোক-মালার সাজে (১২৬)

'অধরা মাধুরী' বারে বারেই ধরা দেয় ছন্দে সুরে, তার 'অপরশ আলিঙ্গনে'ও নিজেকে সঁপে দিতে হয়।

রবীন্দ্র- গীতিকাব্যের বা সঙ্গীতের সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখি, বৈষ্ণব মহাজনদের অনুসরণে আর ব্রজবুলির অনুকরণে ও অনুশীলনে নবযুগের নূতন এই প্রতিভার প্রথম কলকূজন, প্রথম আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস। তার প্রথম সফলতাই বুঝি: গহনকুসুমকুঞ্জ-মাঝে! (১) মনে রাখতে হবে, ইতিপূর্বে দেবভাষার শব্দধ্বনি ও ছন্দের আকর্ষণে শুধু, নিভৃতে আপন-মনে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের সঙ্গে এই প্রতিভাবান্ কবিকিশোরের সুমধুর সখ্যস্থাপন। বাণীর দিক দিয়ে ভানুসিংহ ঠাকুর সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস আদির অনুকরণ যদি বা করে থাকেন, সুরসৃষ্টি করেছেন নিজে—এ

বিস্ময় তো কম নয়।

পুলকাঞ্চিতকপোলে চন্দনচর্চিতভালে কবিতা ও গান এসে দাঁড়িয়েছে গাঁটছড়া বেঁধে আমাদের আনন্দঅভিনন্দন নিতে। ধরা যাক, তরুণ বয়সে এখানেই তার যাত্রা শুরু। (১।২) তার পর 'বলি ও আমার গোলাপ-বালা' (৩) 'শুন নলিনী খোলো গো আঁখি' ইত্যাদি স্বরচিত গানে, মেজদাদার কাছে আমেদাবাদে থাকতে, সুধাধৌত ছাদে নিঃসঙ্গ নিশাচর্যার কালে নিজে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এ কথাও আমাদের জানা আছে।[৪] ভগ্নহৃদয় (৪), ছবি ও গান (৬), প্রকৃতির প্রতিশোধ (৭) পার হয়ে আসার পর, বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষ দশকে যে আত্মীয়বিচ্ছেদ মর্মান্তিক আঘাতে একরূপ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে জীবনের পূর্ব আর উত্তর পর্ব, তারও পরে কড়ি ও কোমলে (৯-১৪) ও মানসীতে (১৫।১৬।২৮।৭১) পৌঁছে কবিপ্রতিভার নূতন স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা-লাভ। একালের অধিকাংশ গানে, বিশেষতঃ প্রেমের গানে, বাণী আর সুর উভয়ই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি; তার সৌকুমার্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, ভাবব্যক্তির অপরূপতা ও নূতনতা সবই তাঁর একান্ত আপনার— কোথাও থেকে ধার-করা নয়। আর, মায়ার খেল্যাতে (১৭-২৭) এই নবযৌবনের ভরা জোয়ারে বা কবিকল্পনার কোটালের বানে গান ভেসে এসেছে অজস্র। অ-সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সুবেশা সুকণ্ঠী কলাকুশলিনী কুলবালাগণের সাত্ত্বিক ভাবব্যক্তিতে তথা আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ে যে চমৎকারের সৃষ্টি করেছে, আজও করে, তার কোনো তুলনা হয় না— বহুবৎসর পরে যেভাবে নৃত্যনাট্যে (১৬০-১৬৪) রূপান্তরিত করেছিলেন ওই গীতিনাট্য (অভিনয় হয় নি সর্বসমক্ষে) আর তৎপূর্ববর্তী গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য যেগুলি তার কথা মনে না আনলে। মায়ার খেলার প্রথম অভিনয়- দর্শনের ও শ্রবণের অভিজ্ঞতা বাংলার তথা ভারতের রাজধানীতে কেবল বিত্তবান্ বিদ্বান-সমাজের পরিশীলিতরুচি মুষ্টিমেয় রসিকজনকেই নয়, ইতর ভদ্র সকলকেই, বিশেষতঃ তরুণ-তরুণীদের কতটা প্রভাবিত করেছিল, সুন্দরীর মণিরত্ন-

খচিত কণ্ঠহারের থেকে চমৎকারজনক ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল তাঁরই সুকণ্ঠের গান, সে আমরা কল্পনা করতে পারব কি ? সত্য বটে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে, কল্পিত (প্রায়-অবাস্তব) নরনারীর ছায়াময় মায়াময় জীবনের রূপায়ণেই গানগুলির রচনা কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের তরুণচিত্তের সব ভাবমাধুরী নিংড়ে সবটুকু রসসিঞ্চন ক'রেই তো এদের প্রত্যক্ষতা। এ-সব ক্ষেত্রে উপলক্ষ্যই আসল হেতু নয়, সৃজনউৎসের নির্দেশক বা নিয়ামক নয়, কবি- চিত্তের তথা প্রতিভার ক্রমিক উন্মেষই বিশিষ্ট কারণ-স্বরূপ —এ কথা বোধ করি কোনোরূপ বাহ্য প্রমাণ-প্রয়োগে সাব্যস্ত করতে হয় না। রবীন্দ্রগীতিপ্রতিভার সে সময়ের সব বৈশিষ্ট্য বা নূতনতা, সব মাধুরী, সব সুষমা, ভাবের কারুকার্য ও চারুতা, সর্বোপরি রুচি কমনীয়তা— এক মায়ার খেলার গানেই যেন স্বতঃ-প্রকটিত।

মায়ার খেলার পরে ১৩০৩ সনের কাব্যগ্রন্থাবলী-ধৃত মানসী (১৫।১৬।২৮।৭১), সোনার তরী (৩১।৩৬।৩৭।৬১), চিত্রা (৪০।৪১।৪৪) ও গান অংশ (২৯।৩০।৩২-৩৫।৩৮।৪২।৪৫-৪৯) ছুঁয়ে ও তার পরে, একরূপ কল্পনা (৫০-৬০) কাব্যের সমসময়ে, কবি রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার দেশকাল দিনক্ষণের সন্ধানে ছাপা বইয়ের আম-দরবারের পাশ কাটিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাদের প্রবেশ করতে হয় কবির-স্বহস্তে-লেখা মূল পাণ্ডুলিপির কোনো-না-কোনো খাস-দরবারে। এগুলির একটির নাম এখন মজুমদার-পাণ্ডুলিপি।[৫] এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি অন্যত্র। বর্তমান প্রেমের গানের তালিকায় উক্ত পাণ্ডুলিপির সীমা-সরহদ্দ সংখ্যা ৩২ থেকে ৬০ অবধি প্রসারিত, অত্র উল্লিখিত কয়েকটি কেবল গান না ধরলে। কোন্ গান কোন্ তারিখের রচনা তাই শুধু নয়, সেদিনের আবহাওয়া কেমন ছিল— নৌকা ছিল ধানের ক্ষেতের ভিতর (৫৮), নাগর নদীতে (৫৬।৫৭) অথবা চলন বিলে (৫৫), যেদিন টলোমলো করেছিল ঝড়বৃষ্টির দাপটে নিদ্রাহারার জাগর স্বপ্নে উদয় হয়েছিলেন না-জানি-কোন্ মায়াময়ী যাঁর মুখে চেয়েই মনে এসেছিল 'আহা! জাগি

পোহালো বিভাবরী' (৪৫) —অনেক কথাই জানতে পারি। বাণীর অথবা সুরের স্বতঃসমৃদ্ধি তাতে না বাড়লেও, অতিদূর কালের বিস্ময়কর পরিপ্রেক্ষিতটি জানতে আমাদের কৌতূহল হয় বৈকি! রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিও কিছুটা আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিশেষ আলোকে— কিভাবে 'আপন হতে আপন মনে সুধা ছানিয়ে' তাঁর গানের বাণীবিন্যাস বা সুরসৃষ্টি।

বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দটি পিছনে ফেলে— নিজের জীবনের প্রায় চারটি দশক মাড়িয়ে— কত দুঃখসুখ, ভাগ্যবিপর্যয়, আশাঅভীপ্সার আহ্বান ও আবর্তন পার হয়ে— উত্তীর্ণ হলেন রবীন্দ্রনাথ কোন্ বৃহত্তর ও মহত্তর পরিণামে যখন চিরকুমারসভা (৬২।৬৩), প্রায়শ্চিত্ত (৬৪), অচলায়তন (৬৫), এগুলির পর পাওয়া গেল গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের গান (৬৬)। গীতাঞ্জলির অনেক গান যেমন 'প্রকৃতি' তেমনি 'প্রেম' পর্যায়ে নেওয়া যায় বৈকি, তবু আমরা বেশি লোভ করব না (কবি নিজে নিয়েছেন 'প্রেম' পর্যায়ে 'নাই রে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে') আর গীতিমাল্যের 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে'র উল্লেখ করে কেবল বলব : 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান? এ গান ভক্তের শুধু? প্রেমিকেরও প্রাণের আকুলতা কি উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয় নি এর প্রতি কথায়, সুরে সুরে, মীড়ে মূর্ছনায়?'

যাই হোক, সোনার বাংলার কবিকে, কেবল ভারতের নয়, বিশ্বের কবি ব'লেও যদি মনে মনে অন্তত অভিমান করি এখন (মুখে নাই বা বড়াই করলুম) অসংগত কিছু হয় না। প্রায় ষষ্টি বর্ষের সিংহদ্বারে এসে পৌঁচেছেন কবি। তাঁর সৃজনপ্রতিভায় কোনো ক্লান্তি শৈথিল্য বিষাদ অবসাদ জড়তা মূঢ়তা আবিলতা বা শুষ্কতার লেশমাত্র কোথাও দেখা যায় না। পূর্বে ছিল কখনো? কিন্তু জরাপরাভব একি প্রাণশক্তি, একি নিঃসীম তারুণ্য! প্রেমের গান কবিতা রচনার এই কি বয়স?[৬] কে বলবে 'নয়', যখন বারে বারেই 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' (৬৭) প্রাণের ও গানের, যখন অন্তরের ঠাকুরকে মনের মানুষকে 'নতুন করে

পাব ব'লেই হারাই ক্ষণে ক্ষণ', হারাতে পারি নে তবু হারাবার কল্পনায় 'ভয়ে কাঁপে মন / প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন' (৬৮)। ফলতঃ আমাদের কবির চিদ্‌যৌবন চিরনূতন চিরস্থায়ী তার সাক্ষ্য দেয় যেমন পূরবী প্রবাহিণী মহুয়া তেমনি আরো কত কাব্য কথা কল্পনা। অবশ্য, প্রায়শই কোনো-একটা ছল-ছুতো খুঁজে বা সূত্র ধ'রে কবি-কল্পনা সক্রিয় হয়ে উঠেছে আর তখনি কবির—

নবযৌবনে নবসোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া সোনার তার।

কবি সত্যই তাই বলতে পারলেন—

যে বাণী আমার কখনো কারেও হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা। ……
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ উচ্ছুসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সোহাগে আপনি চকিত বীণার তার।

এভাবেই রচিত হয়েছে মহুয়ার উজ্জ্বল রসের সমুজ্জ্বল কবিতারাজি আর তার আগে ও পরে অজস্র প্রেমের গান। মহুয়ার প্রেমে মাদকতা নেই শুধু, আছে বলিষ্ঠতা— চিরপথিক মানুষ, তার পথের বাধা ও বন্ধন নয় প্রেম, আনন্দময় মুক্তির দিশাই আছে তার অন্তরে —এ কথার আভাস দিয়েছি পূর্বেই। এখানে বিস্তারিতভাবে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য করতে হয় জীবনরসিক কবির রূপরাগের নিত্যনবীনতা প্রাচুর্য এবং প্রবলতা। অন্তরে যা অক্ষয় অপরিমিত, বাইরে নানা উপলক্ষ্যে তার প্রকাশ— ঋতুনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, 'রূপক' ইত্যাদি।

রসরূপ এবং রাগরূপ -রচনায় একটি ঋতুবদল অবশ্য লক্ষ্য করতে হয় যার মূলসূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যখন বলেছেন: 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।' (১৩ জুলাই ১৯৩৫ / ২৮ আষাঢ় ১৩৪২)

এই উক্তিতে অতিশয় সংক্ষেপে ও সংহতভাবে সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যেমন আত্মপরিচয়টুকু দিয়েছেন তেমনি সঙ্গীতক্ষেত্রে কালোয়াতিতে ও সঙ্গীত-সৃষ্টিতে কী তফাত সে সম্বন্ধে তাঁর চিরপোষিত ধারণারও আভাস দিয়ে গেছেন। ভাব বাংলানো হতে পারে যেমন কথায় তেমনি সুরেও; সে এক-রকম সংহতির ও পরিমিতির অভাব, আতিশয্য, শিথিলতা। রূপ-সৃষ্টি হল বড়ো কবি ও বড়ো সুরকারের লক্ষণ, রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন নিজের রচনা, দেখবে ভাবী কালের রসিকসমাজ এই আশা পোষণ করেছেন মনে।

ধূর্জটী মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের এ কথা ইতিপূর্বে এক-বার আমরা স্মরণ করেছিলাম 'মায়ার খেলা'র গীতিনাট্য (১২৯৫) থেকে নৃত্যনাট্যে (১৩৪৫) রূপান্তরের আলোচনায় আর আজও সে ক্ষেত্রেই পুনশ্চ এ উক্তির গূঢ়ার্থ গভীরতা ও সত্যতা যাচাই করতে বলি রসিককে। সঙ্গীতজ্ঞ না হওয়ায় আমাদের সে অধিকার নেই; যা অনুভব করি তারও কার্যকারণ খতিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমাদের সাধ্যাতীত। অধিকারী ব্যক্তি লক্ষ্য করবেন, 'মায়ার খেলা'র গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে সামগ্রিকভাবে কী প্রভেদ আর কী তফাত— 'ওই কে আমায় ফিরে ডাকে' (২৪) আর 'ডেকো না আমারে ডেকো না' (১৬২) গানে কিম্বা 'আমি কারেও বুঝি নে' (২৫) আর 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী' (১৬০) গানে কিম্বা 'সেই শান্তিভবন ভুবন' (২২) আর 'আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে' (১৬১) গানটিতে। 'দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে' (১৯)[৭] আর 'সাজাব তোমারে হে' (৩৫)[৮] গান দুটিতে প্রেম-প্রসাধনের কথা বলা হয়েছে; তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হয় রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের দুটি গানে— 'দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে' (১৩৯) ও 'তোমায় সাজাব যতনে' (১২৫)— বাণী আর রাগরূপ -রচনা উভয়তই কী প্রভেদ। মোহমুগ্ধতা হয়তো বেশি পূর্বের সঙ্গীতরীতিতে, কান্তকোমল রুচি ভাবলাবণ্য। কিন্তু রস-রূপের তথা রাগরূপের বিস্ময় পরিমিতি আর পরিপূর্ণতা পরের গানে,

সুতরাং রসিকজনের যার-পর-নেই পরিতৃপ্তি।

রচনার কাল-নির্ণয়ে ইতিপূর্বে যেমন আমরা বহু তথ্য আহরণ করেছি মজুমদার-পাণ্ডুলিপি থেকে তেমনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের আর তিনখানি পাণ্ডুলিপিও আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য। সময়সীমার তেমন ব্যাপ্তি না থাকলেও আছে গভীরতা ও গুরুত্ব। তন্মধ্যে একটি পূরবীর 'পথিক' অংশের প্রায় সমকালীন, অর্থাৎ তার পূর্বাপর সময়ে কিছুটা প্রসারিত। এটি রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যান শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁর বিশেষ স্নেহপাত্রী খুটুকে অর্থাৎ শ্রীমতী রমা মজুমদারকেই, শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে বরণ ক'রে পরে যিনি গোত্রান্তর লাভ করেন। এই রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির সমুদয় পৃষ্ঠার কেবল আলোকচিত্র দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি— এ'কে বলব কর-পাণ্ডুলিপি। আর দুটি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনেই প্রথমাবধি রয়েছে, রথীন্দ্রনাথের দান— অভিজ্ঞানসংখ্যা ১৫৯ ও ১৯১। রবীন্দ্রনাথের আয়ু যখন ৭৮।৭৯ স্পর্শ করেছে (মনশ্চক্ষে দেখা গেলে সে কী বিস্ময়), রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা-রচনার সেই প্রায় শেষ পর্বের এরা সাক্ষী— রসিকচিত্তে নিবিড় গভীর এই গানের আবেদন, কানে প্রাণে আস্বাদন করবার ও অনুভব করবার অপ্রত্যাশিত শিহরণ— আমাদের অনুমান এই যে, এদের তুল্যতা নেই কবির অতীত জীবনের আর-কোনো পর্বের অন্য কোনো গানে।

রবীন্দ্রপ্রতিভানির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ থেকে তার অনুসরণ ক'রে বা তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ক্রমশ আমরা এমন জায়গায় এসে পড়ি যেখানে প্রবাহের বেগ, প্রবাহবক্ষের তরঙ্গভঙ্গ, দুই কূলের শোভাসম্পদ, সবই বিস্ময়কর ও বিচিত্র। কোন্‌টি রেখে কোন্‌টির কথা বলা যাবে? কী বা বলা যায়! শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বা অন্য কেউ স্বচ্ছন্দে হয়তো বলবেন (প্রমাণ দিতে হবে না)— এটি (৭৪) পরলোকগতা মৃণালিনীদেবীর স্মরণে আর এটির (১৪৭) লক্ষ্য হলেন

শ্রীমতী বিজয়া বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। আমরা তা বলতে পারব না; বলতে চাইও না। কবে কে উৎকলীয় মালী বা মালিনী সোনালি সায়াহ্নে কবিকে সুতিক্ত নিমের শরবত দিতে এসে চৌকাঠ-গোড়ায় দ্বিধার ভাব দেখিয়েছিল, কৌতুক ক'রে কবি গেয়ে উঠেছিলেন কিম্বা ওঠেন নি 'হে মাধবী। দ্বিধা কেন', সেই ঘটনা ঘটনাভাস কিম্বা জল্পনা-কল্পনাকেই আমরা ঐ গানের হেতু বলা দূরের কথা উপলক্ষ্যও বলতে পারব না। উল্লেখ করেছি শিলাইদহে থাকতে 'পদ্মা' বোটে ঝড়বৃষ্টির রাত কেটেছিল অনিদ্রায়, দাঁড় ধরতে বা হাল সামলাতে যান নি, কী আর করা, তখনি লিখেছিলেন 'আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী' কবির এই সাক্ষ্য[৯]— জলে স্থলে, বোটে বা তন্নিকটে, অনুরক্ত প্রজা-বৃন্দ স্বজন পরিজন ব্যতীত আর-কেউ ছিল না। 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' (১১১) দেখা সুন্দরী— 'কল্পনা-করা' বলাই ভালো— তাঁরও নাম নেই আর রূপ ছড়িয়ে আছে দিক্ থেকে দিগন্তরে এবং কাল থেকে কালান্তরে। সেই সীমা-হারানো দেশ কাল থেকেই তিল-তিল চুনে চুনে মনে মনে নূতন এই তিলোত্তমার রচনা। কবি তুলি ধরে এঁকে দেখান নি যদিও, কেবল উল্লেখ করেই সুরের পুষ্পবৃষ্টি করেছেন তার উদ্দেশে, তার চার দিকে— আমাদের প্রত্যেকের সুযোগ আছে তাঁকে নূতন ক'রে ও নিজের মনের মতো ক'রে রচনা করবার। এ ক্ষেত্রেও কবির সাক্ষ্য হাজির করা যায় (বিচিত্রা / চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ৪৫৬-৫৭) ; তা ব'লে সেও কি সবাই মেনে নেবেন ?

কার প্রেম কার উদ্দেশে এ কথার কোনো জবাব নেই ; জবাব চাওয়াই অসংগত। রসোপলব্ধির সূচনা হয় না, সুরাহা হয় না, পূর্তি হওয়া তো দূরের কথা— বিশেষ কারো নাম ধাম ঠিকানা ও অন্যান্য বিবরণ জানলে। কবি কি বলেন নি তাকেই— 'দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা' ?...

তবু মনে পড়ে, স্বপ্নে শুনে চমকে উঠেছি একদিন—
'মুক্তির নৈবেদ্য গেহু রাখি রজনীর শুভ্রঅবসানে।'

চেনা কণ্ঠস্বর। চিনলেম কোন্ জন্মান্তরে জানি নে। হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমুদয় তাৎপর্য। মনে ভাবি, কবি কি এঁরই উদ্দেশে গেয়ে উঠেছেন আরেক-দিন—

মধুগন্ধে-ভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া
নীপকুঞ্জতলে
শ্যামকান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া
ফিরে বৃষ্টিজলে।
ফিরে রক্তঅলক্তক-ধৌত পায়ে
ধারাসিক্ত বায়ে,
মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা
সিঁথিপ্রান্তে জ্বলে।[১০]

কী অপূর্ব রূপ। লৌকিকই হয়ে উঠেছে অলৌকিক, রূপ হয়ে উঠেছে ভাব, বিশ্বপ্রকৃতিতে মিলিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে গিয়ে সব সীমা হারিয়েও হতে চায় নি বিশ্বাতীতা— আবার ফিরে সে এসেছে যখন কবির অন্তর্লোকে, ভাবই হয়েছে রূপ। যখন বলা হয়েছিল 'উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ / গলায় পলার হারখানি'[১১] তখন সেই শ্যামার রূপ দেখেও দেখা হয় নি, চেনা যায় নি, কেননা অলৌকিক সুরের শিখা তো জ্বলে ওঠে নি— দেখায় নি দিব্যরূপের সমগ্রতা। এখন দেখেছি, চিনেছি।

১৩৪৬ সনে কবির কাছে বর্ষামঙ্গলের জন্য, অনুরোধ বলি বা আবদারই বলি, এল তা অনুরক্ত ভক্ত ও গুণীজনের কাছ থেকে।[১২] সেই অনুরোধ উপরোধেই কি গান-রচনা হয়েছে একটার পর আরেকটা? নিছক ফর্মাশের সেই গান কি এমন হ'ত? তা নয়। বাইরে যে আগ্রহ আয়োজন উপলক্ষ্য ঘনিয়ে এসেছে তার ইঙ্গিতেই নয় তবু তার দিকে চেয়ে কবিচিত্ত উদ্গ্রথিত ক'রে এই গান জেগেছে জীবনের সমস্ত বিধাকৃত এক ক'রে। বিরহ-বিচ্ছেদের বিষই পরিণামে ভাবসম্মিলনের অমৃত হয়ে উঠেছে। অতলের উর্বশী আর অলোকপদ্মালয়া রমা,

অপ্সরী আর কল্যাণী, আবার[২৩] কি এক হয়ে যায় নি? সেই উপলব্ধির আনন্দবেদনাতেই অভূতপূর্ব এই গানগুলির সৃষ্টি (১৬৮-১৮৪)— পূর্বোক্ত বর্ষামঙ্গলের বা তার আগে-পরের বহু গান স্মরণ করেও এ কথাই বলব। মিলন না বিরহ বলা যায় না। নিবিড়তম গভীরতম প্রেমে, মিলনের মধ্যেও সর্বদাই নিগূঢ় বিরহব্যথা আছে আর চির-বাঞ্ছিতা ফিরে-আসা যে বিরহিণীর সঙ্গে ভাবসম্মিলন হল দিনশেষে, সত্যই—

বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গোপনমিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের গানে প্রেম অর্থাৎ মনোময়ী প্রেমপ্রতিমা আর প্রকৃতি মনে হয় অভিন্ন হয়ে উঠেছে— দেখা যায় তাকে দেখা যায় না, ধরা দিতে এসেও বুঝি ধরা দেয় না। তাই 'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে'। রূপে ও রসে, আকারে ও ভাবে, এমন একাকার হওয়া সব দেশের সব কালের কাব্যে বা গানে আর কোথায় আছে আমরা জানি নে। রবীন্দ্রকাব্যেও এতটা ছিল না পূর্বে আর কোনোদিন।

'ওগো তুমি পঞ্চদশী!' (১৮১) কার এ রূপ? গঙ্গাশীকরসিঞ্চিত জটাজূটে শেষ কলাটি হরণ ক'রেই রেখেছে-যে সন্ন্যাসী, তাই ষোলো কলায় পূর্ণ তো হয় নি, হতেও পারে না মর্ত্যলোকে— স্বপ্নের আভাস নিদ্রায়, নবযৌবনে কচিৎজাগরিত বিহঙ্গকাকলি, অরণ্যমর্মর থরথর বক্ষের স্পন্দনে। কে তা বলা যায় না। মায়াছায়া-ঘনায় যে দেখে তার মনের দিগন্তে আর আনতপক্ষ-দুটি ভিজে যায় যেন যে দেখা দিতে এসেছে তারও। 'ধূসরজীবনের গোধূলিতে' (১৭২) এ রূপ কবি বারবার দেখেছেন ম্লানায়মান ক্লান্ত আলোয়। সুরের কান্না তাঁর স্বপ্নের সঙ্গিনীর। তার বিরহিণী মূর্তিখানি দেখি সকরুণ নত নয়ানে 'বেহাগের তানে'— সে যে বিরহবেহাগ মূর্তিমতী।

যদি কবিতা হিসাবেই দেখি শেষোক্ত গান, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার মতোই প্রথাগত ছন্দের নিয়মবন্ধনের বাইরে এসে এ স্বচ্ছন্দ, এ গন্তই, রূপকল্পেরও কোনো বাঁধাবাঁধি নেই। রূপকল্প (imagery) ও কাব্য-ছন্দ খতিয়ে দেখলে যা দোষ বলে গণ্য হতে পারত, বিশেষ গুণ হয়ে উঠেছে সুরের প্রসাদে অর্থাৎ সুরেই সব অভাব অপূর্তি পূর্ণ করেছে এমন-কি উপচে দিয়েছে এই গানে বা এরূপ গানে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের এই প্রেমের গান—উপলক্ষ্য তার যাই হোক, শ্যামা, নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা, শেষ দিকের বর্ষামঙ্গল (১৩৪৬)— যে প্রেমের ভাষাতীত ভাষা, তা আমাদের সীমিত জীবনের অভিজ্ঞতায় বা ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ ধারণা করা যায় না। ধ্যান করতে হয় রবীন্দ্রজীবনের, যা চার পাঁচ বা ততোধিক খণ্ডের কোনো মহাগ্রন্থে পাওয়া যাবে না, যা বাইরের জীবনই নয়— বিশাল এক মহীরুহ মর্ত্যের মাটিতে অমর্ত্য অভীপ্সায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বেড়ে উঠেছে। তার প্রিয়া বা প্রিয়তমা শ্রেয় প্রেয় উভয়েরই প্রতিমা, জীবন-দেবতার প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ রূপ— কোনো নির্দিষ্ট নামে অথবা রূপে নির্ধারণ করা অসম্ভব। কবি নিজেই তা পারেন নি। কবি নিজেও তা চান নি।

সুরকে কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, নিরূপণ করা অসম্ভব। হার মেনে ক্ষান্ত হওযার আগে, শিল্পীগুরু শ্রীনন্দলাল বসুর কিছু কথা তুলে দিই এখানে। তিনি বলেছেন পরিণত বয়সের রবীন্দ্ররচনা সম্পর্কে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কেও, বাণীরূপ রাগরূপ দু-ই নিয়ে, তার উপযোগিতা আছে (২০ অক্টোবর ১৯৪১) —

'রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনায় অরূপ থেকে রূপ ফুটতে ফুটতে আবার অরূপে মিলিয়ে যাচ্ছে আর এই হল সেরা সৃষ্টির লক্ষণ। এমন এক উত্তুঙ্গ শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে যার এধারে রূপ ওধারে অরূপ গায়ে-গায়ে ডাইনে-বাঁয়ে। ...

'চীনা সেরা সৃষ্টির নিদর্শন, স্থল জল আকাশের ছবি, এই-রকম। ...'

'ভাস্কর্যে এরকম সৃষ্টির নিদর্শন— নটরাজ, বুদ্ধ। নটরাজ নিয়ে রোদ্যাঁ উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন: এই দেখছি নটরাজ মূর্তি ধরে নাচছেন. এই আবার সবের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন— আবার প্রকট হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছেন।'

'নটরাজ, আমি তব কবিশিষ্য', এ কথা মিথ্যা বলেন নি রবীন্দ্রনাথ।

৫ আশ্বিন ১৩৮৭

পুনশ্চ

রবীন্দ্রনাথের স্বয়ংভাষ্য থেকে তাঁর গানে ভাব ও রূপ এ দুটি মূল-তত্ত্বের রহস্য-আভাস আমরা পেয়েছি। সব কথা যেমন তিনিও বলেন নি, হয়তো আমরাও ভালো ক'রে ভেবে দেখি নি। পর পর স্মরণ করা যাক্ কয়েকটি দৃষ্টান্ত, বিচার করে দেখা যাক্ তটস্থ বুদ্ধিতে। রূপ অথবা ভাব যখন যেটিরই প্রাধান্য থাক্, অন্যটি অনুপস্থিত নয়।

[কেবল প্রেমের গানের দৃষ্টান্ত নয়। এক কাল-পর্বে আগামী অন্য কালের আগমনীও কদাচিৎ জেগে উঠেছে। আমাদের ধারণা 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১৪] কথা ও সুর দু দিক থেকেই বিচার হবে গানের। পরবর্তী আঠারোটি রচনার তালিকায় বিশেষ ক'রে কালক্রমে সাজানোর চেষ্টা নেই আর সূচনার দুটি কবিতাংশ মাত্র,— তন্মধ্যে প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের নয় কিন্তু দ্বিতীয়টি তাঁরই বাল্যলীলা।]

দৃষ্টান্ত

চোখে-দেখা 'রূপ' : ১ পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

ওঠো শিশু, মুখ ধোও, পরো নিজবেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

২ আমসত্ত্ব দুধে ফেলি
তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ,
চারি দিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

ভাব : ৩ কী হল আমার, বুঝিবা সজনী
৪ আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
৫ আমার পরান যাহা চায়
৬ এখনো তারে চোখে দেখি নি

রূপ : ৭ মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান
৮ কেন বাজাও কাঁকন কন-কন
৯ তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা
১০ কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
১১ ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না
১২ যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

'ভাব' ? সত্তা : ১৩ আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ (সাথর)
১৪ আমি তখন ছিলেম মগন গহন
১৫ বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে
১৬ আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ
১৭ শেষ গানেরই রেশ নিয়ে
১৮ যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে

'আর্ট' ব্যক্তিসত্তার গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হলেও, তার গতি বিশ্বের অভিমুখে। গভীরে যেমন তার বিশ্বসত্তার ও বিশ্বচেতনার সঙ্গে

যোগ থাকবার কথা, পরিণামেও সেটাই অবশ্যম্ভাবী। পরিপূর্ণতার অভিযাত্রী সেই বিশাল ব্যক্তিসত্তার ছাপ যখন পড়ে আর্টে, কবিতায়, গানে, সে আরেক পরম বিস্ময়। তখন স্মরণ করতে হয় কবি ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যানের মহাবাক্য : ***Who touches this, touches a MAN***। তখন ভাব ও রূপের দ্বৈত পার হয়ে উত্তীর্ণ হন স্রষ্টা এবং রসিক যে সত্তায় তার ব্যাপকতা, গভীরতা, অবিশ্লেষণীয় রসাস্বাদ ও চমৎকারিতা বহুগুণে অধিক বা অনিঃশেষই বলা যায়। ফলতঃ এক দিক থেকে দেখলে ভাব বলতে হয়, আরেক দিক থেকে রূপ, আর সামগ্রিক ভাবে দেখলে স্রষ্টার পূর্ণ ব্যক্তিসত্তারই আশ্চর্য এক অভিব্যক্তি। এখানেই আর্টের শেষ সীমা। ভাবব্যক্তি বা রূপরচনার যে স্তর একবার ছেড়ে আসেন রসরূপের কোনো সিদ্ধ সাধক, ঠিক সেখানেই আর কোনো-দিন ফেরেন না। কেননা, সচেতন মানুষ মাত্রেরই জীবনের পথ কম্বু-রেখায়িত। এক সানু থেকে আরেক সানু অভিমুখে তার ক্রমিক উত্তরণ। ব্যক্তি ও বিশ্ব, ভাব ও রূপ, এমন-কি রূপ ও অরূপ এবংবিধ দ্বৈতের ভিন্নতা ও একাত্মতার নিরন্তর লুকোচুরির লীলা-বিলাসে গতি সততই ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর ভূমিতে— শেষ কোথায় ও কেমন তা বলা যায় না। এ লীলায় আপাতবিরতি যদি বা থাকে, সত্যই শেষ হল যে তা নয়।

যা হোক, তত্ত্বআলোচনায় সুখ নেই, ফললাভও সন্দেহস্থল। উপস্থাপিত দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা ভালো। —

১ হৃদয়ভাবের কোনো অপব্যয়ই ঘটে নি তা স্পষ্ট।

২ রূপদর্শনের অভিনিবেশে ও সুখেই ভাব আত্মগোপন করে আছে।

৩-৬ ভাবমাধুর্য (বাচনসৌন্দর্য) কেবল কবিকে নয়, সমকালীন যে-কোনো রসিক ব্যক্তিকে মোহিত চমৎকৃত করেছিল সন্দেহ নেই। বাংলার সঙ্গীতসাহিত্যে অপ্রত্যাশিত নূতন— একই কালে কথায় ও সুরে।

৭-১২ ভাব ঘনীভূত হয়ে উঠেছে রূপে। পেয়েছে স্ফটিকের মতো সংহতি। অনায়াসে তাই 'দ্যুতি' বিকিরণ করছে।

১৩-১৮ পুনশ্চ ভাব ও আবেগ প্রবল হয়ে উঠলেও, এ ভাব সে ভাব নয়— এ যেন বিশ্বব্যাপী। এতে যে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ তাকে ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। যেন ধারণা করাও যায় না অথচ পরম সত্য ব'লেই অনুভব করতে হয়। 'দেখা না-দেখায় মেশা' বিদ্যুতের মতো এর লীলা কথায় ও সুরে, রূপে ও অরূপে। কোনো সংজ্ঞার্থে নিরূপণ করা ও নির্দেশ করা কঠিন।

উত্তরটীকা

১ অবশ্য, এ কথা বলা যায়: কবি আখর-যুক্ত কোনো গানই ভোলেন নি অথচ কাউকেই স্থান দেন নি 'তাঁর' গীতবিতানে যে কারণে সে হল— গীতবিতানের কাব্যরূপকে মুখ্য ক'রে তার সঙ্গীতরূপকে গৌণ ব'লে গণনা করেছেন। নইলে এমনও হবে কেন, যে গানের 'সাখর' রূপেরই স্বরলিপি আছে, অন্যটির নেই— কেউ গাইতে জানে অথবা জানবে এমন বলা যায় না— যেমন 'ওহে জীবনবল্লভ' বা 'তোমার আনন্দ ওই'— সেটিকেও সম্পাদনা-কালে বর্জন করেছেন কবি! বিশেষ মমত্ববোধ-বশতই বিচারে ভুল হয়েছে সন্দেহ নেই। কবি কি জানতেন না বা অনুমান করতে পারেন নি কালে তাঁর গানের আদরই তাঁর কবিতার সমাদরকেও ছাড়িয়ে যাবে? গ্রন্থে যে ভাবেই সাজিয়ে দেওয়া হোক-না, কাব্যিক ছন্দোবন্ধে ও রূপরেখায় উনিশ-বিশ যাই হোক, থাক্-না আপাতপ্রতীয়মান 'ত্রুটিবিচ্যুতি', সে গান কথা কয়ে উঠবে— না, গুন্‌গুন্ স্বরে গেয়েই উঠবে গীতবিতানের পাতা খোলা মাত্র। কেননা, বাংলার রসিকচিত্তের আকাশ-বাতাস ছেয়ে যাবে ততদিনে

রবীন্দ্রনাথের গানে গানে, সুরে কথায়, এ তো বাস্তব সত্যই—অমূলক জল্পনা-কল্পনা নয়।

গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি বা প্রবাহিণীতে আছে বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যরূপ (বাণীরচনা তদুপযোগী); এরকম আরো হতে পারে, হওয়া উচিত কিন্তু গীতবিতানে বেশির ভাগ মানুষ খুঁজবে গীতরূপ আর সেটাই সংগত।

২ জনসাধারণ কেনবার সুযোগ পায় নি।

৩ এরূপ 'গীতসংখ্যা সর্বত্রই পরবর্তী তালিকাঅনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা।

৪ কেবল কবি হিসাবে নয়, সঙ্গীতস্রষ্টা সুরকার-রূপে বোধ করি ঐ সময়ে ঐ স্থলে তাঁর প্রথম আত্মআবিষ্কার। এরূপ প্রথম গান : নীরব রজনী ছাখো মগ্ন জোছনায় / দ্রষ্টব্য প্রচল গীতবিতান-ধৃত পাঠ ও গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত তথ্যাদি। 'গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে' আগের কবিতা হলেও, গান হিসাবে পরবর্তী।

৫ শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত। পাণ্ডুলিপির পাতাগুলির আলোকচিত্র দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি। আমার রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৬৮) 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' প্রবন্ধে (পৃ ২৫৮-৮১) এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৬ অবশ্যই আমাদের মনে পড়বে বিচিত্রিতা কাব্যের উৎসর্গ-বচন : 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী' নন্দলাল আর 'সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা' রবীন্দ্রনাথ —এ যে অক্ষরে অক্ষরেই সত্য।

৭ এ গান সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপিগীতিমালা (১৩০৪) থেকেই জানি, সুর-রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ('গ্র') এবং কথা—রবীন্দ্রনাথের ('শ্রীর')। অথচ মায়ার খেলার এই গানের 'বাণী' রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তথা ঠাকুর-পরিবারের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী এমন একটা গুজব বহুদিন চলে আসছিল মনে হয়, যাকে 'স্থায়িত্ব' দিতে চেয়েছেন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -হেন

ধীমান ব্যক্তি তাঁর সাহিত্য-সাধক-রচিত-মালায় (স° ৭৬। পৃ ১২), প্রমাণ দেন নি, অন্তত আমাদের চোখে পড়ে নি। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র-জীবনী-কার নির্বিচারে এই অমূলক তথ্য আবার তাঁর গীতবিতান-সূচীতে গ্রহণ করাতেই এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলা দরকার। (ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বলেছি প্রচলিত গীতবিতানে তৃতীয় খণ্ডের শেষে গ্রন্থপরিচয়ে।) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটকে (১২৮৮) পাই এই গানটি—

দে লো সখি, দে পরাইয়ে চুলে সাধের বকুল ফুলহার।
আধফুটো জুঁইগুলি যতনে আনিয়ে তুলি
দে লো দে লো ফুলময় সাজে সাজায়ে আমারে, সখি, আজ।
ওই লো ওই লো দিন যায় যায় লো, এখনি আসিবে প্রাণনাথ!
যা লো সহচরি, এইবেলা ত্বরা করি—এখনি আসিবে প্রাণনাথ।
এই তো যামিনী এল, সে তবু এল না কেন?
বুঝিবা সে দুখিনীরে আজি ভুলে গেল, বুঝিবা সে এল না রে।
সখি, তোরা দেখে আয়। দেখে আয়।
না লো সখি, না, ওই দেখ্ দেখ্ লো ওই যে আসিছে প্রাণনাথ॥

এই গানই কি মায়ার খেলায় আছে?। গানের সূচনায় পাঁচটি পদক্ষেপ গুনে গুনে সানন্দে মাথা নেড়ে সায় দেবে মন কিন্তু অব্যবহিত পরের পদটিতেই হুঁচোট খেয়ে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ না পেলে নাক কান মলে বলতেই হবে: 'না, না, রবীন্দ্রনাথ কোনো বয়সে কোনো দিনই এ গান লিখতে পারেন না। অক্ষয় চৌধুরীর হোক কিম্বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, তাতে তো আপত্তি করি নে।' এ গান আর মায়ার খেলার গান অভিন্ন এ কথা কে বলল? দুটি গানের কথা পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখেছেন কেউ? সম্ভবতঃ ব্রজেন্দ্র-বাবু ও শ্রদ্ধেয় প্রভাতদা দেখেন নি অথবা দেখলেও বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অক্ষয় চৌধুরী অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (এই অভিমত আমাদের 'বিবিদিদি' ইন্দিরা-

দেবী চৌধুরানীর) এ গান যদি বা তরুণ রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার প্রস্থানভূমি হয়, তিনি উড্ডীন হয়েছেন ভাব ও কল্পনার বর্ণবিচিত্র যে ঊর্ধ্বলোকে সেখানে যেতে পারেন নি উল্লিখিত বাণীর রচয়িতা। ফলতঃ 'স্বপ্নময়ী'তে ও 'মায়ার খেলা'র এক গানই আছে এ কথা সত্য নয়। আগের গান থেকে যেটুকু নিয়েছেন পরের গানের স্রষ্টা তা আক্ষরিক মাত্র— যথার্থ ঋণ নয়, প্রভাব তো নয়ই। 'ভাব বাৎলানো'র প্রবণতা ছিল রবীন্দ্রনাথের সেকালের গানে এ কথা সত্য হলেও, তার একটা সীমা ছিল সেটাও সত্য। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে উল্লিখিত গানে, যুগপৎ কথায় এবং হয়তো (?) সুরেও, ভাব বাৎলানোর কোনো সীমা পরিসীমা তো দেখি নে।

বাহুল্য হলেও বলা আবশ্যক, স্বরলিপি-গীতিমালায় স্বরলিপি-কৃত গানটি 'মায়ার খেলা'রই, 'স্বপ্নময়ী'র নয়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গানে অন্য প্রভাবের কথা তুলেছেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-কথা' গ্রন্থে (১৩৪৮। পৃ ২০৪-২০৫)। বস্তুতঃ 'প্রভাবিত হওয়া'ই নয়, অন্যের রচনা আত্মসাৎ করাও বলা চলত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকলে। আলোচ্য গানটি হল 'রাজা ও রানী' নাটকের : বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে (কাঠুরিয়ার গান)। এর তুলনাস্থল গানটি পাওয়া গেল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১২ সনের প্রথম সংখ্যায়। আমরা সেটি যথাযথ উদ্‌ধৃত ক'রে দেখতে পারি : 'বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে', / চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে। / 'বনফুলের মালা দেবো তোর গলে'॥ / 'সিংহাসনে বসাইতে দিব এই হৃদয় পেতে'··· / পিরীতি মরম মধু দিব তোরে খেতে ; ··· / বিচ্ছেদেরে বেন্ধে এনে ফেলব পায়ের তলে। / মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেওয়ার ডালে।* ইত্যাদি। খগেন বাবু যথাযথ পাঠসংকলন করেছেন তা বলা যায় না। যা হোক,

পূর্বোক্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃ ৬৫) ঐ গান এসেছে শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য -লিখিত 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা'র অংশ-রূপে। যে 'মধুমালা' উপাখ্যানে এর স্থান সেটি লেখক শোনেন কোনো গ্রামে ডাক্তারি করতে গিয়ে (দ্রষ্টব্য পৃ ৫৫); কোন্ গ্রামে কোন্ সালে তা বলা হয় নি। ১৩১২ সনের ২।৪ বছর পূর্বেও হতে পারে এবং সে গ্রাম কোলকাতা শহরের কাছাকাছি কোথাও নয় তাই বা কে বলবে? সেই সময় সেখানে 'রাজা ও রানী' নাটকের গান পৌঁছে কোনো গ্রামবাসী কবিকে প্রভাবিত করতে পারে না কি? সবিশেষ তথ্য না জানলে 'হাঁ' অথবা 'না' কোনো মতামত দেওয়া তো চলে না। উদ্‌ধৃতিচিহ্নযুক্ত প্রথম ছত্রে মিল সুসম্পূর্ণ; চিহ্নিত আর-দুটি ছত্রে 'মধুমালা' ও 'রাজা ও রানী' একটি আরেকটির হুবহু নকল না হলেও সাদৃশ্য যথেষ্ট। গ্রামের কবির রচনায় 'ভাব বাৎলানো'র আধিক্য আছে, বাঁধুনি অল্প, সে কিছু আশ্চর্য নয়। জেনে বা না জেনে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন গ্রামের কবির কাছ থেকে, তার উল্টোটাই যে যথার্থ ঘটনা নয়, নিশ্চিত-ভাবে কী ক'রে বলা যাবে? পক্ষান্তরে খগেন্দ্রনাথ নিধুবাবুর একটি গানের যেটুকু তুলেছেন তাঁর গ্রন্থে (পৃ ২০৫), 'নয়ন-জলে স্নান করাব / কেশেতে মুছাব চরণ', তার দ্বারা প্রভাবিত হন নি বা হতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ এ কথা অবশ্যই বলব না। কেননা, বাংলার অথবা কোলকাতার শিক্ষিতসমাজে রামনিধি গুপ্তের

---

* 'বঁধু, তোমায় করব রাজা ব'সে তরুতলে।' —এরূপ সূচনায় "অজ্ঞাত" কবির এই গানই সংকলিত আছে শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত (ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ। ১৯৩৪। পৃ ১০৮) বঙ্গবীণা গ্রন্থে। সে গ্রন্থে এ গান সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য না থাকায়, জ্ঞানের পরিধি আমাদের বাড়ে না; অত্র কোনো মন্তব্যের কোনো পরিবর্তনও আবশ্যক হয় না।

(নিধুবাবুর) প্রভাব কি সেদিন সর্বব্যাপী ছিল না? বাঙালি-চিত্তের একটা দিকের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর গানে। তাতে ছিল সকল বাঙালির উত্তরাধিকার।

৮ কবি এ গানের সুরকার নন। হিন্দিভাঙা ব'লেই জানা যায়। তবু আমাদের তালিকায় ধরে আলোচনা করেছি বা করতে পারি, তার কারণ আছে। কথা তো রবীন্দ্রনাথের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুর-রচনা আর জ্যোতিরিন্দ্রের অথবা রবীন্দ্রেরই হিন্দিভাঙা। এর সঙ্গে উত্তরকালে কবির স্বকীয় সৃষ্টি যা, তার মিল বা অমিল কতটা সে আমাদের দেখা উচিত।

৯ রবীন্দ্রবিশারদ বা রবীন্দ্রগবেষক ব্যক্তি খুঁজে পাবেন আশা করা যায়। এ বিষয়ে কবির উক্তি কোথায় 'দেখেছি' বা পেয়েছি, আপাতত আমাদের মনে নেই। তবে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ -প্রণীত 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে এটুকু তো বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : সংস্করণ ১৩৮৬ পৌষ। পৃ ২০৯) : 'শিলাইদহের নদীপথে বাসকালে রচিত। সঙ্গে সহযাত্রী বলেন্দ্রনাথ। ··· ঝড়বৃষ্টিতে তাঁদের রাত কাটাতে হয়েছিল। পরদিন সকালে ··· এই গানটি গুরুদেব লিখেছিলেন।'

১০ রূপে ও অরূপে লুকোচুরি করাই যে-কবিপ্রিয়ার চিরদিনের লীলা, এ গানে ক্ষণতরে তাঁর প্রত্যক্ষতা আমাদের চমৎকৃত করে। তবু এটি প্রেমের গান নাই বা বলা গেল। কেবল এটুকুই আরেকবার জানলেম, প্রেমের ও প্রকৃতির উপলব্ধি আর উৎসব কবিচেতনায় অবিচ্ছিন্ন; তাদের নিরন্তর মেশামিশি নিয়েই তাঁর গানের কথা ও সুর।

১১ শ্যামা (আকাশপ্রদীপ) : ৩১ অক্টোবর ১৯৩৮। ১৪ কার্তিক ১৩৪৫

১২ দ্রষ্টব্য : কবিকথা (সুধীরচন্দ্র কর / পৌষ ১৩৫৮) পৃ ১৭৭-৮১

১৩ স্মরণীয় : রাত্রে ও প্রভাতে (চিত্রা)। এক দেহে শুধু নয়, বুঝি একই কালে। বলাকার 'দুই নারী' (সং ২৩) কবিতায় ভিন্নরূপ।

১৪ একবিংশ স্বরবিতানে (১৩৭৯) এ গান সম্পর্কে তথ্যসংকলন ত্রুটি-

পূর্ণ ও অপ্রচুর। স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ ফাল্গুনে নয়, চৈত্রে প্রচারিত। স্বরলিপিকার 'সমরেশ চৌধুরী' হলেও আখ্যাপত্র-উত্তর 'ব্যাখ্যাপত্রে' তাঁর নাম তো দিতে হয় নি। কেননা, এই অবিস্মরণীয় গানের সুর যে হারায় নি এজন্য ঋণী আমরা প্রাতঃ-স্মরণীয়া ইন্দিরাদেবীর কাছে। না হলে এ গানটি, অন্তত অর্ধ-শতাব্দের বিস্মৃতিযবনিকা সরিয়ে, কে আমাদের গোচরে এনে দিত? 'একটি গান পাওয়া গেল না' এটুকু বললেই এ ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ কতটা তার কোনো পরিমাপ হ'ত না।

প্রেমের গানের সংক্ষিপ্ত তালিকা

॥ প্রাক্‌কথন ॥

সংক্ষিপ্ত তালিকায় প্রত্যেক গানের উল্লেখ-পংক্তিতে প্রথমেই আধার-স্বরূপ পত্র-পত্রিকা গ্রন্থ বা রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির নির্দেশ, পরে বর্তমান তালিকা অনুযায়ী গানের ক্রমিক সংখ্যা ও সূচনাংশ, অতঃপর একটি দাঁড়ির পরে অথবা বন্ধনী-মধ্যে উল্লিখিত গানের রচনাকাল আর সুরারোপ পরবর্তী হলে সেই সুর-রচনারই কাল।

আধার-গ্রন্থাদির নাম কদাচিৎ সংক্ষেপে দিলেও সহজেই বোঝা যাবে। আধার-গ্রন্থাদির পাঠ বর্জিত অর্থাৎ বহুশঃ পরিবর্তিত হয়ে থাকলে, বন্ধনী-মধ্যে গ্রন্থের উল্লেখ। যে আধার-গ্রন্থে বা যে সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে গানটি প্রথম আমাদের গোচরীভূত, প্রধানতঃ তার উল্লেখ এই সূচীপত্রে— পুরোগামী প্রবন্ধে বিশেষ কারণে ভিন্ন আকরগ্রন্থাদির উল্লেখ থাকতে পারে। গানের পত্র-পত্রিকায় প্রচার বা গ্রন্থে প্রকাশ মাত্র জানা থাকলে, রচনাকালের বিকল্পে তারই উল্লেখ বন্ধনীমধ্যে— রচনাকাল পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় বা অন্য কোনো সূত্রে অনুমানসাধ্য হলে বন্ধনীর প্রয়োগ কেবল সূচনায়। সংগৃহীত তথ্যে সংশয়ের অবকাশ থাকলে, অপিচ প্রশ্নচিহ্ন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -সংকলিত দু-খণ্ড 'গীতবিতান / কালানুক্রমিক সূচী'তে (১৩৮০ ও ১৩৮৫) যে কালক্রম, সর্বত্র তা মেনে নেওয়া যায় নি। গানের ক্ষেত্রে বাণী-রচনায় যে গুরুত্ব তিনি দেন, সম্ভবতঃ সুর-রচনায় তা দেন নি। আমাদের বিবেচনায় অপ্রাসঙ্গিক, অতএব অনাবশ্যক, এমন মন্তব্যও তিনি করেন তাঁর মূল্যবান গীতবিতান-সূচীর প্রথম খণ্ডে (সূচনার পূর্বে পৃ (১১)) : 'রবীন্দ্রনাথের বহু গীতধর্মী কবিতা এখনও রয়েছে [অন্তত আরো হাজার-পৃষ্ঠা-পরিমিত নয় কি ?], যেগুলি সুরতালাদি সংযোগে গীতরূপ পাবার অপেক্ষায় আছে।' এ ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন এই : কে সুর দেবে আর দিলেই

কি রসিক তা মেনে নেবেন— উপভোগ করতে পারবেন— রবীন্দ্রসঙ্গীত ব'লে? তেমন প্রতিভার উদয় অস্ত বা শতাব্দশেষেই যদি হয়, সুর যেমন বাণীও তেমনি নিজেই রচনা করবেন। সেই মহৎপ্রতিভার পথ-নির্দেশ আমাদের করতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'গানে' অর্থাৎ গানের কথায় অন্যের সুরারোপ বা তার অশুভ সম্ভাবনা নিয়ে আরো অনেক কথা বলবার থাকলেও, এ তার স্থান নয়।

বর্তমান তালিকা-অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা ধ'রে ধ'রে যথাক্রমে কোনো কোনো তথ্য পরে উপস্থিত করা চলবে।

প্রথমেই বলা উচিত— মোটের উপর, আমাদের তালিকা-ধৃত ১-৬৬-সংখ্যক গানের সম্পর্কে বহু তথ্য মিলবে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-সংকলিত 'গীতবিতান / কালানুক্রমিক সূচী'র প্রথম খণ্ডে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০) আর অবশিষ্ট গান সম্পর্কেও বহু তথ্য ঐ গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ডে (বৈশাখ ১৩৮৫)।

॥ তালিকা ॥

আধার	সং	সূচনা	কাল [রচনা / প্রচার]
ভানুসিংহ	১	গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে	[অগ্র. ১২৮৪]
ঐ	২	শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা	[আশ্বিন ১২৮৪]
শৈশবসঙ্গীত	৩	বলি ও আমার গোলাপবালা	[প্রথমার্ধ ১২৮৫
ভগ্নহৃদয়	৪	কী হল আমার, বুঝিবা সজনী	[১২৮৭ ?
ভানুসিংহ	৫	মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান	[শ্রাবণ ১২৮৮]
ভারতী	৬	আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল	[ভাদ্র ১২৯০
প্রকৃতির প্রতিশোধ	৭	মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে	[বৈশাখ ১২৯১]
ভারতী	৮	আমি নিশিনিশি কত	[আশ্বিন ১২৯৩]
কড়ি ও কোমল	৯	ওগো, শোনো কে বাজায়	[১২৯৩]
ঐ	১০	হেলাফেলা সারাবেলা	[ঐ]

কড়ি ও কোমল	১১	তুমি কোন্ কাননের ফুল	[১২৯৩]
ঐ	১২	ওগো, কে যায় বাঁশরি বাজায়ে	[ঐ]
[ঐ]	১৩	ধরা দিয়েছি গো আমি	[১২৯৩ ?
ঐ	১৪	বিদায় করেছ যারে নয়নজলে	[১২৯৩]
মানসী	১৫	আবার মোরে পাগল ক'রে	[আষাঢ় ১২৯৪ ?
[মানসী]	১৬	তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই	[অগ্র. ১২৯৪ ?
মায়ার খেলা	১৭	পথহারা তুমি পথিক যেন গো	[পৌষ ১২৯৫]
ঐ	১৮	আমার পরান যাহা চায়	[ঐ]
ঐ	১৯	দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে	[ঐ]
ঐ	২০	সখী, বহে গেল বেলা	[ঐ]
ঐ	২১	ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও	[ঐ]
ঐ	২২	সেই শান্তিভবন ভুবন	[ঐ]
ঐ	২৩	অলি বার বার ফিরে যায়	[ঐ]
ঐ	২৪	ঐ কে আমায় ফিরে ডাকে	[ঐ]
ঐ	২৫	আমি কারেও বুঝি নে, শুধু	[ঐ]
ঐ	২৬	দিবসরজনী আমি যেন কার	[ঐ]
ঐ	২৭	আহা, আজি এ বসন্তে	[ঐ]
মানসী	২৮	এমন দিনে তারে বলা যায়	৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬
সাধনা	২৯	শুধু যাওয়া-আসা, শুধু	[বৈশাখ ১২৯৯]
ঐ	৩০	কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে	[ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯]
ভারতী	৩১	আমার পরান লয়ে	[আশ্বিন ১২৯৯
'মজুমদার'	৩২	আমার মন মানে না	[কার্তিক-অগ্র. ১২৯৯
গানের বহি	৩৩	সখী, আমারি দুয়ারে	[১৩০০]
ঐ	৩৪	এখনো তারে চোখে দেখি নি	[ঐ]
ঐ	৩৫	সাজাব তোমারে হে	[ঐ]
[সোনার তরী]	৩৬	যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ	[ঐ]

[সোনার তরী]	৩৭	আজি যে রজনী যায়	১৬ আষাঢ় ১৩০০
কাব্যগ্রন্থাবলী	৩৮	বড়ো বেদনার মতো বেজেছ	২৭ আষাঢ় ১৩০০
ঐ	৩৯	হৃদয়ের এ কূল ও কূল	[১৩০০ ?
ঐ	৪০	বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি	১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
ঐ	৪১	কত কথা তারে ছিল বলিতে	১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
সাধনা	৪২	এসো, এসো, ফিরে এসো	[ভাদ্র ১৩০১
'মজুমদার'	৪৩	ওলো সই, ওলো সই	৫ আশ্বিন ১৩০২
ঐ	৪৪	কে দিল আবার আঘাত	১২ আশ্বিন ১৩০২
ঐ	৪৫	আহা, জাগি পোহালো	১৫ আশ্বিন ১৩০২
ঐ	৪৬	তোমার গোপন কথাটি সখী	১৮ আশ্বিন ১৩০২
ঐ	৪৭	তুমি রবে নীরবে	১৮ কার্তিক ১৩০২
ঐ	৪৮	সে আসে ধীরে	২১ কার্তিক ১৩০২
ঐ	৪৯	তুমি যেয়ো না এখনি	২৪ কার্তিক ১৩০২
বীণাবাদিনী	৫০	মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে	[শ্রাবণ ১৩০৪]
'মজুমদার'	৫১	কেন ধ'রে রাখা, ও যে	[ভাদ্র ১৩০৪
ঐ	৫২	কেন বাজাও কাঁকন	[ভাদ্র ১৩০৪ ?
ঐ	৫৩	কেন যামিনী না যেতে	৭ আশ্বিন ১৩০৪
ঐ	৫৪	ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে	৮ আশ্বিন ১৩০৪
ঐ	৫৫	তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা	৯ আশ্বিন ১৩০৪
ঐ	৫৬	আমি চাহিতে এসেছি	১০ আশ্বিন ১৩০৪
ঐ	৫৭	সখী, প্রতিদিন হায়	১০ আশ্বিন ১৩০৪
ঐ	৫৮	বিধি ডাগর আঁখি যদি	১০ আশ্বিন ১৩০৪
ঐ	৫৯	ওগো কাঙাল, আমারে	১২ আশ্বিন ১৩০৪
ঐ	৬০	একি সত্য সকলি সত্য	১৩ আশ্বিন ১৩০৪
বীণাবাদিনী	৬১	তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া	[১৩০৪]
ভারতী	৬২	নিশি না পোহাতে	[মাঘ ১৩০৭]
ঐ	৬৩	অলকে কুসুম না দিয়ো	[জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

প্রায়শ্চিত্ত	৬৪	ও যে মানে না মানা	[বৈশাখ ১৩১৬]
অচলায়তন	৬৫	উতলধারা বাদল ঝরে	প্রাক্-১৫ আষাঢ় ১৩১৮
গীতিমাল্য	৬৬	ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো	২৮ চৈত্র ১৩১৮
শোধ-বোধ	৬৭	বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা	১৩ পৌষ ১৩২১ ['৩২]
ফাল্গুনী	৬৮	তোমায় নতুন ক'রে পাব	২০ ফাল্গুন ১৩২১
গীতপঞ্চাশিকা	৬৯	ছিল যে পরানের অন্ধকারে	[১৩২৫]
[খেয়া]	৭০	আমার গোধূলিলগন	[প্রাক্-১৩২৬]
[মানসী]	৭১	কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া	[১৩২৬]
কাব্যগীতি	৭২	আমার দিন ফুরালো	[১৩২৬]
ভারতী	৭৩	তার বিদায়বেলার মালাখানি	১০ ফাল্গুন ১৩২৮
নবগীতিকা-২	৭৪	অনেক কথা বলেছিলেম	২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
শান্তিনিকেতন	৭৫	তোমায় গান শোনাব তাই তো	২৯ ফাল্গুন ১৩২৯
অয়ন	৭৬	আজি মর্মরধ্বনি কেন	[বৈশাখ ১৩৩০]
শান্তিনিকেতন	৭৭	যুগে যুগে বুঝি আমায়	[শ্রাবণ ১৩৩০
প্রাচী	৭৮	যখন এসেছিলে অন্ধকারে	১৬ পৌষ ১৩৩০
কর-পাণ্ডুলিপি	৭৯	আমার ভুবন তো আজ হল	৬ ফাল্গুন ১৩৩০
ঐ	৮০	দিনশেষের রাঙা মুকুল	[ফাল্গুন ১৩৩০
শান্তিনিকেতন	৮১	যখন ভাঙল মিলন-মেলা	[বৈশাখ ১৩৩১
প্রবাসী	৮২	ও চাঁদ চোখের জলের লাগল	আশ্বিন ১৩৩১
ঐ	৮৩	ভালোবাসি ভালোবাসি	[ঐ
কর-পাণ্ডুলিপি	৮৪	না বলে যায় পাছে সে	[ফাল্গুন-চৈত্র '৩১]
ঐ	৮৫	ও আমার ধ্যানেরই ধন	[ঐ]
ঐ	৮৬	এবার উজাড় ক'রে লও হে	১ বৈশাখ ১৩৩২
ঐ	৮৭	অবেলায় যদি এসেছ আমার	[আষাঢ় ১৩৩২
ঐ	৮৮	যেতে দাও গেল যারা	[ঐ

কর-পাণ্ডুলিপি	৮৯	গহন রাতে শ্রাবণধারা	[আষাঢ় ১৩৩২
ঐ	৯০	সখী, আঁধারে একেলা ঘরে	[শ্রাবণ ১৩৩২
ঐ	৯১	বাজো রে বাঁশরি বাজো	[ঐ
ঐ	৯২	সে আমার গোপন কথা	[ঐ
ঐ	৯৩	যৌবনসরসীনীরে	[ঐ
ঐ	৯৪	বন্ধু, রহো রহো সাথে	[ভাদ্র ? ১৩৩২
ঐ	৯৫	হে ক্ষণিকের অতিথি	[ঐ
ঐ	৯৬	আপনহারা মাতোয়ারা	[ফাল্গুন ১৩৩২
ঐ	৯৭	এসো আমার ঘরে	[ঐ
বৈকালী	৯৮	চপল তব নবীন আঁখি-দুটি	১২ চৈত্র ১৩৩২
ঐ	৯৯	নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি	[চৈত্র ১৩৩২
ঐ	১০০	বিনা সাজে সাজি	১৯ চৈত্র ১৩৩২
ঐ	১০১	সেই ভালো সেই ভালো	[চৈত্র ১৩৩২
ঐ	১০২	কার চোখের চাওয়ার	২৩ ভাদ্র ১৩৩৩
নটরাজ	১০৩	মনে রবে কি না রবে	১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩
শেষরক্ষা	১০৪	যাবার বেলায় শেষ কথাটি	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৩৪
ঐ	১০৫	মুখপানে চেয়ে দেখি	আষাঢ় ১৩৩৪
রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি	১০৬	আরো একটু বোসো	২৫ শ্রাবণ ১৩৩৪
ঐ	১০৭	সকরুণ বেণু বাজায়ে কে	১৫ আশ্বিন ১৩৩৪
ঐ	১০৮	সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে	৩০ আশ্বিন ১৩৩৪
প্রবাসী	১০৯	এবার বুঝি ভোলার বেলা হল	৯ ফাল্গুন ১৩৩৬
বিচিত্রা	১১০	স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে	[চৈত্র ১৩৩৭ ?
ঐ	১১১	সুনীল সাগরের শ্যামল	[১৮ ফাল্গুন ১৩৩৬
নবীন	১১২	যখন মল্লিকাবনে প্রথম	[ফাল্গুন ১৩৩৭]
ঐ	১১৩	কখন্ দিলে পরায়ে	[ঐ]
[ক্ষণিকা]	১১৪	কৃষ্ণকলি আমি তারেই	[বর্ষামঙ্গল ১৩৩৮]
[বলাকা]	১১৫	তুমি কি কেবলই ছবি	[শাপমোচন
[পূরবী]	১১৬	আনমনা আনমনা	পৌষ ১৩৩৮]

চণ্ডালিকা	১১৭	ফুল বলে ধন্য আমি	
ঐ	১১৮	ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে	
ঐ	১১৯	না না না, ডাকব না	[ভাদ্র ১৩৪০]
ঐ	১২০	আমি তারেই জানি	
ঐ	১২১	পথের শেষ কোথায়	
তাসের দেশ	১২২	হে নিরুপমা	[ঐ]
ঐ	১২৩	হে নবীনা	
ভারতবর্ষ	১২৪	না চাহিলে যারে পাওয়া	[কার্তিক ১৩৪০]
শাপমোচন	১২৫	তোমায় সাজাব যতনে	[অগ্রহায়ণ ১৩৪০]
[মহুয়া]	১২৬	আজি এ নিরালা কুঞ্জে	
[ঐ]	১২৭	আরো কিছুখন নাহয়	[ফাল্গুন ১৩৪০]
[ঐ]	১২৮	আমার নয়ন তব নয়নের	
[ঐ]	১২৯	আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা	
[চার অধ্যায়]	১৩০	প্রহরশেষের আলোয় রাঙা	১৬ শ্রাবণ ১৩৪১
শাপমোচন	১৩১	বারতা পেয়েছি মনে মনে	৩১ ভাদ্র ১৩৪১
ঐ	১৩২	দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে	৪ আশ্বিন ১৩৪১
ঐ	১৩৩	মায়াবনবিহারিণী হরিণী	১২ আশ্বিন ১৩৪১
ঐ	১৩৪	কাছে থেকে দূর রচিল	১৩ আশ্বিন ১৩৪১
শ্রাবণগাথা	১৩৫	মম মনউপবনে চলে	[শ্রাবণ ১৩৪১]
বীথিকা	১৩৬	আজি বরিষণমুখরিত	২১ শ্রাবণ ১৩৪২
ঐ	১৩৭	মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম	২২ শ্রাবণ ১৩৪২
ঐ	১৩৮	জানি জানি তুমি এসেছ	২৩ শ্রাবণ ১৩৪২
নৃত্য-চিত্রাঙ্গদা	১৩৯	দে তোরা আমায় নূতন ক'রে	[ফাল্গুন ১৩৪২]
ঐ	১৪০	রোদন-ভরা এ বসন্ত	১৫ মাঘ ১৩৪২
ঐ	১৪১	আমার অঙ্গে অঙ্গে কে	১৭ মাঘ ১৩৪২
প্রবাসী	১৪২	ঐ মালতীলতা দোলে	[বর্ষামঙ্গল ১৩৪২]

প্রবাসী	১৪৩	আমি শ্রাবণআকাশে ঐ	[বর্ষামঙ্গল ৩০ শ্রাবণ ১৩৪৪ অনুষ্ঠান হয় নি আশ্রমে বিশেষ কারণে। ভাদ্রে অনুষ্ঠান হয় কলিকাতায়]
ঐ	১৪৪	মনে কী দ্বিধা রেখে	
ঐ	১৪৫	আজি গোধূলিলগনে	
ঐ	১৪৬	বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে	
ঐ	১৪৭	ওগো আমার চির-অচেনা	
ঐ	১৪৮	মেঘছায়ে সজল বায়ে	
ঐ	১৪৯	গোধূলিগগনে মেঘে	
ঐ	১৫০	আমার প্রাণের মাঝে সুধা	
ঐ	১৫১	শ্রাবণের পবনে আকুল	
ঐ	১৫২	চিনিলে না আমারে কি	
ঐ	১৫৩	আমার যেদিন ভেসে	[কার্তিক ১৩৪৪]
নৃত্য-চণ্ডালিকা	১৫৪	ওগো ডেকো না মোরে	[ফাল্গুন ১৩৪৪
পাণ্ডুলিপি ১৫৯	১৫৫	তোমার মনের একটি কথা	[ভাদ্র ১৩৪৫]
পাণ্ডুলিপি ১৯১	১৫৬	উদাসিনী বেশে বিদেশিনী	৮ ভাদ্র ১৩৪৫
ঐ	১৫৭	উদাসিনী সে বিদেশিনী কে	ভাদ্র ? ১৩৪৫
ঐ	১৫৮	আমার প্রিয়ার ছায়া	৮ ভাদ্র ১৩৪৫
পাণ্ডুলিপি ১৫৯	১৫৯	জীবনে পরম লগন	২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
ঐ	১৬০	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	ঐ
ঐ	১৬১	আমার নিখিল ভুবন	২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
ঐ	১৬২	ডেকো না আমারে ডেকো না	ঐ
ঐ	১৬৩	কোন্ সে ঝড়ের ভুল	ঐ
ঐ	১৬৪	দুঃখের যজ্ঞ-অনলজ্বলনে	২৫ ? অগ্র. ১৩৪৫
তাসের দেশ	১৬৫	গোপন কথাটি রবে না	[মাঘ ১৩৪৫
ঐ	১৬৬	বলো, সখী, বলো তারি	
শ্যামা	১৬৭	আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া	[ঐ
পাণ্ডুলিপি ১৫৯	১৬৮	আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি	[ফাল্গুন ১৩৪৫
ঐ	১৬৯	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে	[ঐ

২০

পাণ্ডুলিপি ১৫৯	১৭০	যদি হায় জীবনপূরণ নাই হল	[ঐ
ঐ	১৭১	ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী	[২৮ ফাল্গুন ১৩৪৫
ঐ	১৭২	ধূসরজীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি	[ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৪৫
ঐ	১৭৩	বাদলদিনের প্রথম কদম	[১৪ শ্রাবণ ১৩৪৬
ঐ	১৭৪	আজি তোমায় আবার চাই	[১৫ ? শ্রাবণ '৪৬
ঐ	১৭৫	এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও	[১৬ শ্রাবণ ১৩৪৬
ঐ	১৭৬	এসেছিনু দ্বারে তব	[১৯ শ্রাবণ ১৩৪৬
ঐ	১৭৭	স্বপ্নে আমার মনে হল	[শ্রাবণ ? ১৩৪৬
ঐ	১৭৮	এসেছিলে তবু আস নাই	[ঐ
ঐ	১৭৯	শেষ গানেরই রেশ নিয়ে	[ঐ
ঐ	১৮০	সঘন গহন রাত্রি	[ঐ
ঐ	১৮১	ওগো তুমি পঞ্চদশী	[ঐ
ঐ	১৮২	মোর ভাবনারে কী হাওয়ায়	১৭ ভাদ্র ১৩৪৬
ঐ	১৮৩	যবে রিমিকি ঝিমিকি	ভাদ্র ? ১৩৪৬
প্রচল গীতবিতান-৩	১৮৪	প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ	[২৮ চৈত্র ১৩৪৬
ঐ	১৮৫	নির্জন রাতে নিঃশব্দ	[২৮ ? চৈত্র ১৩৪৬
শাপমোচন	১৮৬	নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ	[অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
			[মূল রচনা : চিত্রা, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২

এই তালিকায়, রবীন্দ্রনাথের ১৭ বৎসর থেকে ৮০ বৎসর অবধি বয়সের রচনা উল্লিখিত। আমাদের তালিকা অনুযায়ী ১৭ বৎসর বয়সে (১২৮৪ / বাংলা ১২৬৮ সনে যেহেতু বয়স চলছে ১ বৎসর) রচিত হয় সংখ্যা ১-২, ৭৭ বৎসর বয়সে সংখ্যা ১৪৩-১৫৪, ৭৮ বৎসর বয়সে সংখ্যা ১৫৫-১৭২, ৭৯ বৎসর বয়সে সংখ্যা ১৭৩-১৮৫ আর অশীতি বৎসর বয়সে এই তালিকার সর্বশেষ গানটি। বিস্ময়ের শেষ আছে কি ? সংকলিত তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ধ'রে ধ'রে কতকগুলি গীতরূপ

সম্পর্কে মননীয় নানা বিষয় পরে উল্লেখ করা চলে। —

১৫ তুলনীয় পাঠ— মানসী (১২৯৭ পৌষ), গানের বহি (১৩০০ বৈশাখ), কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩ আশ্বিন), কাব্যগীতি (১৩২৬ পৌষ), গান (১৯০৯)। মানসীতে ও কাব্যগ্রন্থাবলীতে গানের চেহারা নাই। মূল পাঠের কিছু বর্জন ও হের-ফের গীতরূপে।

১৬ মূল-পাঠের বহুশঃ পরিবর্তন গানে।

১৯ দ্রষ্টব্য উত্তরটীকা ৭। তুলনীয় গান— ১৩৯

২২ তুলনীয়— ১৬১

২৩ দ্রষ্টব্য এই গানের রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সুরারোপিত তাঁরই ছন্দোবদ্ধ ভাষান্তর :—

The bee is to come and the bee is to hum
till the heart of the flower comes out.
The bud says 'yea' and the bud says 'nay',
she sways with a fear and doubt.
O errant of wayward wings,
O guest of the sumptuous summer,
give up thy hope, yet keep up thy heart,
O sunny day's gay newcomer!
Whisper in tearful tunes untired
and wait with a faith devout.
For the bud says 'yea', and the bud says 'nay',
she sways with a fear and doubt.

—*The Maharani of Arakan (1915)*
by George Calderon
and staged by The Indian Art & Dramatic Society.

গানটির স্বরলিপিও দেওয়া আছে উল্লিখিত গ্রন্থে ; পাঠ সেই-মত। এই নাটক রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প 'দালিয়া'র রূপান্তর।

২৪ তুলনায়— ১৬২

২৫ তুলনীয়— ১৬০

২৭ তুলনীয়— ১৬৩

৩৫ তুলনীয়— ১৩৯। অপিচ দ্রষ্টব্য উত্তরটীকা ৮

৩৬ রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রন্থে (১৩৮৬। পৃ ১০২-১০৩) শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন : ১৯৩১ সালে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে··· 'কৃষ্ণকলি' কবিতা-টিতে সুর দিলেন··· এই সময়ে 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ' কবিতাটিতে এই প্রথায় সুরযোজনা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, দু-এক লাইন সুরে রচনা ক'রে শুনিয়েওছিলেন, কিন্তু সেটি আর শেষ করে উঠতে পারেন নি।

৭ ও ৪৩ প্রথমোক্ত গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারকে, 'বলে দিয়ো এ গান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারে না।' দ্বিতীয় গানের শিক্ষাকালে তাঁরই ঈষৎ লজ্জা-সংকোচের বা অনিচ্ছার আভাসে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'শুনেই দ্যাখো-না কেমন লাগে।' / দ্রষ্টব্য সাপ্তাহিক বসুমতীর 'পঁচিশে বৈশাখ' সংখ্যা, ১৩৭৬

প্রথমোক্ত গান রবীন্দ্রনাথের কত প্রিয় ছিল সে সম্পর্কে পুনশ্চ অনেক কথা বলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন ; দ্রষ্টব্য উত্তরসূরি, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬, পৃ ১২৬-১২৮

৪৮ তুলনীয়— ৯৯

৫০ দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত ***The Maharani of Arakan*** নাটকে রবীন্দ্রনাথ-কৃত, যথাস্থানে স্বরলিপি-সংবলিত, ভাষান্তর :

In the bower of my youth etc.

১১৫। ১১৬ }
১২৬ - ১২৯ } সুরারোপ সম্পর্কে তথ্যাদি রবীন্দ্রসঙ্গীত (১৩৮৬ পৌষ)।

১০৬ তুলনীয়— ১২৭

১০৭ তুলনীয় পূর্বপাঠ : আশ্বিনে বেণু বাজিল ওপারে বনের

ছায়ে ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য প্রচল সঞ্চয়িতা, গ্রন্থপরিচয়। পূর্ব ও উত্তর পাঠ 'মায়র' জাহাজে একই দিনে লেখা হয় ২ অক্টোবর ১৯২৭ বা ১৫ আশ্বিন ১৩৩৪ তারিখে। আগের গানে সুরভেদ থাকলে, তা পাওয়া যায় নি।

১০৯।১১০ পরের গান, পূর্বের রূপান্তর। দুটিরই রাগরূপ ধরা আছে স্বরলিপিতে।

১২৮ এ গানের পাঠান্তর ও সুরান্তর বর্তমান: আমার নয়ন তোমার নয়নতলে ইত্যাদি। রচনা সম্ভবতঃ ১৩৩৪ সনে; কেননা শারদীয় বার্ষিক বসুমতীতে (১৩৩৪) পরিত্রাণ নাটকের অঙ্গীভূত। আমাদের তালিকাধৃত গীতিকবিতার রচনা সম্ভবতঃ ১৩৩৫ শ্রাবণে এবং সুরারোপ বহু বৎসর পরে; শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন ১৩৪০ ফাল্গুনে।

১৩০ অন্যতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি থেকেই আমরা এ গান সংকলন করি প্রচলিত গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে ১৩৫৭ আশ্বিনে। সুর দেওয়া হয়েছিল কিনা জানা নেই। হয়তো দেওয়া হয় নি। সেই সন্দেহের অবকাশে গীতবিতানে সংকলনের বিপক্ষেও যুক্তি অবশ্যই ছিল; অর্থাৎ সম্পাদক-ভেদে এ ক্ষেত্রে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত হতে পারত। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংকলনে এরূপ গীতি-কবিতাও থাকাই সমীচীন। যাতে কবি সুর দিয়ে গেছেন সে তো থাকবেই, যার সুর হারিয়ে গেছে সেও বাদ দেওয়া যাবে না আর কবি যে কবিতায় সুর দিতে পারতেন, দিতে ইচ্ছা ছিল তবু হয়তো দেন নি, গানের রীতিমত রূপবন্ধটুকু দিয়ে গেছেন শুধু, সেও থাকাই সংগত। সেই বিচার থেকে কেবল যে এই গীতিকবিতাটি সংকলিত গীতবিতানের প্রচলিত তৃতীয় খণ্ডে এমন নয়; একই বিচার-বিবেচনায় ঐ গ্রন্থে গ্রহণ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য

শেষ সংস্করণ ১৩৮০ বা পরবর্তী মুদ্রণ) 'নাট্যগীতি 'পর্যায়ে ৫৩-৫৭। ৫৯। ৬১। ৬৮। ৭০। ৭১। ৭৩-৭৯। ৮১। ৮৭। ৯০-৯২। ৯৪। ৯৬-১০০। ১০৩-১১০ এবং আরো অনেক, বিশেষতঃ পূর্বোক্ত গীতবিতানেই 'প্রেম ও প্রকৃতি' পর্যায়ে সংখ্যা ৫২ : যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ ইত্যাদি। শেষোক্তের উল্লেখ আমাদের তালিকার '৩৬' সংখ্যায়।

'প্রহরশেষের আলোয় রাঙা' -সূচিত বর্তমান রচনা সম্পর্কে পরে জানা গেছে, অসম্পূর্ণ ৪ ছত্রের কবিতা থেকে চার তুকে সম্পূর্ণ 'গীতরূপ' দেওয়ার পিছনে কবির স্নেহপাত্রী শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের পুনঃ পুনঃ তাগিদ কিভাবে সক্রিয় ছিল। প্রচলিত গীতবিতানের গ্রন্থ-পরিচয়ে সে-সব কথারও যথাস্থানে উল্লেখ আছে।

১৪৩ এই ক্রমিক সংখ্যায় আখর-হীন ও আখর-যুক্ত দুই পাঠ বা দুটি গান উল্লিখিত। আখর-যুক্ত গানে সুরারোপ হয় পরে, সম্ভবতঃ কলিকাতায় ; প্রচলিত দ্বিতীয় খণ্ড গীত-বিতানে ঐ গানের দুটি রবীন্দ্র-লিপি-চিত্র দ্রষ্টব্য, স্বরলিপি দ্বিষষ্টিতম স্বরবিতানে সংকলিত (১৯৮১)।

১৪৩-১৫২ সব ক'টি গান পাওয়া যায় শান্তিনিকেতন প্রেসে ১৩৪৪ ভাদ্রে (?) মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্রে। সেই অনুষ্ঠানপত্রে আমাদের তালিকা-বহির্ভূত আরেকটি গান হল : আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো ইত্যাদি ; এটির সুর কি হারালো? কেনই বা হারালো?

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৩০ শ্রাবণ ১৩৪৪ তারিখের এই বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান 'শেষ মুহূর্তে' বন্ধ হয় অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর বা 'গোঁসাইজি'র একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে। কলিকাতায় পরবর্তী ১৯।২০ ভাদ্রের 'বর্ষামঙ্গল' উদ্দেশে যে অনুষ্ঠানপত্রের প্রচার

তাতে নূতন-পুরাতন মিলিয়ে ১৬টি গান। ছুটি একেবারেই নূতন : এসো শ্যামল সুন্দর / আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে / তা ছাড়া তালিকা-ধৃত এই গুচ্ছের প্রথম গানে (১৪৩) আখর দেওয়া হলেও, সকলকে তামিল দেওয়া হয় নি ব'লেই আসরে বা রঙ্গমঞ্চে সেভাবে গাওয়ানো হয় নি।

১৫৩ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত বর্ষামঙ্গলের গান কিন্তু এত পরবর্তী রচনা যে মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্রেও পাওয়া যায় না ; প্রবাসী পত্রে প্রচারিত (১৩৪৪ কার্তিক) বর্ষামঙ্গল-গীতিগুচ্ছের শেষ গান।

১৫৬। ১৫৭ গান-ছুটি মূল পাণ্ডুলিপির সামনা-সামনি ছু পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়। সুরের অভিনব চাল-চলন বা মেজাজের অনুরোধে আগের গানটি 'ভেঙে' পরের গানের রচনা তাতে সন্দেহের কারণ নেই, সম্ভবতঃ বহুদিন পরেও নয়। সুর হারিয়ে গেল কি ? তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে শেষোক্ত গান মুদ্রিত হচ্ছে ১৩৭৯ পৌষ থেকে। কবিতা থেকে গানে কেবল কাব্যিক মাত্রা-হরণের ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নয়, রূপকল্পেরও হের-ফের কিরূপ সেটি বেশ কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ।

১৬৪ তুলনীয়—'মায়ার খেলা'র : ছুখের মিলন টুটিবার নয় ইত্যাদি। [১৬০-১৬৩ গানের তুলনাস্থল যথাক্রমে ২৫। ২২। ২৪ ও ২৭]

১৫৮ তুলনীয়— সানাই : ছায়াছবি [১৩৪৫

১৬০ তুলনীয়— সানাই : গান : যে ছিল আমার স্বপনচারিণী ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

১৬৯ তুলনীয়— সানাই : যাবার আগে [১৩৪৬

১৭০ তুলনীয়— সানাই : উদ্‌বৃত্ত। ১৩ আশ্বিন ১৩৪৭

১৭২ তুলনীয়— সানাই : নতুন রঙ। ২৮ পৌষ ১৩৪৬ অপিচ গীতবিতান-ধৃত পাঠান্তর / সুরান্তর : ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি ইত্যাদি। এই গান ও সানাই-ধৃত 'নতুন রঙ' কম-বেশি চিরাচরিত ছন্দে বাঁধা, আমাদের তালিকা-ধৃত গানটি (ধূসরজীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি ইত্যাদি) মুক্তছন্দে বা প্রায় গদ্যে লেখা বলে চলে, যেমন নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার বহু অংশ।

১৭৩ তুলনীয়— সানাই : দেওয়া-নেওয়া। ২৫ পৌষ ১৩৪৬

১৭৫ তুলনীয়— সানাই : আহ্বান। ২৫ পৌষ ১৩৪৬

১৭৬ তুলনীয়— সানাই : কৃপণা। [১৩৪৬

১৭৭ তুলনীয়— সানাই : আধোজাগা। [১৩৪৬

১৭৮ তুলনীয়— সানাই : দ্বিধা। [১৩৪৬

১৮১ তুলনীয়— সানাই : পূর্ণা। ২৫ পৌষ ১৩৪৬

১৮৪ তুলনীয়— সানাই : আসা-যাওয়া। ১৫ চৈত্র ১৩৪৬ আমাদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় সংখ্যা ১৫৮ থেকে ১৮৪'র মধ্যে, গীতবিতান ও সানাই -ধৃত গীতিকবিতার সর্ব-শেষ বাদে প্রত্যেক ক্ষেত্রে গান রচিত হয় পূর্বে, কবিতা পরে —এ প্রসঙ্গের সবিস্তার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। বাংলা সন-তারিখ-যোগে পুনশ্চ পঞ্জীকৃত হল।

১৮৬ এতৎসংক্রান্ত তথ্যাদি, তেমনি গীতবিতানে এ গানের পাঠ, শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে ; অধুনা তাঁরই কণ্ঠে এ গানের প্রথম স্তবকটি গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনার সুযোগ আছে। দ্রষ্টব্য গীতবিতান-৩ (১৩৮৬ বৈশাখ), পৃ ৮০৬ ও ৯৯১।

বলাকা'র ছন্দোবিবর্তন

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহুখ্যাত ও বহুপঠিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩। সংস্করণ ১৩৭৮) অন্যতম। মূল ইংরেজি গ্রন্থে *(On the Edges of Time, 1958)* নাই, এমন কোনো কোনো বিষয় বাংলায় সন্নিবিষ্ট। এই সংযোজনের মধ্যে রথীন্দ্রনাথের বিরল কখানি ডায়ারির পাতাও আছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ বা ২ ফাল্গুন ১৩২১ তারিখে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচনা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা রবীন্দ্র- কাব্যভাবুক কিম্বা ছন্দোজিজ্ঞাসু কারো অনবধানের অথবা উপেক্ষার যোগ্য নয়। প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে সংকলন করা যাচ্ছে।

'বাবা পরশুদিন শিলাইদহ থেকে ফিরে এসেছেন।··· অনেকগুলি কবিতা ও একটা গল্প [চতুরঙ্গ-ধৃত 'শ্রীবিলাস'] এই ক'টা দিনের মধ্যে লিখে ফেলেছেন। গল্প শোনাবার জন্যে মণিলাল [গঙ্গোপাধ্যায়] সকলকে খবর দিয়েছিল··· প্রথমে তাঁর নতুন কবিতাগুলো পড়তে লাগলেন। বললেন কিছুদিন আগে রমণীমোহন ঘোষ[১] তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে আপনাকে তো আজকাল আবার সেই সাধু ভাষায় ফিরে যেতে হল— সেটার তখন কিছু প্রতিবাদ করেন নি— কিন্তু মনে মনে ছিল যে এখন যে নতুন ছন্দ ব্যবহার করছেন তাতে সহজ বাংলা ভাষায় লিখতে চেষ্টা করবেন। এবারে শিলাইদায় গিয়ে 'মুক্তি' কবিতা সেই প্রথম চেষ্টা। প্রথমটায় একটু শক্ত ঠেকেছিল কিন্তু একবার একটা করতে তার পর সহজেই আসতে লাগল। বরঞ্চ দেখলেন এইরকম ভাঙা ছন্দে সহজ ভাষাই ঠিক খাটে।··· ইচ্ছা করে কোথাও কোথাও দু-একটা অক্ষর[২] কম দিয়েছেন— যাতে একটা লাইনের ঝোঁকটা আর-একটা লাইনের উপর গিয়ে পড়ে, থেমে না যায়। নতুন যা কবিতা জমেছে তাতে একটা বই হবার মতো হয়েছে।'*

—পিতৃস্মৃতি (১৩৭৩, পৃ ২৮১-৮৩ / ১৩৭৮, পৃ ২৭৯-৮১)

'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথের ডায়ারির এই উৎকলনে 'পলাতকা…' এই শিরোনামটুকু যোগ না করাই ভালো ছিল। চতুরঙ্গের 'শ্রীবিলাস' অংশের উল্লেখ কিছু পরে রথীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন কিন্তু 'মুক্তি' কোন্ কাব্যের কোন্ কবিতা সেটি আমাদের একটু বিচার-বিবেচনা ও সন্ধান -সাপেক্ষ। ১৩২১ ফাল্গুনের মধ্যে, ১৩২৫ সনে সাময়িক পত্রে প্রচারিত (বৈশাখ থেকে আশ্বিনের মধ্যে) পলাতকার কোনো আখ্যান-কবিতাই লেখা হয় নি, ঐ কাব্যের কোনো রচনার কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ না জানলেও এ হয়তো অনুমান করা চলে। অপর পক্ষে বলাকার ২২-সংখ্যক কবিতাটি 'মুক্তি' নামে প্রবাসী পত্রে সদ্য প্রচারিত হয়ে তখন অনেকের হাতেই এসে থাকবে। আর, এ কথাতেও কোনো ভুল নেই যে, যে প্রবহমান 'ভাঙা' মহাপয়ার তথা মিশ্র-কলাবৃত্তের সমিল মুক্তক নিয়ে বলাকা কাব্যের বিশেষ খ্যাতি, যার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বলাকার ৬-সংখ্যক 'ছবি' কবিতায় 'তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা'[৪] ইত্যাদি ছত্রে, তারই অর্থাৎ সেই ছন্দো-রীতিরই নূতনতম বিবর্তন তথা পুনশ্চ বন্ধনমুক্তি বলাকার 'মুক্তি' কবিতায় : যখন আমায় হাতে ধ'রে

আদর ক'রে

ডাকলে তুমি আপন পাশে

ইত্যাদি। এ ছন্দের 'প্রবাহ' থামে নি বা বাক্য শেষ হয় নি ৯টি ছত্রে একটি স্তবক সম্পূর্ণ হওয়ার আগে। ছন্দোবিদ্ এ'কে বলবেন সমিল দলবৃত্ত মুক্তক। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী 'দল' বলতে সিলেব্‌ল্ (syllable), শব্দের বা পদের ন্যূনতম সেই অংশ যার কম এক কালে উচ্চারণ করা যায় না।

সুখের বিষয়, বলাকার সব কবিতাই রচনার কালক্রমে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। প্রচল গ্রন্থে সাময়িক পত্রে শিরোনাম-সহ প্রথম প্রচারের বিস্তারিত সূচীও দেওয়া হয়েছে গ্রন্থপরিচয়ে। তাতে দেখা যাবে যে, নিরন্তরবেগবান্ ছন্দের প্রবাহে একদা নূতন যে ঢেউ উঠেছিল

বাংলা ১৩২১ সনে ৩রা কার্তিকের এক রাত্রিকালে, প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে (৬), সে তরঙ্গ মিলাতে না মিলাতেই আরো এক তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা দিল কবির চিরপ্রিয় পদ্মার তটে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে (২২) — সেও নির্জন ছাদে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে নয় কি ?

বলাকায় 'মুক্তি' (২২) কবিতায় প্রবহমান মুক্তকের এই-যে নূতন মুক্তগতি, পলাতকার আখ্যান-কবিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে, বলাকায় তারই ধারাবাহী অন্যান্য কবিতার ক্রমিক সংখ্যা ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২ ও ৩৩। ১৩২১ সনের মাঘেই (তারিখ ১৯-২৭। সংখ্যা ২২-৩৩) প্রায় পালা ক'রে একবার দলবৃত্তের আর একবার মিশ্রকলাবৃত্তের ব্যবহার হল মুক্তক-রচনায়— শেষ পর্যায়ে দলবৃত্তেই যেন ঝোঁক বেশি। তবে অন্তর্বর্তীকালে ২৩ সংখ্যা এবং পরে ৩৬, ৩৭, ৪০-৪২ ও ৪৫ সংখ্যা মুক্তক হলেও, সেগুলিতে মিশ্রকলাবৃত্তের উপযোগিতা কবিতার বিষয়গৌরব এবং/ অথবা তৎকালীন বিশেষ মেজাজের জন্যই এটিও লক্ষ্য করতে হবে —তখনই হয়তো হৃদয়ঙ্গম হবে রমণীমোহনের উক্তির তাৎপর্য।

এখানে বলা বাহুল্য হবে না যে, সংজ্ঞা স্থির ক'রে বা সংজ্ঞার্থ বিচার ক'রে রথীন্দ্রনাথ যেমন বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি ডায়ারিতে, স্বয়ং কবিরও ঐ সময় সেরূপ কোনো প্রয়াস ছিল না। অনেক কথাই আমাদের আভাসে ইশারায় ও সমুপস্থিত বিষয়ের স্বরূপ-পরিচয় থেকেই বুঝে নিতে হবে। তা হলে দেখতে পাব, রবীন্দ্রনাথ মিশ্রকলাবৃত্তে অমিল মুক্তক লিখেছিলেন ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ তারিখে ; 'নিষ্ফল কামনা' নামে ; সেটি মানসী কাব্যে সঙ্কলিত : বৃথা এ ক্রন্দন। / বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা / ইত্যাদি। মিশ্রকলাবৃত্তেই সমিল মুক্তক লিখলেন প্রায় ২৭ বৎসর পরে বলাকার পূর্বোক্ত 'ছবি' কবিতায়। কবিভক্ত রমণীমোহন ঘোষ সামান্য একটু খোঁটা দেওয়াতেই দলবৃত্তেও সমিল মুক্তক লেখা হল অল্পকাল পরে, হেমন্তের পর শীত না যেতেই।

ডায়ারি থেকে আমাদের উৎকলনে কয়েকটি পদ বা পদগোষ্ঠীতে *পাঠকের দৃষ্টি* আকর্ষণ করা হয়েছে বিশ্লিষ্ট অক্ষর সাজিয়ে ; আমাদের বিবেচনা-মত সে কথাগুলির তাৎপর্য এই—

'সাধুভাষা' অর্থাৎ অভিজাত মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি ও তদুপযোগী তৎসম শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ।

'নতুন ছন্দ' এ স্থলে সমিল মুক্তক।

'সহজ বাংলা ভাষা'য় ছড়ার ছন্দ / সহজ ছন্দ যে দলবৃত্ত তারই উল্লেখ। এ ছন্দে গুরুগম্ভীর তৎসম পদ ও যুগ্মধ্বনি ('যুক্তাক্ষর') তেমন ব্যবহৃত হয় না এ কথা রবীন্দ্রকাব্যের বিচারে বলা না গেলেও, কথ্য বাংলার অজস্র শব্দ, ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম, প্রয়োগ করা হয় অবাধে— এ কারণেও এ'কে 'সহজ বাংলা' বলা চলে।

'সাধু ভাষায় ফিরে যাওয়া' বলতে সাধু ছন্দে প্রত্যাবর্তন, যে ছড়ার ছন্দে ক্ষণিকা খেয়া গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে অজস্র রসোত্তীর্ণ কবিতা রচিত সেটিতে নয়। সে যদিবা গান এবং ছোটো ছোটো লিরিকের উপযোগী হয়, বিষয়গৌরবের অনুরোধে ছন্দেও গৌরব এবং গাম্ভীর্য না আনলে চলে কি? সে যেমন মিশ্রকলাবৃত্ত পয়ারে মহাপয়ারে সম্ভবপর, সেই পয়ার বা মহাপয়ার ভেঙে মুক্তকেও সম্ভব এ কথা নাহয় মানা গেল কিন্তু ছড়ার ছন্দে তথা দলবৃত্তে হয় কী ক'রে? এ ক্ষেত্রে মুক্তকের মুক্তগতি, বলাকার যা বৈশিষ্ট্য, কল্পনাও করা যায় নি। কিন্তু কল্পনাতীত প্রত্যাশাতীত যা তারই তো আবাহন মহাকবির অন্যতম কাজ। তাই দলবৃত্ত মুক্তক -উদ্ভাবনেও কিছুমাত্র বিলম্ব হল না ; তার অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও সিদ্ধি দেখা দিল পলাতকার অধিকাংশ কবিতায়। মুক্তক নয় অথচ প্রবহমান ও পংক্তিলঙ্ঘক, দলবৃত্তে এমন একটি কবিতাও লিখলেন রবীন্দ্রনাথ এসময়, যেটির স্থান পলাতকার উনশেষ কবিতা-রূপে আর পুরবীর প্রথমেই যৎসামান্য পরিবর্তনে। এই ছন্দোবন্ধের তথা ছন্দোমুক্তির সার্থকতা কতদূর যেতে পারে, বার বার প্রয়োগ ও পরীক্ষার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের

দেখান নি আর সেটাই বুঝি ভালো— ভাবী কালের আর-কোনো মহাকবির পথ আছে উদার উন্মুক্ত।

পরিশেষে আরেকটা কথা বলা যায়। পলাতকার রসজ্ঞ পাঠক অবশ্যই ভাবতে পারেন, এত বিচিত্র ভাব ভাষার তরঙ্গ তুলে এমন দ্রুত গল্প বলতে হলে কবির পক্ষে / কবিতার পক্ষে দলবৃত্ত সমিল এই মুক্তক ছাড়া আর বুঝি গতি নেই— এতটা সচ্ছন্দ সুন্দর প্রধাবিত গতিভঙ্গী আর বুঝি হয় না। এ দিকে বাংলা ছন্দের এই হল পরিসীমা। কবি স্বয়ং তা স্বীকার করেন ? তা যদি করতেন, উত্তরকালে আখ্যানকথনের প্রয়োজনে স্পন্দমান গদ্যের ফল্গুছন্দ বারম্বার কেন ব্যবহার করবেন পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট আর শ্যামলীতে ? সুতরাং এ ক্ষেত্রেও শেষ কথা কে বলবে ?

গল্প বলার আবেগে ও আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার করেছেন— গল্পের বিষয় বক্তব্য আর ব্যঞ্জনার ক্রমবিকাশে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার পরিণতিতে, কোন্ দিকে কত দূর তার গতি— হয়তো এ প্রসঙ্গের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আজও হয় নি।[৫]

উত্তরটীকা

১ ইনি কবির অনুরাগী ; নিজেও কবিতা লিখতেন তা সেকালের সাময়িক পত্র-পত্রিকায় দেখা যাবে। রবীন্দ্রকাব্যে এঁর প্রীতি ও অভিনিবেশ নানা প্রবন্ধ-রূপে প্রচারিত হয়ে থাকবে, তার বিশেষ নিদর্শন ১৩০৬ আষাঢ়ের প্রদীপ পত্রে 'চৈতালি' নামে মুদ্রিত ও কিছুকাল পূর্বে (১৩৬৯) শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় -কর্তৃক সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসাগরসংগমে' গ্রন্থে সংকলিত। রবীন্দ্রসম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে লেখা এঁর 'কবি-অভিষেক' প্রবন্ধ ১৩১৮ ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে প্রচারিত। এঁর উদ্দেশেই লেখা রবীন্দ্রনাথের 'বন্ধুর চিঠি' নামে যে কবিতা রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর 'সম্প্রতি' শীর্ষক সাম্বাৎসরিক পত্রে (১৩৪৯) মুদ্রিত তার সন্ধান দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীশোভনলাল

গঙ্গোপাধ্যায় ; পরে সংকলিত—

হে বন্ধু, এই অকিঞ্চনের ঘরে
কখনো যে আসো শুধু ক্ষণেকের তরে
সমাদরে কিছু করি যে সমর্পণ
ঘরে তো আমার নাই হেন আয়োজন।
আমি ছুটি যবে উপহার আনিবারে
তুমি চলে যাও কথাটি না ব'লি কারে।
সন্ধ্যাবেলায় দেখি ঘরে ফিরে এসে
তোমার যা দান দিয়ে গেছ নিঃশেষে।

২ 'অক্ষর' বলতে ছন্দের মাত্রা বা unit, এ ক্ষেত্রে 'দল' এরূপ মনে করা চলে। ছড়ার ছন্দের উপযোগী পর্ব-পূরণ করা হয় নি সব ছত্রে, এজন্য আবৃত্তির আবেগ ছত্র থেকে ছত্রান্তরে ধাবিত হয়—রচনার এই বিশেষ গুণের উল্লেখ উৎকলনের উনশেষ বাক্যে।

৩ ডায়ারিতে অতঃপর ভাবী কাব্যগ্রন্থের সম্ভবপর নাম নিয়ে নানা জনের নানারূপ জল্পনা-কল্পনা : শৈবাল, স্রোতের শেওলি (দ্রষ্টব্য বলাকার ১৫ সংখ্যা : মোর গান এরা সব শৈবালের দল ইত্যাদি), ঝরনা এবং পাগলঝোরা। এগুলির একটিও গৃহীত না হয়ে, পরে 'বলাকা' (৩৬) কবিতাটি লেখা হলে সেইমত নূতন কাব্যের নামকরণ হয় তা আমরা সকলেই জানি।

৪ পূর্বপাঠ : ওগো ছবি, / তুমি কি কেবল এই ছবি ইত্যাদি। প্রচল বলাকা কাব্যে (নূতন সংস্করণ : পৌষ ১৩৭৭) লিপিচিত্র দ্রষ্টব্য।

৫ বর্তমান আলোচনায় মোটের উপর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৬৫) গ্রন্থে প্রবর্তিত ও ব্যাখ্যাত ছন্দপরিভাষা গ্রহণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবন

Let your life lightly dance on the edges of Time
like dew on the tip of a leaf : মন্ত্রময় এই কবি-বাক্যের ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ এই সুন্দর ও মনোজ্ঞ স্মৃতিচিত্রখানি ভাষানিবদ্ধ রঙে ও রেখায় নিপুণভাবে এঁকে দিয়েছেন। পরিতাপের বিষয়, এই চলচ্ছবি তিনি বাংলা ভাষাতেও এঁকে বা লিখে যেতে সময় পান নি।

'ছুঁয়ে থেকে ছুলে শিশির যেমন শিরীষফুলের অলকে' তেমনি ক্ষণসুষমার চকিত উল্লাস সত্যই কি সাধারণ মানুষের জীবনে ঘ'টে থাকে? আর, বিরল কোনো মর্ত্যজীবনকে লক্ষ্য করে অমর্ত্য কেউ অমন পুলকিত বিস্ময় যখন অনুভব করলেও করতে পারেন, তাকে কি ক্ষণিকও বলা যায়? অনন্ত কালের হিসাবে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষণ হলেও বলতেই হয়— সেই ক্ষণটুকু অনন্ত হয়ে ওঠে আর সেই শিশিরবিন্দুতেই লোক লোকান্তর ও অনন্ত জীবন হয় প্রতিবিম্বিত। এমন জীবন এক শতাব্দে একটি-দুটি দেখা দিলেও দেশ কাল ও জাতি ধন্য হয়। এমন জীবনই ছিল রবীন্দ্রনাথের। কবি বা শিল্পী তো ছিলেনই, তাঁর সম্পর্কে তবু সব থেকে সত্য কথা আর সার কথা হল এই যে, তিনি ছিলেন জীবনশিল্পী। এমন মানুষের জীবনটি কেউ দেখলেও, দেখানো তার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্ আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ —গীতার মহাবাক্যটি মনে পড়ে। মনের 'কিমিব কিমিব' বোধ দিয়ে যদিবা ধারণা কেউ করে দুর্লভ সৌভাগ্যে, ভাষায় সবটা বলা যায় না। যদি তেমন ক'রে বলা হয়, অসম্পূর্ণ বলাতেও মন থেকে মনে যে আবেগ সঞ্চারিত হয়, যে সত্যকল্পনার দিগন্ত ইশারায় আমাদের আহ্বান করে, তারই ফলে রসিকের মনে স্বভাবঅসম্পূর্ণই কিছুটা সম্পূর্ণের আস্বাদ উদ্রেক করে থাকে। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনকথাটি শ্রেষ্ঠ গুণীর রচিত ছবি বা কবিতার মতো নিঃসীম তাৎপর্যে

ভ'রে, সুন্দর ক'রে অথচ যার-পর-নেই সত্য করে আজও কেউ বর্ণনা করতে পারেন নি। এত নিকটের কালে থেকে পারবার কথাও নয় হয়তো। ইচ্ছা করলে, হয়তো আরেক জীবন পেলে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যা পারতেন, অন্যে তা পারবে কেন? অতএব, অনুরূপ কোনো দুরাশা মনে নিয়ে রথীন্দ্রনাথ এ রচনায় প্রবৃত্ত হন নি সন্দেহ নেই। জন্মাবধি যে দুর্লভ সান্নিধ্যটুকু সহজেই পেয়েছেন কবির স্নেহাধার পুত্ররূপে, সঙ্গীরূপে ও সহকর্মীরূপে, তারই কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ছবি তিনি খুলে দেখিয়েছেন আমাদের সোনার জলে লেখা স্মৃতির আল্‌বামখানির পাতা উল্টে উল্টে। সেও যে বহুমূল্য সম্পদ। এত নিকট থেকে দেখা আর এমন অন্তরঙ্গভাবে এতখানি সহজ আন্তরিকতায় সেটি ব্যক্ত করা, অন্যকে দেখানো, আর কারো পক্ষেই সম্ভব হ'ত না। অন্যে যে জীবনকথা লিখবেন তা বহু অকাট্য প্রমাণ পুঞ্জিত ক'রে, বহু পুঁথিপত্র ও খবরের কাগজ হাৎড়ে হাৎড়ে, তথ্যের সঙ্গে তথ্য জোড়া দিয়ে জোঁকা দিয়ে, ভাবুকতার ও কল্পনার সন্দিগ্ধ ক্ষীণালোকে কিছুটা আলোকিত ক'রে আর অনেকটাই অস্পষ্টতার আবছায়ায় ফেলে রেখে— রথীন্দ্রনাথকে তেমন কোনো কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করতে হয় নি। প্রায় যা-কিছু লিখেছেন সবই তাঁর অব্যবহিত অভিজ্ঞতার ধন, অনুভবের বিষয়। অবশ্য, সচেতন হৃদয় আর সবেদন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বিহনে জন্মাবধি কবিসান্নিধ্যে বাস বা ঘনিষ্ঠতম পারিবারিক সম্পর্ক কতটা লাভের হ'ত তা বলা যায় না— উল্টাও হতে পারত। রথীন্দ্রনাথের হৃদয় মন বুদ্ধি সজাগ সচেতন ছিল ব'লেই চিরপরিবর্তমান ঘটনাধারা তাঁর অন্তরে এসে অভিজ্ঞতায় বা উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে এ আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে— আরো সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আপনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তিনি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। লেখবার সহজাত ক্ষমতা তাঁর আছে, আমাদের মনশ্চক্ষের সামনে ধীরে ধীরে ঘটনা ঘটিয়ে তোলেন তিনি— অজ্ঞাতপূর্ব অদৃষ্টপূর্ব পরিবেশ কেমন করে ঘনিয়ে আসে চার ধার থেকে আর বিভিন্ন দৃশ্যপট

অভ্রান্ত রূপে রেখায় ছবি হয়েই ফুটে ওঠে। কেবল ভাবুক অনুভবী ও শিল্পীর লেখাতেই এই দুর্লভ গুণাবলীর আশা করা চলে।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের বিষয় সন্দেহ নেই, পুত্র রথীন্দ্রনাথ কথক বা সূত্রধার। পুত্রের জন্ম না হতেই ঠাকুর-বাড়ির এক 'পারিবারিক খাতা'য় সকৌতুক যে জল্পনা-কল্পনা হয়, তা দিয়েই গ্রন্থসূচনা। পরে সংক্ষেপে বলা হয়েছে ঠাকুর-পরিবারের পূর্বকথা, প্রিন্স্ দ্বারকানাথের কথা, স্বল্পায়াসে এঁকে দেখানো হয়েছে লেখকের বাল্যজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিবেশ— মাঘোৎসব, খামখেয়ালি-সভা, বিচিত্র সভা সমিতি ও নাট্য-কৌতুকের উদ্‌যোগ উদ্‌যাপন— জোড়াসাঁকোর এ বাড়ি, ও বাড়ি, বির্জিতালাও, পার্ক্ স্ট্রীট। কিন্তু শীঘ্রই পটপরিবর্তন হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, চিৎপুর, চৌরঙ্গীর বদলে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা দেখতে পাই দিগন্তবাহিনী দুকূলপ্লাবিনী পদ্মা ; তারই তরঙ্গদোলায় বা তটের কোলে কবির সাধের তরণী 'পদ্মা' আর শিলাইদহের সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি। কেননা রথীন্দ্রনাথ যখন বালকমাত্র তখনি মহর্ষির ইচ্ছায় ও আদেশে পরিবারের কনিষ্ঠপ্রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পরিবারের সুবিশাল জমিদারি পরিদর্শনের ও পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তখন থেকে পদ্মা নাগর আত্রাই ইছামতী -যোগে এক জেলা থেকে আরেক জেলায়, এক পরগনা ছেড়ে আরেক পরগনায় নিরন্তর ভ্রমণ করেছেন তিনি পদ্মা-বোটে ; একই কালে বাস করেছেন দুই লোকে— প্রজা ও পল্লীবাসী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ভিতর দিয়ে বিহিত বিষয়কর্মের একটি ; আরেকটি হল ভাবের ও সাহিত্যসাধনার, কখনো একা-একা কখনো স্ত্রীপুত্রকন্যা-সহ। অক্ষয় মৈত্রেয়, জগদীশচন্দ্র, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেন, বহু জ্ঞানী গুণী সুহৃৎ সজ্জনের আনাগোনা ঘটেছে এই নির্জন আবাসে ; আলাপ আলোচনায় হাস্যে গানে আনন্দময় হয়ে উঠেছে অপরূপ নৈসর্গিক পরিবেশ ; নূতন নূতন গল্পে গানে অতিথি অভ্যাগতের তুষ্টি-বিধান করেছেন যেমন কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর গৃহলক্ষ্মী

তথা বৌঠ-লক্ষ্মী মৃণালিনীদেবীও অলস থাকেন নি— বিশেষতঃ যখন শুনি নাটোরের দাবি ছিল নিত্য নূতন গল্প-কবিতা নয় শুধু, তার সঙ্গে জোড় মিলিয়ে নিত্য নূতন অন্নব্যঞ্জন। কবির সঙ্গে কবিপত্নীকেও খুশী করবার এ ছিল মনোজ্ঞ কৌশল, রাজার যোগ্য সন্দেহ নেই।

শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসরের এই-যে জীবন এ ছিল এক দিকে কবির সাহিত্যসাধনার জীবন, অন্য দিকে পরিবার ও বন্ধুজন -পরিবৃত সহজ সুখের সামাজিক জীবনও বটে— আর, মাঝে মাঝে জনাকীর্ণ কোলকাতা শহরে এসে এরই যেন এক-একটি তাৎপর্যপূর্ণ গর্ভাঙ্ক-রচনা। কবির নিভৃত সাধনার ফুলে ফলে ফসলে বোঝাই হয়ে মাসে মাসে 'সাধনা' প্রকাশ পেত শহর থেকেই। রথীন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে আর তখনকার বিচারে বেলা ও রেণুকা বিবাহযোগ্যা ব'লে স্থির হলে, নিশ্চিত আরো নানা কারণেই (তন্মধ্যে লোকশান দিয়ে পাটের ব্যাব্সা গুটিয়ে নেওয়া, বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু, এজ্মালি জমিদারি সম্পত্তির বিভাজন, এ-সবই উল্লেখযোগ্য মনে হয়), শস্যশ্যামল সজল সুন্দর ইছামতী-যমুনা-পদ্মা-পরিবেষ্টিত এই কর্মক্ষেত্র থেকে ভাগ্যের অলক্ষ্য ইঙ্গিতেই ক্রমে চলে আসতে হল কবিকে শাল-তাল-রসাল-সপ্তপর্ণ-বিরাজিত কঙ্করকঠিন যে রুক্ষ ডাঙায় সেদিন তার নাম ছিল বোলপুর-ভুবনডাঙা আর আজ শান্তিনিকেতন। এটি কবির পরবর্তী-কালের জীবনযজ্ঞভূমি— তপঃক্ষেত্র বা সিদ্ধপীঠও বলা যেতে পারে। যত দুঃখ যত আয়াস যত দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাত ততই সিদ্ধি ও সার্থকতা, যার পরিপূর্ণ রূপ ও নিঃসীম তাৎপর্য হয়তো আজও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয় নি— হবে কি অন্য কালে অন্য দেশে?

বিভিন্ন ঘটনা ও বিচিত্র চরিত্র একটির পর আরেকটি নিপুণ তূলিকায় এঁকে কবিজীবনের এই উত্তরপর্বটিও চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রথীন্দ্রনাথ। দুঃখের কাল, দুশ্চর তপঃসাধনার কাল বলেছি এটিকে। দুটি, পরে পাঁচটি, ব্রহ্মচারী ছাত্র নিয়ে শুরু হয়েছে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের তপোবনের ভাবরূপ ছিল রবীন্দ্রনাথের

তখনকার ধ্যানে। সেই ধ্যান ও কল্পনাকে আকার দিতে নিজের অধিকাংশ সময়, চিত্ত এবং বিত্ত, নির্জনে নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে দান করেছেন, বহিঃসংসার যে সময় তাঁকে নিন্দা করেছে 'পলাতক' ব'লে। সাধ্বী কবিপত্নী একে একে আপনার গায়ের অলঙ্কারগুলি সব খুলে দিয়েছেন স্বামীর ব্রতউদ্‌যাপনে ; সুখের ও শান্তির তাতে অভাব হয় নি। কিন্তু রাজ্ঞী অরাজ্ঞীর কোনো প্রশ্নই না তুলে সর্বদানযজ্ঞে প্রবৃত্ত করেছে কবিকে তাঁর যে নির্মম মহান্ ভাগ্য, যেন তারই ইঙ্গিতে একে একে বিদায় নিয়েছেন স্নেহপ্রেমময়ী পত্নী, দুই কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। সমস্তই সহ্য করেছেন মহাসাধক। দুঃসহ মৃত্যুশোকের ভিতর দিয়েই মৃত্যুঅতীত অমৃতের অভিমুখী করেছেন একাগ্র অন্তঃকরণ। 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' পার হয়ে এসেছে ভুবননাথ জীবননাথের পাদপদ্মতলে 'গীতাঞ্জলি'-উৎসৃজনের শুভক্ষণ। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তা হলে তো চিরাচরিত প্রথায় সাধু মহাত্মা ভক্ত বা মুক্ত পুরুষ, অবতারকল্প বিভূতি, এ ভাবেই কবিজীবনের সমাপ্তি হতে পারত অভীষ্ট পরিণামে। এমন হয় নি কি এ দেশে যুগে যুগান্তর ? কিন্তু, আজ আমরা জানি, কবির জীবন-দেবতার নির্দেশ অন্যরূপ। সাধু মহাত্মা ফকিরের অভাব এ দেশে কখনো হয় নি, এ আমাদের অশেষ সৌভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু সংসার ত্যাগ করবার জন্য কিম্বা পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর মতো সতত আল্‌গোছে থাকবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত হন নি মর্ত্যলোকে। তিনি এসেছিলেন এই মনুষ্যলোকে সব মানুষকে মেলাবার জন্যই ; মানুষের সব সুখ দুঃখ বিষয়বাসনা কামনা সাধনাকে মেলাবার জন্য সত্য কল্যাণ ও ছন্দসুষমার সঙ্গে ; ধনী-নির্ধন রাজা-প্রজা সকলেরই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলাবার সাধনায়— তিনি তো মানবহৃদয়েরই কবি, কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের না। আর, জাতির সঙ্গে জাতি, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচী, তাও তো মেলাতেই হবে— স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বেধে অজ্ঞানের ও লোভ ক্ষোভের সাময়িক আঁধিতে যতই-না ঢেকে দিক্ মানুষের দৃষ্টি। এই ছিল তাঁর অন্তরের অন্তর্লোক থেকে নিঃশব্দ নিগূঢ় আর

অব্যর্থ সংকেত। তাই বুঝি রোগদুর্বল কবি নিজের কয়েকখানি কাব্যের একমুষ্টি ইংরেজি তর্জমা হাতে ক'রে সাত সমুদ্রে পাড়ি দিলেন যেদিন জ্যেষ্ঠপুত্র আর পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে— নষ্ট স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যই যাচ্ছেন, পরিবেশবৈচিত্র্যে মনও প্রফুল্ল হতে পারে আর শরীরে বিশেষ একটি অস্ত্রোপচার করালে যাপ্য রোগবিশেষ থেকে নির্‌মুক্ত হয় শরীর স্থায়ীভাবে, এর অতিরিক্ত কোনো প্রত্যাশা স্বয়ং কবিরও ছিল কি? তবু কী হতে কী হল, কোনোদিন কেউ যা ভাবে নি, কল্পনা করার কারণও ঘটে নি। প্রাগ্‌বিশ্বসমর ইংলণ্ডে আর ইউরোপে পূর্বকে অন্তরে তুলে নিল পশ্চিম। কবির নবলব্ধ বান্ধব রোটেন্‌স্টাইনের ঘরোয়া বৈঠকে অল্প-কয়েকজন জ্ঞানী গুণী সহৃদয়ের সমাবেশে কী নিঃশব্দ আর কত দূর-প্রসারী এই সূচনা! যিনি ছিলেন বাংলার ও ভারতের মানুষ, এ দেশের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কবি, দেখা গেল তিনি সব দেশের মানুষ আর সব মানুষেরই কবি।*

রথীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তিনি বিনা আড়ম্বরে বিনা আয়াসে চির-চেনা ক্ষুদ্র দেশ কাল থেকে সব দিক দিয়েই সুবিশাল প্রায়-

---

ভিন্ন ভাষার ব্যবধান ছিল, অধিকাংশের কাছে আজও রয়েছে রবীন্দ্রজন্মের পর শতাধিক বর্ষ অতীত হলেও। সব দেশের সব মানুষের যে অব্যর্থ উত্তরাধিকার রয়েছে রবীন্দ্র- কাব্যে বা সাহিত্যে, সেটি পেতে হলে ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রদেশের মানুষকে বাংলা ভাষা যত্ন করে শিখতেই হবে। তা হলেও স্বীকার তবু করতেই হয়, ইনি সব দেশের সকল কালের কবি। যেমন সর্বজনীন সর্বকালীন কবি ও কথক-রূপে গণ্য ব্যাস বাল্মীকি হোমার দান্তে শেক্‌স্‌পীয়র গেটে টলস্টয়। কারো থেকে কেউ কম কি? বিশেষ কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি, অতএব বিশুদ্ধ মানবহৃদয়েরই কবি তিনি— সকলের তাই অন্তরতর / এমন-কি অন্তরতম।

সীমাহীন এক অভিনব পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উত্তীর্ণ করে দেন— কবির সহযাত্রী হই আমরা নানা দেশে, য়ুরোপে, আমেরিকায়। আরেক রকম ক'রেও বলা যায় শ্রীঅন্নদাশঙ্করের ভাষায়— আমরা ছিলেম দেশের গণ্ডীতে বাঁধা, হঠাৎ দেখি খরতর কালের প্রবাহে পেয়েছি ছাড়া। তার নাম একালই বটে যার মুখ্যধারাটি বইছে আজ ভয়াল সুন্দর তরঙ্গিত আবর্তিত বেগে য়ুরোপ আমেরিকা জুড়ে, যার দুর্নিবার টান উপেক্ষা করতে পারে এ ক্ষমতা আজ কোনো জাতিরই নেই— কী আরব-পারস্য চীন-জাপান আর কী-বা 'আর্য-নিবাসভূমি' ভারতবর্ষ। এড়িয়ে যেতেই হবে, তাও তো নয়। কালো হি বলবত্তরঃ। মহত্তর যে তাতেও সন্দেহ নেই। কথা কেবল এই যে, সেই প্রবাহে প'ড়ে অবশে আমরা হাসব কাঁদব, ভাসব ডুবব, হাবুডুবু খাব, নয়তো সাহেবদের কলের জাহাজে উঠে খালাসি হব অথবা স্যুটে-বুটে নকল সাহেব সেজে কোনো রকমে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হব— অথবা আমাদের মতো ক'রেই আমরা পাল তুলে দেবো, দৃঢ়মুষ্টিতে হাল ধরব, দিগ্‌দর্শনে ভুল করব না এবং আমাদেরই যুগ-যুগ-নির্দিষ্ট অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হব— কী জানি সে হয়তো সব জাতিরই লক্ষ্য সব মানুষের। নিশ্চিত বলা যায় না। নানা জাতিকে একই লক্ষ্যে ভিন্ন মতে আর ভিন্ন পথে যেতে হবে এটাই কি মানবভাগ্যবিধাতার গহন গভীর ও চিরন্তন নির্দেশ নয়?

যা হোক, যুগকে অস্বীকার না ক'রে, আপন প্রতিভাবলে আর চরিত্রগুণে তার গতি তার বেগ ধারণ ক'রে জাতীয় জীবনে, তমোগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও সংস্কৃতিকে জাগ্রত জীবন্ত চলিষ্ণু ক'রে তোলার যে সাধনার শুরু হয় রামমোহনে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তারই এক বিশেষ পরিণতি দেখা গেল আজ। মনে হয় এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে সজাগ সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁর এই নূতন উপলব্ধির বলে তিনি সমস্ত দেশকে, অতীতে-আবদ্ধ দেশের চিত্তকে, নিয়ে যেতে চাইলেন সামনের দিকে আর সকল মানুষের অভিমুখে—

তারই নাম দিলেন বিশ্বভারতী। আর, পরিণত বয়সে ও উপচিত প্রতিভায় ও প্রত্যয়ে যে সহজ ধর্ম তিনি পেলেন কবিচেতনায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে স্বীকার করলেন, তাই হল 'মানুষের ধর্ম', নূতন সহজিয়াবাদ, যার ভিতর গুহ্য গোপন কিছুই নেই—আছে চিরকালীন-আলোয়-উদ্‌ভাসিত কল্যাণ, শান্তি, সুষমা ও বিশ্বমৈত্রী।

কিন্তু এভাবে কোনো গ্রন্থের আলোচনা অথবা সমালোচনা কেউ করে না। অতএব, বক্তব্য বাড়িয়ে আর কাজ নেই। সব-শেষে এ কথাই বলি, রথীন্দ্রনাথের যে বই পূর্বে একবার সুযোগ হয়েছিল পড়বার, আবার পড়তে হল লেখার গুণে বা লেখকের আন্তরিকতাগুণে। অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার এমন স্বচ্ছ সুন্দর অভিব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ বলা চলে। রবীন্দ্রজীবনী এটি নয়, শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমারের বিপুলায়তন চার-খণ্ড গ্রন্থেও যার সব তথ্য পুঞ্জিত করা যায় নি, তবে রবীন্দ্রদর্শন, রবীন্দ্রতর্পণ, রবীন্দ্রচরিতে বারেক অবগাহন —এ বইটিকে অবশ্যই বলা যায়। অলৌকিক সেই জীবনপ্রবাহের স্পর্শ যেন গায়ে এসে লাগল। উদ্দীপ্ত আনন্দময় যুবাবয়স থেকে পূর্ণ পরিণত বার্ধক্য অবধি কবিজীবনের আশ্চর্য এক চলচ্ছবি আমাদের মুগ্ধ চক্ষে ভেসে উঠল। সামগ্রিক না হলেও সমগ্রের ব্যঞ্জনা তাতে রয়েছে। বলার মধ্যে আছে অপূর্ব একটি পরিমিতিবোধ, মাত্রাজ্ঞান, সংযম ও শালীনতা। যদিও নিজের জীবনসূত্রেই পিতৃজীবনের ঘটনাবলির মালিকা গেঁথেছেন পুত্র, একাকী ছাত্ররূপে দেশে বিদেশে আপনার ভ্রমণের কথাও বাদ দেন নি, নিজে পৃথগ্‌ভাবে তবু কখনোই আমাদের সামনে আসেন নি। নানা ভাবে আর নানা দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকেই ফুটিয়ে তুলেছেন, বিশেষতঃ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ যিনি— পিতৃভক্ত পুত্র, প্রেমপ্রীতিময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা, প্রজাহিতব্রতী জমিদার, শিক্ষক, সুহৃৎ, সামাজিক, সুখদুঃখভোগী আর-পাঁচজন মানুষের মতোই মানুষ অথচ কবি ও শিল্পী, চেতনার নিরন্তর উদবর্তনে একেবারেই স্বতন্ত্র। উপনিষদে উপদিষ্ট এক শাখায় উপবিষ্ট

যুগল পাখির উপমা স্বতই মনে পড়ে। সুখ-দুঃখ প্রেম-ঘৃণা লাভালাভ জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ এক ক'রে জ্ঞানী বা ভক্ত হন নি কোনোদিন মনে হয় অথচ মনুষ্যজীবনের ক্ষেত্রে ছিলেন বীর, সাধক, যোদ্ধা তিনি আর অন্তরে ছিলেন স্বভাবআনন্দময় কবি সর্বত্র যাঁর প্রবেশ— সর্বব্যাপী অনুরাগ— সত্য শিব ও সুন্দরই যাঁর উপাস্য— যাঁর আশ্রয় অদ্বয় এক।

করুণা

রবীন্দ্রবর্ষের যে প্রত্যন্তসীমায় আজ আসিয়া পড়িয়াছি, কবি রবীন্দ্রনাথ সেটিকে কী এক তিরস্করণী-যোগে বহুদিন লোকলোচনের বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য রচনাটি আজ পর্যন্ত বিশেষ-ভাবেই বর্জিত ছিল। 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' 'ভগ্নহৃদয়' 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতি কাব্য নাটক গাথা বহু আপত্তি সত্ত্বেও 'অচলিত রবীন্দ্ররচনা' রূপে পুনর্মুদ্রিত হইতে দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে— আর, 'ভিখারিনী' ও 'করুণা'? রূপস্রষ্টার মনে কোনো করুণার উদ্রেক করে নাই বুঝি। বহুদূর কালের 'ভারতী' মাসিক পত্রের প্রথম দ্বিতীয় বর্ষের জীর্ণ মলিন ধূলিপুঞ্জিত নেপথ্যভূমে এপর্যন্ত তাহারা অবরুদ্ধ ছিল। গদ্যকাব্যরচনার বা আখ্যায়িকাকথনের প্রথম প্রয়াস হইলেও দিবা-লোকে প্রকাশ হয় নাই বলিব, কেননা রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির পূর্বে কবির কোনো গ্রন্থেই উহাদের স্থান ছিল না। অথচ, গদ্যে এক দিকে এ-দুটি 'বনফুল' 'কবিকাহিনী'র ধারাবাহী যেমন, অন্য দিকে 'ঘাটের কথা' হইতে 'ল্যাবরেটরি' 'বদনাম' 'প্রগতিসংহার' পর্যন্ত কথক রবীন্দ্রনাথের বহুধাবিচিত্র রূপসৃষ্টিরও অগ্রগামী।[১]

কাব্যসাহিত্যে 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' আর কথাসাহিত্যে 'ভিখারিনী' 'করুণা' যাহাই আমাদের আলোচনার বিষয় হউক, কিশোরকবিজীবন ও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা দেখিতে হইবে। এভাবে দেখিতে গেলে যে পরিমাণ অধ্যয়ন এবং অধীত বিষয়ে স্বচ্ছন্দ অধিকার থাকা প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই এ কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা ভালো। নানা আধারগ্রন্থের ভরসায় তবু আমাদের এই দুঃসাহস, আশা করি, এ কাল এবং আগামী কাল মার্জনা করিয়া লইবেন।

রবীন্দ্রজীবনের চুম্বকমাত্র মনে রাখিলে দেখিতে পাই উল্লিখিত কাব্য-আখ্যায়িকার প্রথম প্রকাশ-কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশের ভিতরে। প্রায় এই বয়সের একগুচ্ছ গীতিকবিতাই তিনি 'শৈশবসঙ্গীত' নামে ১২৯১ সনে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ, কবিকে এই বয়সে কবিকিশোর বলিলেও অসংগত হয় না। এ সময়ে কবির ভাবনা ও কল্পনা বিশ্বে তথা মানবসংসারে দশ দিকেই ভ্রমণ করিতেছে। ভাব দানা বাঁধে নাই, রূপকৃতি অথবা চরিত্রচিত্রণ অভ্রান্ত হয় নাই, কেননা জীবনের অভিজ্ঞতা অপ্রচুর। অথচ লেখকের ভাষায় অধিকার জন্মিয়াছে— ছন্দোবদ্ধ কবিতা অপেক্ষা গদ্যেই তাঁহার অধিকার সমধিক। বঙ্কিমি গদ্যের তথা আখ্যানকথনের অপরূপ আদর্শ একটা সম্মুখে আছে সন্দেহ নাই কিন্তু রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্যেরও অভাব নাই— সে বৈশিষ্ট্য রাবীন্দ্রিক ভাব ও কল্পনার, অপরিসীম-সম্ভাবনা-ময় কবিত্বের, অভিসারী। ফলতঃ যে ভারতী পত্রের পৃষ্ঠায় এই রচনাশৈলীর নিদর্শন ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, তাহাতে হয়তো দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোনো লেখকের উন্নততর অথবা মনোজ্ঞতর গদ্যরচনা অল্পই পাওয়া যাইবে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতেই (১২৮৪ শ্রাবণ) যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-আলোচনার সূত্রপাত, তাহাতেও নৈপুণ্যের কোনো অভাব ছিল কি? রবীন্দ্রনাথের এই গদ্যশৈলীই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'আলোচনা' 'সমালোচনা' পার হইয়া, 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া, উত্তরোত্তর চারুতা হইতে অ-পূর্ব চারুতায়, ব্যঞ্জনা হইতে অব্যর্থতর ব্যঞ্জনায়, প্রয়োজনীয় ওজঃশক্তিতে সামর্থ্যে সংহতিতে এবং বক্তব্যখ্যাপনের বহুভঙ্গিম বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে— রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বৎসর বয়স অবধি কখনো তাহা অবসন্ন মলিন প্রাণহীন অপূর্বতাদীন অক্ষম বা অসার্থক হয় নাই। যাহা হউক, কবির ভাষাই আমাদের আলোচনার বিশেষ সামগ্রী নয়। এ কথা বলাই যথেষ্ট হইবে— রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই গদ্য সাবলীল, শ্রুতিমধুর, মিতালংকার, কবিত্বপূর্ণ এবং বিষয়োপযোগী। ফলতঃ ভাষা

পাওয়া গিয়াছে, ভাবগঙ্গার গতিপথও নির্দিষ্ট হইয়াছে, পূর্ণ প্লাবন নামে নাই, ভাবনা বেদনা ধ্যান ধারণার দুই তট দৃঢ় হয় নাই আর মানব-জীবনের পূর্ণায়মান অভিজ্ঞতাও পরিব্যাপ্ত দিগন্তের মতোই দূর হইতে দেখা যায় মাত্র।

'ভিখারিনী' ও 'করুণা'র ভাব ভাষা আখ্যান যাহার কথাই চিন্তা করি না কেন, মনে রাখা চাই— ইতিপূর্বে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী' 'বিষবৃক্ষ' 'ইন্দিরা' 'যুগলাঙ্গুরীয়' 'চন্দ্রশেখর' 'রাধারাণী' ও 'রজনী' প্রকাশিত হইয়া বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে এবং শিক্ষিতসমাজের হৃদয়ও জিতিয়া লইয়াছে; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' চলিতেছে। নবজাগ্রত বঙ্গচিত্তের একচ্ছত্র অধিপতি বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, কিশোর রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার নতুন-বৌঠানের কতদূর মনোহরণ করিয়াছিলেন তা হয়তো রবীন্দ্রজীবনের স্মৃতিকথায় আমরা পড়িয়া দেখিয়াছি আর সহজেই অনুমান করিতেও পারি।

কিন্তু বঙ্কিমের মধ্যে যে জীবনজিজ্ঞাসা ও অভিজ্ঞতা, প্রতিভার যে সুদৃঢ় বিশাল পরিণতি, তরুণ রবীন্দ্রনাথের এ রচনায় তাহা কোথা আর কেনই বা থাকিবে? মহৎপ্রতিভাও বীজবপন, অঙ্কুরোদ্গম, বিকাশ ও বৃদ্ধির বিধিবিহিত নিয়মের অধীন। সুতরাং 'ভিখারিনী' অথবা 'করুণা' কাঁচা লেখা ইহাই মনে করিয়া পরিণত বয়সে কবি নাহয় নিষ্পৃহ হইয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারেন (গবেষণা করিবার সময় কোথা তাঁর / কিসেরই বা প্রয়োজন), কিন্তু আজিকার সুজন পাঠক বা সুধী ব্যক্তিও যদি তাঁহার অনুকরণ করেন তবে অবশ্যই নানা দিক দিয়া বঞ্চিত হইবেন— রসে না হউক, সাহিত্যসম্পর্কিত বিবিধ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়।

'ভিখারিনী' অপরিণত, কাঁচা, আর গদ্যে লেখা হইলেও উহাকে একখানি কাব্যকথা বলা চলে। বালক-বয়সে, খৃষ্টীয় ১৮৭৩ সনে, পিতার সাহচর্যে প্রথম হিমালয়বাসের অবিস্মরণীয় স্মৃতি যেমন 'বনফুল'

ও 'কবিকাহিনী' কাব্যে তেমনি এই আখ্যায়িকায় বিধৃত। চীড় বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের মতো ব্যবহারের উল্লেখ 'বনফুল' আর 'ভিখারিনী' উভয় রচনাতেই দেখা যায়। তবু, হিমাচলস্মৃতি বলিতে হিমালয় গিরিশিখর ও উপত্যকা-অধিত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্মৃতিই বুঝিতে হইবে। কেননা, একে বারো বৎসর বয়সের বালক, তাহাতে অভিজাতবংশীয় ভিন্‌দেশী, সঙ্গত্যাগী ধ্যানী জ্ঞানী পিতার স্নেহপক্ষপুটে থাকায় ওখানকার লোকের সহিত তেমনভাবে মিলিবার মিশিবার কোনো সুযোগ বা প্রয়োজন ছিল না আর থাকিলেও বালকের পক্ষে অপরিচিতপূর্ব মানবজীবনের অভিজ্ঞতা তো নিবিড় বা গভীর হইতে পারে না। তাই জানিতে পারি, কল্পনাপ্রবণ বালক বনে পর্বতে, নিঃশব্দ গম্ভীর পাইন-বনের ছায়ায় ছায়ায় আর কলোল্লাসমুখর গিরিদরীর ধারে ধারে, একা আপন-মনে ভ্রমণ করিত; নানা বর্ণের মসৃণ উপল কুড়াইত, বনফুল তুলিত, চিত্রবিহঙ্গমের গতাগতি লক্ষ্য করিত; খদ্যোত এবং ঝিল্লির ঝিকিমিকি-দ্যুতিতে ও ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইত— নক্ষত্রলোকের সহিত নামে রূপে তাহার পরিচয় হইত আর দিগ্‌দিগন্তের তুষারশুভ্রতাও অদৃষ্ট-পূর্বই ছিল। আর, অবশ্যই একা একা পাহাড়ি লাঠি হাতে বনে পাহাড়ে ঘুরিবার সময় কদাচিৎ একটু পদস্খলন হইতে না হইতে অনেক শঙ্কার শিহরণে ও কল্পনায় মিলাইয়া অনেক রম্য সম্ভাবনার স্বপ্নজাল বুনিবারও অবকাশ ছিল। ফলে, জোড়াসাঁকোয় ফিরিয়া জননী সারদা-দেবীর অন্তঃপুর-আসরে বসিয়া বহু রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-বিবরণ শুনাইবার সুযোগও হইয়াছিল। ইহার অধিক আর কী বা আশা করা যায়। অতএব, হিমাচলস্মৃতি বলিতে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের, প্রভাত ও সন্ধ্যার, দিবস ও রাত্রির স্মৃতি —ইহাই মুখ্য। সেই দূরস্মরণীয় বাল্য-স্মৃতির পটভূমিকায় নিছক কবিকল্পনা-সৃষ্ট নরনারীর সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, জীবন যৌবন, বিরহ মিলন, প্রেম ও মৃত্যু আর হয়তো কবির আপন সত্তা, স্বকীয় ভাবরূপ (স্বরূপ হয়তো নয়) —এই সহজলভ্য উপাদানেই 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' ও 'ভিখারিনী'র রচনা। কালক্রমে

নানা প্রয়োগ ও পরীক্ষার বশে একটি হইতে আরেকটি যেভাবে যতটা পৃথক্ হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলা চলিবে।[২]

বাস্তব সংসারে নাম ও নামীর (নাম্নীর) অভিন্নতা কতদূর বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও কথায় বিশেষ এক-প্রকার নামকরণের রহস্য কী, কেহ তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? 'বনফুল' কাব্যের নায়িকা কমলা, প্রতিনায়িকা আবার নীরজা। 'কবিকাহিনী'র নায়িকা নলিনী। ভগ্নহৃদয়ের নায়িকার নামও তাই। নলিনী নাট্যেও কবি আর-কোনো নাম খুঁজিয়া পান নাই। 'ভিখারিনী' কাব্যকথায় নায়িকা কমল, 'মুকুট' আখ্যায়িকার একমাত্র নারীচরিত্র কমলাদেবী আর বহুপরবর্তী 'নৌকাডুবি'র নায়িকা কমলা ও প্রতিনায়িকা হেমনলিনী। ইহারই মাঝখানে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে আর 'করুণা' উপন্যাসে হয়তো কবির একটু হুঁশ হয়, তাই তাৎপর্য বিচার করিয়া, নামের আশ্রয়েই এক-একটি ভাবব্যঞ্জনা উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিয়া প্রধানা পাত্রীদের নাম দিলেন— প্রমদা, শান্তা, করুণা, রজনী। 'ঘাটের কথা'য় কুসুম। 'কর্মফল' গল্পে ও 'শোধবোধ' নাটকে পুনশ্চ নলিনী। আর, সব-শেষে 'তিনপুরুষ' বা 'যোগাযোগ' আখ্যানের কুমুদিনী কি কমলেরই সোদর-ভগিনী নয়? আরো শুভ্র, সুন্দর, ধ্রুব ও সপ্তর্ষির দিকে অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সারারাত্রি কোন্ দেবতার ধ্যান করে আর সেই ধ্যান ধারণা আরাধনার উদ্‌যাপন হয় কর্মকোলাহলে জাগ্রত দিবসের প্রোজ্জ্বল উপকূলে পৌঁছিয়া।[৩]

আদিম কবিকল্পনায় উদ্ভাসিত যে নারী- রূপ বা স্বরূপ, সুকুমার ফুলের সহিত, বিশেষতঃ মৃদুসৌরভে শোভায় লাবণ্যে ঢলোঢল শতদল পদ্মের সহিত, তাহার একটি বিশেষ সাদৃশ্য আছে। হয়তো ইহার অধিক তাৎপর্য কিছু নাই এই-সব নামকরণে।

'ভিখারিনী' আখ্যায়িকার পাত্রপাত্রী ও ঘটনা কিশোর কবি-কল্পনারই উপযুক্ত। যে কবির বাস্তব সংসারের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তেমন কিছু হয় নাই। নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎসঞ্চারী প্রেমের

অনেকটাই শুধু অনুমান এবং ভাবনা -গম্য। এজন্যই এমন এক দেশে কালে সমুদয় ব্যাপারটির উপস্থাপনা যাহা চিত্রবৎ প্রতীয়মান মাত্র, অনির্দিষ্ট, অপরিচিত, সুদূরস্থ, কোনো ছিদ্রান্বেষী উকিলের সওয়াল-জবাবে যাহার সত্যাসত্য-নির্ণয়ের কল্পনা কাহারও মনেই ওঠে না। অর্থাৎ, আসলে ইহা কারণলোকের তথা ভাবলোকের বস্তু, গদ্যে লেখা কবিতাই। ইহা কোন্ জাতের রচনা সে কথাই বলিলাম। কবিতা বা রূপকথা হিসাবেও নিটোল সার্থকতা যদি না দেখা দিয়া থাকে তাহার কারণ— জীবন সম্পর্কে, তেমনি কবিকর্ম সম্পর্কে, কবিঅভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য। কেননা, কবিতায় বস্তু না'ও থাকিতে পারে কিন্তু বস্তুর সারসত্তা না থাকিলে উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে পারে না। উহা যে অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, কেবল কবিপ্রতিভার মায়িক শক্তিতে নিষ্পন্ন হইবার নয়। কবিতায় রূপ ও রস থাকিলেই হইল, এটুকুতে সব কথা বলা হয় না ; বলিবার আরো কিছু অবশিষ্ট থাকে।

ক্ষুদ্র 'ভিখারিনী' আখ্যায়িকাটি বিয়োগান্ত তথা করুণ-রসাত্মক। অপরূপ-নিসর্গলোকে-ছাড়া-পাওয়া ছোটো দুটি বালক বালিকার আশা ও কল্পনা -যোগে একত্র একটি স্বর্গ-রচনা, আর সেই স্বর্গ বাস্তব ঘটনাঘাতে কত সহজে ও কত শীঘ্র ভাঙিয়া শতখণ্ড সহস্রখণ্ড হইল তাহারই এক কাহিনী। সব-শেষে বালিকা কমলের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বিষাদকরুণ সৌম্যগম্ভীর অমরসিংহকে ফিরাইয়া আনিয়া সেই ভাঙা স্বপ্নকে আর জোড়া দেওয়া গেল না। কমলের রুগ্ন শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া আসিল, ধীরে ধীরে প্রদীপও নিভিল। শোকবিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাসশূন্য বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

'শোকবিহ্বলা বিধবা [জননী] সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া

ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটীরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।'

'ভিখারিনী' বিয়োগান্ত করুণরসাত্মক কাহিনী আর উহার অব্যবহিত পরে যে আখ্যায়িকা ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে তাহার নামই 'করুণা'— নায়িকার নামও তাই। সাময়িক পত্রে 'করুণা'- প্রকাশের অন্তর্বর্তী কালে 'কবিকাহিনী' কাব্যটিও চারিটি সর্গে ভারতীর চারিটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রচনার পূর্বাপরতা জানা যায় না। 'কবিকাহিনী' ও 'করুণা' হইতে 'ভিখারিনী' যে বহু পূর্বের রচনা নয়, তাহাই বা নিশ্চিতভাবে কে বলিবে? রচনাপ্রকাশের হিসাবে 'বনফুল' আরো পূর্বের এবং প্রথম, তাহা আমাদের জানা আছে।[৪]

স্নেহ প্রেম ঘৃণা বিদ্বেষের জোয়ার-ভাঁটায় প্রধাবিত জীবন-জাহ্নবীর তরঙ্গে তাড়িত ও আবর্তে নিমজ্জিত দুর্বল মানুষের— নর ও নারীর— ভাগ্যবিড়ম্বনা আর তাহাতেই কারুণ্যউদ্রেক, সহৃদয়ের দুটি চক্ষে দুফোঁটা অশ্রুর আবাহন, ইহাই যে এ কয়খানি কাব্য বা কথার উদ্দেশ্য ইহা বলিলে বড়ো বেশি অত্যুক্তি হইবে না। 'বনফুল' কাব্যে এই করুণরসসৃজন সাধারণভাবে বিভিন্ন মানুষের জীবন লইয়া সাধিত হইলেও, 'কবিকাহিনী'তে সেই রসই একটি বিশ্বমানবিক ভূমিতে একটি নিত্যকালীন আকৃতি ও অভীপ্সায় উৎসারিত। অর্থাৎ, 'কবিকাহিনী'র নায়ক কবির যে বিয়োগব্যথা তাহাতে বিশ্বমানবেরই চিরন্তন বেদনার আভাস পাওয়া যায় ও চিরসান্ত্বনার অনুসন্ধান দেখিতে পাই। (হয়তো ইহাতে সমভাবের ভাবুক তরুণ ইংরাজ কবি শেলির সূক্ষ্ম প্রভাব একটু থাকিতে পারে, ভাবনার দিক দিয়া।) এই কাব্যেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্ত্রবৎ এই কবিবাক্য আমরা প্রথম শুনিলাম (রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম নয় কি?) —

মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।

এ তো শুধু শ্রোতাকে শুনানো অথবা বুঝানো নয়, কবি রবীন্দ্রনাথের

নিজেকে শুনাইবার ও বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল আরো বেশি। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য 'প্রকৃতির কবি' এ কথা ঠিকই, তবু 'মানুষের কবি' না হইলে কেহ কি সার্থক হইতে পারে? আভূমিআকাশ তৃণে তৃণে তারায় তারায় নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া নিগূঢ় গভীর গম্ভীর চেতনায় শিহরিত-পুলকিত বা শান্ত-স্তব্ধ হইয়া ওঠার অপরিসীম এক সার্থকতা থাকিলেও, উহাই তো মানুষ কবির সাধনা ও সিদ্ধির শেষ নয়। এজন্যই বলিতে হয় : মানুষের মন চায় মানুষেরই মন। সেই মনে-মনে জীবনে-জীবনে দান-প্রতিদান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে আদিম রস উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত প্রবাহিত হইতে থাকে তাহারই নাম 'করুণা'।

কবির পরিণত বয়সের একটি গানে আছে : কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে! এই সুরই বাজিয়া ওঠে 'মায়ার খেলা'র সূচনায়। মায়া কুহেলিকার বাধা! তাই, 'জানি তারে আমি তবু তারে নাহি জানি যে!' ঠিক এই কারণেই কবিকাহিনীর তরুণ কবি প্রিয়তমা নলিনীকে ত্যাগ করিয়া দেশে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে গেল অ-ধরার উদ্দেশে, না-পাওয়ার অপরিতৃপ্ত তৃষায়। কিন্তু সে তো ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে কখনো আসিবার নয়, অথবা আসিলেও কে তাহাকে চিনিতে পারে? অতিনৈকট্যের অবগুণ্ঠন কে পারে উন্মোচন করিতে? তাই তো ভুবনভ্রমণের শেষে একদিন কবিকে ফিরিয়া আসিতেই হয়। নলিনী বহু দিন বহু বৎসর ধরিয়া কবির আশাপথ চাহিয়াই বসিয়া ছিল সত্য কিন্তু কবি যখন ফিরিল তখন সে নাই। ইহাই স্থূল (আসলে সূক্ষ্ম) কাহিনী। কিন্তু এখানেই শেষ হইল না।

প্রিয়বিরহী কবি যৌবন হইতে প্রৌঢ় বয়সে এবং প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্ধক্যে এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে, লোকালয় হইতে বহু দূরে হিমাদ্রি-শিখরে বাস করিলেন। নিখিল মানবের ভূত ভবিষ্যৎ, প্রত্যক্ষ বাস্তব এবং স্বর্গকল্পনা, সবই যেন তিনি চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে এমন হইল — সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল

বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!

যথা সে হিমাদ্রি হতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্বরা
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণাসিন্ধু পড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়। মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হয়ে পৃথিবীর দুখে,
ব্যাধশরে নিপতিত পাখির মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন। ···

বিশাল ধবল জটা, বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি, গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হ'ত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃদেব। ···

সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে ···
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন। ···
আনন্দে গাইত কবি সুখের সঙ্গীত।
দেখিতে পেয়েছে যেন স্বর্গের কিরণ,
শুনিতে পেয়েছে যেন দূর স্বর্গ হতে
নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান। ···
একদিন হিমাদ্রির নিশীথবায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস। ···
সমাধি-উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল!

কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

এই-যে নিসর্গনিলীন অনৈসর্গিক কবি- চিত্র বা চরিত্র-- আদিকবি বাল্মীকির সত্তা আর কবি রবীন্দ্রনাথের ভূত ভবিষ্যৎ মিলাইয়া ইহার রচনা। ইহা বাস্তব নয়, অথচ সত্য। সেই নিগূঢ় সত্যটি রবীন্দ্রনাথের আশি বৎসরের জীবনে ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হইয়াছে, শরীর ধারণ করিয়াছে। ইহার সার-কথাই যেন— 'করুণা'। আসলে যে 'করুণার উৎসমুখে' বাল্মীকির আদিঅনুভূতি আদিশ্লোকে উৎসারিত হয় এবং 'ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি' দেবর্ষি নারদকে তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পাঠাইয়া দেন, সে কাহিনীটুকু রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র শুনাইয়াছেন এবং তাহার আগে বাল্মীকিপ্রতিভাতেও সাকার করিয়াছেন। 'কবিকাহিনী' কাঁচা লেখা হইলেও, কবি ও রসিক একযোগে ইহাকে 'অচলিত' আখ্যা দিয়া এক ধারে সরাইয়া রাখিলেও, ইহাতে যেন রবীন্দ্র-প্রতিভার / রবীন্দ্র-কবিসত্তার সারমর্ম জানা যাইতেছে, একটি কল্পরূপ আভাসিত হইয়া উঠিতেছে — এটুকুই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'করুণা' আখ্যায়িকাটি কাব্য নহে, এমন-কি 'ভিখারিনী'র ন্যায় কল্পকাহিনীও নয়। ইহা বাস্তব জীবনেরই একখানি মুকুর। দূর দেশে কালে বা কল্পনায় নয়— নিকটের সংসারে দৈনন্দিন ঘটনায় কবির যাহা জানা আছে, চেনা আছে, তাহারই বিবরণ গাঁথিয়া তুলিবার এই প্রাথমিক উদ্যম। 'তরুণ গরুড়-সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ' যে কবিকল্পনাকে পীড়ন করিতেছে সে যেন অবাস্তবের ঊর্ধ্ব আকাশে আকাশে অশান্ত পক্ষবিধূননে ক্লান্ত হইয়াছে ; কোথাও নামিয়া বসিতে চায়। কে তাহাকে আশ্রয় দিবে আজ কে তাহার ভর সহিবে ? এই বাস্তবসংসারই ; নিখিল জীবের যে আশ্রয় ; নিখিল জীবন, বিশেষতঃ মনুষ্যজীবন সমন্বিত করিয়া যাহার গঠন। নহিলে যুগোচিত মহতী কবিপ্রতিভা তো সার্থক হইতে পারে না। 'করুণা' তাই তরুণ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস-রচনার প্রয়াস, প্রথম চরিত্র-সৃষ্টির সফলতা। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশক্রমে ইহার তাৎপর্য, সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ইহার স্থান, এগুলি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনার বিষয়।

সে আলোচনার উপক্রমেই হঠাৎ একটা কথায় হুঁচোট খাইতে হয়, যে, 'করুণা' অসম্পূর্ণ উপন্যাস।[৫] অমূলক এই কিম্বদন্তী কিভাবে কেন প্রচারিত হইল সেটি তো অনুসন্ধান করিতে হয়। রবীন্দ্রউক্তিতে এরূপ কোনো ঘোষণা কোথাও আছে কি? থাকিলে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অথবা শ্রীসজনীকান্ত দাসের রচনায় আমরা তাহার কোনো হদিশ পাই না কেন? যেহেতু 'করুণা' বড়ো একটা কেহ পড়ে নাই, অল্পকাল পূর্বে পড়িবার তেমন সুযোগও ছিল না, এই সিদ্ধান্ত যদিবা অমূলক হইয়া থাকে, ইহার সত্যতা সম্পর্কে অধিকাংশের মনে (কাহারও মনে?) এপর্যন্ত কোনো সন্দেহই জাগে নাই। তাহাই তো স্বাভাবিক। প্রবীণ প্রশান্তচন্দ্র বা প্রভাতকুমার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সজনীকান্ত, আমাদের অপরিজ্ঞাত বিষয়ে একবাক্যে যাহা বলিয়াছেন (আসলে হয়তো একের বাক্য অন্যে আবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র) তাহা না মানিব কেন? সংশয় তখনি মনে জাগে যখন আদ্যন্ত রচনার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। কেন, অতঃপর তাহাই বলিতেছি।

'করুণা' সম্পর্কে কবির মনে কিঞ্চিৎ করুণা বহু বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল মনে হয়। নহিলে 'করুণা'র ধারানিবদ্ধ প্রচারের ছয় বৎসর পরে তিনি ১২৮৪-৮৫ সনের ভারতী পাঠাইয়া দিয়া সেকালের প্রবীণ ও সহৃদয় সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুর অভিমত জানিতে চাহিবেন কেন?[৬] ছয় বৎসর পরে 'অসম্পূর্ণ রচনাটি সম্পূর্ণ করিব কি না' ইহা জানিতে চাওয়ার পরিবর্তে, সম্পূর্ণ রচনাটি প্রকাশের উপযুক্ত কি না ইহা জানিতে চাওয়াই সংগত ও স্বাভাবিক। কেননা, বিশেষ কারণ না থাকিলে, রবীন্দ্রনাথের মতো সদা-সক্রিয়-সচল প্রতিভায় পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকানোর অবকাশ প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি অল্পই থাকিবার কথা, অথবা থাকে না

বলিলেও চলে।[৭] রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভাকে 'কারয়িত্রী' না বলিয়া 'সৃজয়িত্রী' বলিলেই তাহার যথার্থ স্বরূপপরিচয় দেওয়া হয়—ইহাতে ছিন্ন সূত্রে জোড়া লাগানো চলে না, অসম্পূর্ণ অট্টালিকা বহুদিন পরে পুনর্বার ইঁট পাথর গাঁথিয়া সম্পূর্ণ করার সম্ভাবনা থাকে না— অর্থাৎ, এরূপ প্রতিভাপ্রেরিত রূপসৃষ্টি 'জৈব', 'জড়ীয়' নয়। এজন্যই সম্পূর্ণ অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এই রচনা সম্পর্কে সমালোচক বন্ধু কী বলেন, একমাত্র ইহা জানিতেই রবীন্দ্রনাথের মাথাব্যথা হইতে পারে; ছয় বৎসর পরে দুই খণ্ড বাঁধানো ভারতী পাঠাইয়া বা হাতে দিয়া কেবল এক অসম্পূর্ণ রচনা সম্বন্ধে মতামত জানিতে চান, এরূপ ভাবিতে গেলে বড়ো বেশি কষ্টকল্পনা করিতে হয়। চন্দ্রনাথবাবু যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে দোষদর্শনের তুলনায় প্রশংসাই বেশি। এমন-কি, 'সামান্য একটা উপন্যাস' এজাতীয় বস্তুপরিচয় যদি আরম্ভেই (আদ্যন্ত রচনা না পড়িয়া) আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়া থাকে, তবে উহাকে পক্ষপাত অথবা অহেতু ভাবোচ্ছ্বাসও মনে হইতে পারে।

চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনায় নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসার ভাগই যদি বেশি থাকে, তবে 'করুণা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল না কেন? প্রচুর প্রশংসা থাকিলেও, যেটুকু দোষ দেখাইয়াছেন সমালোচক, তাহাতেই রবীন্দ্রনাথ এই রচনা সম্পর্কে স্বাভাবিক মোহ ত্যাগ করিয়াছেন মনে হয়। কেননা, চন্দ্রনাথ বলেন, 'করুণাকে আমি ঠিক বুঝিয়াছি কি না বলিতে পারি না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে, করুণা কেবল একটি কল্পনা মাত্র— মানবচরিত্র নয়; রজনী প্রকৃত মানবচরিত্র।' অথচ করুণা-যে কবিমনের সকল মমতা দিয়া সৃষ্ট। এখানে 'মম-তা' শব্দের ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ অর্থই গ্রহণযোগ্য; অর্থাৎ, করুণায় কবির আপন সত্তা, স্বকীয় স্বভাব বা চরিত্র, বিশেষভাবে নিহিত। মনে হয় এ উপাখ্যানে করুণা চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়। সেটি যদি চন্দ্রনাথের ন্যায় অনুকূল সুধীজনেরও গ্রাহ্য না হয়, তবে আর গ্রন্থপ্রকাশ কিজন্য? কাহার জন্য? দ্বিধা তো ছিলই; চন্দ্রনাথ বসুর উক্ত অভিমত

জানিবার পর, এ লেখা যে তেমন সার্থক হয় নাই ইহাই রবীন্দ্রনাথ স্থির বুঝিলেন। ইতিমধ্যে 'বউঠাকুরানীর হাট' ভারতী মাসিক পত্রে (১২৮৮ কার্তিক — ১২৮৯ আশ্বিন) ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ; তাহাতে অতীতকালের একটি পটভূমি থাকিলেও বাস্তবের ডাঙা পায়ে ঠেকিয়াছে, এমন-কি বসন্তরায়ের ভিতরে শ্রীকণ্ঠসিংহের ন্যায় প্রাণবন্ত পরিচিত ব্যক্তির স্বরূপপরিচয় বা চরিত্র ঠিকমত ধরা পড়িয়াছে। অতএব, নব নব প্রয়াসে নিযুক্ত থাকাই ভালো ; পুরাতন রচনার নবকলেবর দিতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র। সবটা নূতন করিয়া লিখিতে পারিলে হয়তো ভালো হইত কিন্তু সে সময় ও প্রবৃত্তি নাই।

করুণার চরিত্রে কবিউপাদান কবিসত্তা অনেকটাই আছে। যদি ইহা সফল হইত, তেমন করিয়া প্রত্যক্ষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিত, আরেক কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হইতাম না কি ? 'কপাল-কুণ্ডলা' বলিতে, কোনো বদ্ধমূল সংস্কার যাহাকে বাঁধে নাই, বাঁধিতে পারে না ; যে আছে আপনার জন্মার্জিত স্বভাবে ; হাঁসের পাখায় জল লাগে না আর তেমনি স্বভাবের সহিত না মিলিলে আরোপিত কোনো ভাবভঙ্গী যে গ্রহণ করে না ; ফলতঃ, স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্তিই যার বিশেষ চরিত্রলক্ষণ। বলা চলে, কপালকুণ্ডলা ইহার বেশি বা কম নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো বঙ্কিমেরও ছিল কবিমন এবং কবিদৃষ্টি। প্রতিভার সময়োচিত পরিণতিবশতঃ (বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ছাব্বিশ) কপাল-কুণ্ডলা অব্যর্থ রেখাপাতে ও বর্ণসমাবেশে যেভাবে পরিস্ফুট— সংসার-অনভিজ্ঞ ষোড়শবর্ষীয় যুবার রচনায়, প্রতিভা যতই থাক্, ততটা আশা করা যায় না। অথচ, করুণা যদিবা অপরিস্ফুট চরিত্রাঙ্কন হইয়া থাকে, সৌন্দর্যের অভাব তাহাতে নাই, রবীন্দ্র- স্বভাবের ও অনুভাবের বৈশিষ্ট্য-গুলিও পরিষ্কার ধারণা করা যায়— সরাসরি অবাস্তব বলিয়া রায় দিতে তো পারি না। তাই করুণার অচিরজীবনের বিষাদকরুণ পরিণামে আমাদের একটু বেদনাবোধ হয় বৈকি, চোখের পাতাও ভিজিয়া ওঠে, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। এ বিষয়ে চন্দ্রনাথের ন্যায় সহৃদয়

পাঠকের সঙ্গেও আমাদের অভিজ্ঞতার মিল হইল না।

যাক্ সে কথা। 'করুণা' উপন্যাস অসম্পূর্ণ কেন নয় ইহাই বিচার্য বিষয়। প্রকরণবিচারে বলা যাইতে পারে— এই রচনাটি ত্রিবেণীবিশেষ অথবা তিন-বিনুনির একটি যেন খোঁপা। নরেন্দ্র-করুণা, মহেন্দ্র-রজনী, সার্বভৌম-কাত্যায়নী এই দম্পতিত্রয়ের কাহিনী। বলা বাহুল্য নরেন্দ্র-করুণাই মূলধারা বা মূলাধার, মহেন্দ্র-রজনীর গৌরবও অল্প নয় আর পণ্ডিত-মহাশয় ও তাঁর দ্বিতীয়পক্ষ (সেই সঙ্গে আছে অমূল্য 'নিধি', সবজান্তা, সকল-কর্মা, সর্বঘটের কাঁঠালি কলাও যাকে বলা চলে)— তা, স-নিধি-কাত্যায়নী সদাশিবতুল্য সার্বভৌম পণ্ডিত-মহাশয় মূল গল্পের পরিপোষক চরিত্র এবং হাস্যরসসৃষ্টিতে ইহার বা ইহাদের উপযোগিতা প্রচুর। মানুষ যে শুধুই কাঁদিতে চায় না— বিয়োগান্ত নাটক দেখিতে আসিয়াও বিদূষকের বাগাড়ম্বর ও বিফল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে চায়, ক্রুর শয়তানের হাতে প্রেমপ্রতিমা সরলা সুকুমারীর লাঞ্ছনার পাশে পাশে কোনো নিষ্কল নিষ্ফল ভালোমানুষির চিত্র বা চরিত্র দেখিলে খুশি হয়, এ কথা তরুণ রবীন্দ্রনাথও ভালোভাবে জানিতেন মনে হয়। এই-যে ত্রিধারা বা তিনটি বিনুনি এই গল্পের একত্রে সব কি দিব্য মিলিয়া মিশিয়া চলে নাই? না, তাহা তো বলিতে পারি না। কোনো ধারাই কি অর্ধপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা অবসিত হইয়াছে? তাহাও নয়। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা সুখান্বেষিণী কাত্যায়নীদেবীকে ভালোমানুষ পণ্ডিত-মহাশয় গার্হস্থ্য-শৃঙ্খলে কতদিন আর বাঁধিয়া রাখিবেন, সুযোগ পাইয়া তিনি নিজের পথ নিজে দেখিয়াছেন। বিরহকাতর উদ্‌ভ্রান্ত গৃহস্থ তাহার সন্ধানে নাস্তানাবুদ হইয়া, স্নেহপাত্রী করুণারও অতর্কিত দুর্ভাগ্যহেতু বিহ্বল বিরক্ত হইয়া, শেষ জীবন তীর্থে কাটাইতেই চলিয়াছিলেন— এমন সময় করুণাকে পাইয়াও 'নিধি'র প্ররোচনায় একবার তাহাকে ত্যাগ করিলেও আবার তাহারই নিগূঢ় আকর্ষণে করুণার শেষ শয্যাপার্শ্বে না আসিয়া পারেন নাই। স্বভাবসজ্জন মহেন্দ্র পরিণয় ব্যাপারে প্রথমেই আশাভঙ্গ-হেতু, পরে দুর্জনসঙ্গে, উত্তরোত্তর বিপথে চলিয়া গিয়াছিল। বিশেষ ঘটনায়

যার-পর-নাই লজ্জিত অনুতপ্ত ও মর্মাহত হইয়া, স্বেচ্ছাবৃত অজ্ঞাতবাসে ধীরে ধীরে আপন স্বভাবে ফিরিয়ে আসিয়া, প্রেমময়ী সেবাময়ী পত্নীর প্রেম ও স্নেহের স্বরূপ সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে ক্রমশ অন্তরে আবিষ্কার করিয়া, অবশেষে তাহারই অলক্ষ্য প্রেমের আকর্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে, স্বভাবে স্বধর্মেই ফিরিয়াছে —ইহাও অসংগত কিছুই নয়। আর, নরেন্দ্রের সংশোধন হয়তো শিবেরও অসাধ্য, কবি কী করিবেন আর তাঁহার আদরের আত্মজা করুণাই বা কী করিতে পারে! নিষ্করুণ ব্যর্থতার অভিশাপে বারে বারে আর তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার পর অবশেষে অভাগিনী জীবনের অন্তিম সীমায় পৌঁছিয়াছে। তাহার স্বভাবমাধুর্যে যাহারা পর হইয়াও তাহার একান্ত আপন, নির্বাক্ নিরুপায় হইয়া মুমূর্ষুর শয্যাটি ঘিরিয়া বসিয়াছে— আর তো বলিবার কিম্বা করিবার কিছুই নাই। করুণ সমাপ্তির সেই ছবিটি কিরূপ, পাঠক একটু লক্ষ্য করিয়া দেখুন—

'করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে। শিয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর, পণ্ডিত-মহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন তাঁহার চক্ষু লাল [মদ্যপানে][৮], মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধিপ্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যাপার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল কিন্তু কিছু কহিল না।'

'করুণা' উপন্যাস এখানেই শেষ হইল। আনুপূর্বিক আখ্যান কেহ যদি পড়িয়া থাকেন, তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় না, শেষ রোগশয্যায় শুইয়া যে নরেন্দ্রকে করুণা এতদিন ভুলিয়াও কাছে ডাকে নাই, হিন্দুনারীর সুচির-সংস্কার-বশে অথবা দৃঢ়মূল প্রথম প্রণয়ের অন্তিম উদ্‌যাপনে সেই নরেন্দ্রকেই দেখিতে চাহিল— আর তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল

না, হয়তো প্রয়োজনও ছিল না— শুধু কম্পিতহস্তে স্বামীর হাতখানি ধরিল। তাহার পরেই, রবীন্দ্রনাথ সেকালের রচনাশৈলীর অনুসরণে আরেকটু পটু বা প্রয়াসী হইলে অবশ্যই লিখিতেন, 'শেষ নিশ্বাস পড়িল, অকালে অভাগী করুণার জীবনদীপ নিভিয়া গেল।' তাহা লেখেন নাই বলিয়াই করুণ পরিণাম সম্পর্কে বা গল্পের সমাপ্তি সম্বন্ধে কিছু যে সংশয় আছে তাহা বলিতে পারি না। সেকালে বেশ একটি প্রথাও ছিল, ইংরেজি বা বাংলা প্রায় সকল গ্রন্থের শেষে লেখা হইত— FINIS বা সম্পূর্ণ। সাময়িক পত্রে সে পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত না হওয়ায় বা রবীন্দ্রনাথ তাহার সুযোগ না লওয়ায় তর্ক উঠিতে পারে বৈকি, তর্কের কোনো শেষ নাই। তবে আমাদের মনে হয়, তরুণ লেখক যে-কয়টি ঘটনাধারার অনুসরণে চলিয়াছিলেন সেগুলি সম্পর্কে আর তাঁহার বক্তব্য কিছু ছিল না; টানিয়া-বুনিয়া গল্প আরো বিলম্বিত করিবার কোনো কারণ ছিল বলা যায় না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ভারতীতে প্রচার হইতে না হইতে হঠাৎ তিনি বিলাতে চলিয়া গেলেন, লেখায় বাধা পড়িল, এজন্যই শেষ হইল না— ইহা মনে করিবার কোনো উপলক্ষ্য নাই। ঐ সময়ে বিলাত যাওয়ার বিবরণ জানা না থাকিলে, ঐরূপ একটা হেতু অবশ্যই আমরা অনুমান বা উদ্ভাবন করিতাম না।

আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে 'করুণা অসম্পূর্ণ নয়' এরূপ মনে করিবার এগুলিই মুখ্য হেতু। আরো একটা যুক্তি বা হেতু আমাদের মনে আসে সত্য, ইচ্ছা করিলে কিম্বা বোধবিদিত হইলে পাঠক সেটিকেই মুখ্যাতিমুখ্য মনে করিলেও আশ্চর্য হইব না। কী সেই হেতু খুলিয়া বলা যাক্। —

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ বলেন, মায়াবাদীর কাছে বিশ্বসৃষ্টি মিথ্যা মনে হইলেও সেটিই তত্ত্বচিন্তার বা সত্যদর্শনের শেষ-কথা নয়। পরব্রহ্মের চিৎশক্তিরূপিণী মহামায়া চারিটি স্বরূপে বিরাজমানা; চারি ভাবে ইহাকে পূর্ণসত্যের, পূর্ণচেতনার, পূর্ণআনন্দের সোপানে সোপানে

ক্রমশই পরিপূর্ণ দেবত্বের বা ভগবত্তার অভিমুখে লইয়া চলিয়াছেন। মহাদেবীর সেই চারিটি রূপ বা স্বরূপ হইল মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। অপরিসীম প্রজ্ঞা ও করুণা, অনিবার্য বেগ ও শক্তি, অলৌকিক শ্রী ও সুধা, অশেষ অক্লান্ত যত্ন ও নৈপুণ্য —এই চতুর্বিধ স্বভাবে ইঁহারা এ বিশ্বের কল্যাণসাধন করেন ; প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, আভাসে দেখা দিয়া বা প্রকট হইয়া, জীবকে বিশেষতঃ চেতনোন্মুখ মানবস্বভাবকে চালনা করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্র-প্রতিভার সামগ্রিক ধ্যান ধারণা হইতে এরূপই আমাদের মনে হয় যে, মহালক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি যেমন জন্মাবধি লাভ করিয়াছেন, মহেশ্বরীও ক্রমশই আভাসে ইশারায় তাঁহাকে ঊর্ধ্বলোকে ডাকিয়া লইয়াছেন, বলবীর্য তপঃসাধনার সামর্থ্য লইয়া মহাকালীও যে অনুক্ষণ অন্তরে নাই এমন নয়, আর মহাসরস্বতীর সহিত তাঁহার পরিচয় নিগূঢ় নিবিড়। বারে বারে বিদ্যালয়পলাতক এই বালক, 'আকাশ ঘিরে জাল ফেলা আর তারা ধরা'র আগ্রহে উৎসুক এই চরিত্র, বিদ্যালয়ের বাহিরে আপনাকে গঠন করিতে, আপনা হইতে আপনার সৃষ্টিকে প্রকাশ করিতে, যত্ন বা সাধনা কিছু কম করেন নাই— উত্তরকালে জটিল বিষয়কর্মের খুঁটিনাটিতেও মনঃসংযোগ করিতে হইয়াছে। চরম দুঃখ-শোকের দিনেও কোনো বিহিত কর্মে কোনোরূপ শৈথিল্য দেখান নাই, কিছুই অসম্পূর্ণ অসুন্দর রাখেন নাই— ক্লান্তিকে ক্লান্তি আর সাময়িক অবসাদকে শেষ পরাভব বলিয়া কখনোই স্বীকার করিয়া লন নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিকর্মেও তাঁহার এই স্বভাবের শীল-মোহর বা ছাপ সতত দেখিতে পাই। এমন লেখক বা কবি আছেন যাঁহার সব লেখা সমাপ্ত হয় না, সব স্বপ্ন বাঙ্ময় রূপে প্রত্যক্ষ হয় না, অনেক অপূর্ণতা ও অসৌষম্যের অবকাশ প্রায়ই থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রপ্রতিভা যে সে জাতের নয় ইহা কি বলিয়া দিতে হইবে? শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদৃষ্টিতে যিনি মহালক্ষ্মী আর মহাসরস্বতী, একই, দুই নহে, তাঁহার প্রসাদ সম্বল করিয়াই রবীন্দ্রজীবনের সূচনা ও শেষ। (পূর্বেই বলিয়াছি মহেশ্বরী

মহাকালীর প্রসাদও আছে ঈষৎ অন্তরালে। না থাকিয়া পারে না। আসলে একই তো মহামায়া— মহাদেবী— দুই তিন বা চার নয়।)

বিশেষ কারণ না থাকিলে (হঠাৎ বিলাত চলিয়া যাওয়া এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন বা বাধা নয়), দীর্ঘকালের একটি সাধনাকে তিনি অসিদ্ধ রাখিয়া দিবেন, ভুলিবেন বা পরিহার করিবেন, ইহা মনে করা যায় না। বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল শেষ বয়সে অস্বাস্থ্য আর বার্ধক্য-হেতু আর সাহিত্যসৃষ্টির বহির্ভূত নানা গুরু অথবা গুরুতর কর্মের চাপে— তাই 'তিন-পুরুষ' বা 'যোগাযোগ' সম্পূর্ণ হয় নাই। (ঠিক-ঠিক এক-পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে।) না হইলেও, পরিণত কবিপ্রতিভার গুণে তার অংশের ভিতরেই সমগ্রতার ব্যঞ্জনা আছে— পূর্ণতার আস্বাদন অসম্ভব নহে। কাহিনী সম্পূর্ণ নয় সে কথা কে বা স্মরণ করিবে! কাহার ধারণায় আসিবে! 'যোগাযোগ' তবু অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হইলে বোধ করি এটিই রবীন্দ্রনাথের উন্নততম মহত্তম কীর্তি হইতে পারিত।

'করুণা' সম্পূর্ণ। কবির বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। সাংসারিক অভিজ্ঞতার বৃত্তে প্রথম রেখাপাত হইতেছে শুধু, পরিপূর্ণতা অনেক দূরে। তাই 'করুণা' কাঁচা লেখা তাহা মানিব। ভাবোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি বহু স্থলে আছে, মানিব। ব্যঞ্জনা অল্প, ব্যাখ্যা বেশি, তাই বা স্বীকার করিব না কেন?[১] বহু চরিত্রই বর্ণিত হইয়াছে, ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ হয় নাই বা প্রকাশ পায় নাই ইহাও সত্য। কিন্তু সব-শেষে এ কথা তো বলিতেই হয়, **এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস; ইহার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ সংসারে পরিচিত নরনারীর বাস্তব জীবন।** রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যস্রষ্টা শিল্পী, স্বভাববিমুগ্ধ কবি, অন্তর্দর্শী ভাবুক, কেবল কথক নন, তাঁহার এ পরিচয়ও এ রচনার সর্বত্র পাওয়া যায়। ইহাতে কবি-কথক বঙ্কিমের ছায়াপাত আছে সত্য, সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত-ইশারাও পরিস্ফুট।

'কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি আঁধার-আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে-সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি-দুইটি শীর্ণকায় চঞ্চল ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটীরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলট-পালট করিয়া, নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী নিস্তরঙ্গ সরসী—লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈল-লক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘন-বৃক্ষবেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। দূরে দূরে হরিৎশস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউকথাকও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।' —

প্রথমেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়া এইভাবে 'ভিখারিনী' গল্পের সূচনা। ইহা যে কবির লেখা কবিত্বপূর্ণ কাহিনী, দৃষ্টিপাত-মাত্রে বুঝিয়া লইতে কাহারো অসুবিধা হয় না। আজকাল গল্পের মাঝখান হইতে, কদাচিৎ শেষ হইতে (যেমন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে), গল্প বলা শুরু হয়। বঙ্কিম গল্পের অর্থাৎ ঘটনার প্রস্থান-ভূমি হইতেই গল্প বলিতেন ; তাহাতেও এক-এক সময় চমৎকার-সৃজন অল্প হইত না। যেমন 'ও পি— ও পিপি— ও প্রফুল্ল— ও পোড়ার-মুখি' এইভাবে দেবীচৌধুরাণীর নাটকীয় সূচনা। কিন্তু সচরাচর তিনি গল্পের অন্তর্গত প্রধান কোনো পাত্র বা পাত্রীর ক্রিয়ার বর্ণনা দিয়া গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন। 'ভিখারিনী'র সূচনা নাটকীয় কথোপকথনে নয়, নায়ক বা নায়িকার কোনো ভাব কিম্বা কোনো ক্রিয়ার বর্ণনায় নয়,

পরন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়া— যে বর্ণনায় আলেখ্যলিখন ও কবিত্ব দু'ই আছে এবং ভাষায় আছে শ্রুতিমধুর পদাবলীর সঙ্গীত-মর্মর। তাই বলি এই গল্প কবির লেখা— ইহা একখানি গদ্যে রচিত কাব্য ছাড়া আর-কিছু নয়। দূরপরিদৃষ্ট অথবা অনুমানগম্য দেশ-কালে কল্পনার রঙে রেখায় অঙ্কিত একখানি কারুণ্যপূর্ণ চিত্র। ইহাতে ভাব আছে, বাস্তবতা তেমন নাই।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, গল্প লেখার প্রথম উদ্যমে গদ্যকাব্য লিখিয়া বসিলেও, ইহার পরেই ষোড়শবর্ষীয় যুবা চেষ্টা করিয়াছেন ঠিক-ঠিক গল্প বলিতে, অর্থাৎ পরিচিত পরিজ্ঞাত লোকালয়ের কতক-গুলি নরনারীর বাস্তব জীবনের ঘটনাধারা অনুসরণ করিতে। এমন-কি, বঙ্কিমের ন্যায় প্রথমেই দূরবর্তী কোনো অতীতে বা ঐতিহাসিক ঘটনায় গল্পের আশ্রয় বা আধার খোঁজেন নাই। দেশকাল পাত্রপাত্রী ও ঘটনা সকলই লেখকের তথা পাঠকের একেবারে সন্নিহিত। গল্প আরম্ভ হয় নায়িকা করুণার পিতৃপরিচয়ে আর তার পরেই করুণার আবাল্যের প্রকৃতি-বর্ণনায় —

সঙ্গিনী অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিনরাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখি ছিল, সেই পাখিটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালির পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক-একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী ভগ্নী কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য-সত্যই সেইরূপ যত্ন করিত, তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানাপ্রকার আদর করিত এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে, অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা-কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখিটিকে তাহাই শুনানো হইত। এইরূপে করুণা

তাহার জীবনের প্রত্যুষকাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে। /

কিন্তু তাহা যে কাটে নাই বা কাটিতে পারে না, নবীন অথচ প্রাজ্ঞ গল্পকারের তাহাই বলা উদ্দেশ্য এবং কেন যে অন্যরূপ হয়, কিভাবে নির্মম নিষ্ঠুর নিয়তি অকালে শিশিরসজল শুভ্র সুন্দর সুরভি এই ফুলটি পিষিয়া মারে, তাহার বর্ণনাই এই গল্প বা উপন্যাস।

চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় অনেকেই ভাবিতে পারেন এরূপ বালিকা এ সংসারে কোথায়, বুঝি ইহার কোনো বাস্তবতাই নাই। অথচ ইহাই গড়পড়তা মনুষ্যচরিত্র না হইলেও, এরূপ আমরা কখনো দেখি নাই, শুনি নাই, এমন বলিতে পারি না। ঠিক এমন স্বভাবই কদাচিৎ আমরা সপ্ততিবর্ষীয়া বৃদ্ধাতেও দেখিয়াছি; 'বৃদ্ধা'ও বলা চলে না, পাঁচ-সাত বৎসর বয়স হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহার বালিকা-সুলভ কল্পনাপ্রবণতা, হর্ষোৎফুল্ল ভাব, আত্মপর-ভেদজ্ঞানের অভাব, এই 'দোষ' বা গুণ -গুলি কখনোই ঘোচে নাই। যে কবির কল্পনা এই করুণা বালিকাটি, তাঁরই বা আবাল্য প্রকৃতিটি কিরূপ? শুধু কথা এই যে, সংসার ইহাদের বিশ্বাস করে না; আঘাতের পর আঘাত দেয় এবং আশ্রয় কাড়িয়া লয়। বলে— 'এরূপ পেলবসুন্দর সৌকুমার্যের এখানে স্থান নাই— এ সংসার মানুষ পশু ও শয়তানের লীলাভূমি, দুয়েকটা দেবচরিত্রকেও মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হয় বটে— বিষপাত্র মুখে তুলিয়া দিবার অথবা ক্রুশে বিদ্ধ করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় না— এখানে অপ্সর বা গন্ধর্ব -স্বভাব এমন অপরূপ কিছুরই স্থান থাকিতে পারে না যাহাতে আছে শুধুই সৌন্দর্য এবং মাধুরী।' সত্যই। আর, তাই দেখিতে পাই, দেবলোক বা অপ্সরলোক -ভ্রষ্ট এরূপ সত্তার এ সংসারে টিকিয়া থাকিতে হইলে, কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রসার দৃঢ়তা, হৃদয়াবেগের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, অধীর উচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে অবিচল বিচার-বিবেচনা, নিজেকে বিলাইয়া দিবার প্রবৃত্তির সঙ্গেই

নিজেকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা —এই গুণগুলি না হইলে চলে না। দুঃখের বিষয় করুণাতে দৃঢ়তা মনীষা বিচারবিবেচনা কিম্বা আত্মস্থতার শক্তি নাই বলিতে হয়। না থাকিলে কিরূপ হয়, এটি দেখানোই হয়তো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল— নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। পরমসুন্দর সুকুমার কোমল করুণ হইয়াও, যে স্বাভাবিক শক্তির বলে কোনো জীবৎসত্তা এই জড়ধর্মী স্থূল-প্রবৃত্তি-ও-কামনা-ময় সংসারে সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া এক অপূর্ব উন্নত মহিমায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, করুণা-চরিত্রে তাহার একান্ত অভাব দেখিতে পাই। এই বালিকার অচির জীবনের তাই এমন করুণ পরিণাম। অপর পক্ষে করুণার যিনি কবি ও স্রষ্টা, অপরিমেয় আত্মশক্তি ও মনীষার কারণে তাঁহার সুমহৎ জীবনের অন্য পরিণতি। গড়-পড়তা বিচার-বিবেচনায় যেমন করুণার তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনেরও হিসাব মিলিবে না, সহজ সরল ব্যাখ্যা সম্ভব হইবে না। একটি কবিকল্পনা, অন্যটি বিধাতৃসৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ —এইমাত্র প্রভেদ। আন্তরিক বা মূলগত স্বভাব স্বধর্ম একই।

কবিকল্পনা যে আদৌ প্রত্যক্ষ হয় নাই, এমন আমাদের মনে হয় না। তরুণ রবীন্দ্রের অপূর্ব মমতাযোগে ইহার সৃষ্টি ; ইহাকে মিথ্যা বা মায়িক বলিতে পারি না। করুণাকে কোথায় দেখিলেন, কোথায় খুঁজিয়া পাইলেন রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের জবাব শুধু এই : বাহিরে কোথাও যদি না'ই দেখিয়া থাকেন (দেখেন নাই ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি না)— আপনাতে, আপন স্বভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

'করুণা'র অন্যান্য চরিত্র এবং ঘটনা হয়তো অশেষ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাবৃত্তির গুণে, দর্শন শ্রবণ মনন হইতে, কল্পনা ও অনুমান হইতে, ভূরিপরিমাণ অধ্যয়ন হইতে, পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে— মানবজীবনের নানা স্তরের, নানা অবস্থার, সে-পরিমাণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়তো ছিল না। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব অপূর্ব প্রতিভার গুণে সহজে ধরা পড়িবার কথা নয়। বিশেষতঃ বাংলা

সাহিত্যের সেই শৈশব বা কৈশোর-সময়ে। কথক ও চরিত্রস্রষ্টা হিসাবে বঙ্কিমের তুলনা নাই এ কথা সত্য; তাহার বাহিরে অধিকাংশ যশোলিপ্সু লেখক সেদিন যাহা লিখিতেন তাহাকে হয়তো 'রীতিমত নবেল' বা 'রীতিমত নাটক' বলাই সংগত।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে-কোনো বই বাহির হইত, আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না। ··· এই-সব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি; প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা "করুণা" নামক গল্প তাহার নমুনা।'[১০]

কোন্ বয়সের রচনা যদি ইহা না জানিতাম তবু আমাদের মানিতে হইত— সাংসারিক জীবনের নিবিড় গভীর এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এ গল্প লেখা হয় নাই। জ্যাঠামি বা অকালপক্কতার অপবাদ অত্যুক্তি হইলেও— একমাত্র আত্মসমালোচনাতেই এরূপ অতিনিন্দা চলিতে পারে— লেখা যে কাঁচা এ কথা ঠিকই। তবু এই কাঁচা লেখাতেও গুণপনার অন্ত নাই। নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, স্বরূপচন্দ্র, পণ্ডিত-মহাশয়, করুণা, রজনী, মোহিনী, নিধি, গদাধর, মহেন্দ্রজননী, ডাক্তার, ঝি— নানা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে সুখদুঃখ-পাপপুণ্য-শুভাশুভ-খচিত মানবজীবনের আলোআঁধারি মায়ার সৃজনে তরুণ রবীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য অল্প নয়। চন্দ্রনাথবাবুও রজনী চরিত্রের বাস্তবতা স্বীকার করেন; পণ্ডিত-মহাশয়ের চরিত্রচিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে; হয়তো অভিজ্ঞতার অথবা উপযুক্ত কল্পনাশক্তির অভাব-বশতই তিনি করুণাকে বোঝেন নাই, ধারণা করিতে পারেন নাই। মানুষের নীচতা হীনতার, ক্লেদে ও পঙ্কে নিমজ্জিত দশার, যে চিত্র লিখিবার প্রয়াস দেখা যায় এই গ্রন্থে, সেরূপ চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সাহিত্যসাধনায় আর-কখনো করেন নাই বলিলেই হয়। কদাচিৎ, যেমন 'চতুরঙ্গ' গল্পে নবীনের বউয়ের আত্মহত্যা ব্যাপারে, মনুষ্যজীবনের অন্তরালে বা

নিম্নতলে এই প্রবৃত্তির নরকের চকিত আভাসমাত্র দেখিতে দিয়াছেন। কিন্তু নরেন্দ্রচরিত্রের বিকৃতি দেখাইতে যতটা পূতিগন্ধি গলিঘুঁজির মধ্যে তিনি আপন কল্পনাকে প্রেরণ করেন, এরূপ আর-কখনো ঘটে নাই। সে স্থলে আশ্রিতা বা আশ্রয়দাত্রী ঝি'র সহিত নরেন্দ্রের স্থূল কামনা-কলুষিত সম্পর্কটি বুঝিতে কাহারো কোনো অসুবিধা হয় না। শেষের দিকে মহেন্দ্রের হৃদয়দাক্ষিণ্য এবং করুণা সম্পর্কে তাহার বিশেষ স্নেহের সুযোগ লইয়া বস্তি হইতে নরেন্দ্র যখন নূতন বাসায় উঠিয়া আসিল, দেহে-মনে-পীড়িতা বালিকা করুণার সম্পূর্ণ আশাভঙ্গের ও মৃত্যুঘাত-গ্রহণের বাকি কিছু রহিল না, তখনো নরেন্দ্র আর ওই দাসীর নিত্যনৈমিত্তিক কলহের ছলে সুকৌশলে তাহাদের হৃদয়হীন হীন বুভুক্ষার পুরাতন পঙ্কিল সম্পর্কটি ভালোভাবেই লেখক আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। অপর পক্ষে মহেন্দ্র বা মোহিনী অবস্থাবিপাকে ও সঙ্গদোষে যদিবা সমাজনিন্দিত প্রবৃত্তির পথে পা বাড়াইয়াছিল, সময়ে তাহাদের চৈতন্য হইয়াছে; তাহারা স্বভাবনিহিত শক্তির বলেই আত্ম-সংশোধন ও আত্মসংযম করিয়াছে এবং বালবিধবা মোহিনীর ভাগ্যে সুখ না থাকিলেও— সেকালের সামাজিক বিধানে একমাত্র ত্যাগ ও তীর্থবাসেই তার ভাগ্যহত ইহজীবনের সার্থকতা— মহেন্দ্র ও রজনী পরিণামে সুখী হইয়াছে। শাশুড়ির সহিত পতিপরিত্যক্তা বধূর সম্পর্ক, রজনীর উদ্দেশে তাহার শাশুড়ির নিত্যনিয়মিত বাক্যযন্ত্রণাপ্রয়োগ, সকলই অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত। তাহাতে দরদ যেমন আছে তেমনি আছে কৌতুক— সবলের পক্ষে দুর্বলকে পীড়ন করিতে কেমন ছলের কখনো অভাব হয় না, কুযুক্তিই সুযুক্তি-রূপে জাহির করা যায় আর প্রসাদপ্রার্থিনী প্রতিবেশিনীরাও সকলেই কিভাবে শাশুড়ি-ননদের বধূগঞ্জনের কোরাসে যোগ দেন। শ্বশুর-শাশুড়ি দাস-দাসী স্বজন-পড়োশিনী নানা সম্পর্কে জড়িত-বিজড়িত সেকালের পরিবারে শান্ত-স্বভাবা মর্মাহতা 'বোবা' বধূটির চরিত্র-চিত্রণে কোথাও খুঁত নাই বলা চলে। আবার অনুতপ্ত স্বামী যখন ফিরিয়া আসেন, সকলের মধ্যেই

সে কী পরিবর্তন ! এতকালের অনাদৃতা অবহেলিতা বালিকারও সে কী জন্মান্তর এবং রূপান্তর !

লেখক যে শুধুই গ্রন্থঅধ্যয়নে বা কল্পনা হইতে এত-সব চরিত্র ও ঘটনা -বৈচিত্র্য, এমন নিখুঁত রূপ রাগ দুঃখ সুখ দরদ ও কৌতুক, ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন —ইহা বিশ্বাস করাও কঠিন বৈকি।

পণ্ডিত মহাশয়ের চরিত্র চন্দ্রনাথ বাবুর বিশেষভাবেই ভালো লাগিয়াছে। ইহার পরিপূরক রামনিধি-চরিত্র, তাহার সমুদয় আচার আচরণ চাতুর্য, তাহার সম্পর্কে পণ্ডিত মহাশয়ের একান্ত নির্ভরতা সর্ব-ক্ষেত্রে আর সব-সময় —এই আখ্যায়িকায় অল্প হাস্যরসের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু সেই হতবুদ্ধিভাব ও হাস্যকরতার ভূমিকাতেই পণ্ডিতের স্বভাব-সারল্য ও অন্তরের অকৃত্রিম ঔদার্য ও মহত্ত্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কাত্যায়নীকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় যথেষ্ট লাঞ্ছনাভোগের পর, গ্রামে ফিরিয়া করুণার গৃহত্যাগের কথাও জানিলেন ; একান্ত আশাভগ্ন মনে পণ্ডিত মহাশয় তাই তীর্থে চলিলেন, নিধিকেও সঙ্গে লইলেন। কাশী ষ্টেশনে করুণার সহিত হঠাৎ দেখা— তাহাতে উভয়েরই সেকি হৃদয়োচ্ছ্বাস, সেকি আশা ও আশ্বাস -লাভ।[১১] অথচ পর-মুহূর্তেই নিধি আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কানে যখন অন্য মন্ত্র দিল, হঠাৎ তাঁহার আপন দুর্ভাগ্যের কথাও স্মরণ হইল আর মনে পড়িল প্রাচীনের উপদেশ— স্ত্রীচরিত্রে বিশ্বাস নাই! দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ। মুহূর্তের দ্বিধা ও সংশয়, হৃদয়কে অবিশ্বাস ও পরপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর আর তারই ফলে চরণে-নিপতিতা আবাল্য-স্নেহ-ভাগিনী অভাগিনী করুণাকে পিছনে ফেলিয়া আসার পরে তাঁহার কী মর্মবেদনা! কী পরিতাপ! তখন আর তুরন্তগতি ট্রেনের গাড়োআনকে চীৎকার-স্বরে থামিতে বলিয়াই বা ফল কী ? এক-ডিবা নস্য ফুরাইল আর চোখের জলে পণ্ডিত মহাশয়ের খানিকটা কাপড়ের খুঁটও ভিজিয়া গেল। এই আমাদের সার্বভৌম পণ্ডিতমহাশয়। মানুষকে স্বভাবতই ইনি অবিশ্বাস

করিতে পারেন না। এমন-কি নরেন্দ্রের অতিপ্রত্যক্ষ নীচতা হীনতাও সহজে ইঁহার চোখে পড়ে না। তার আক্রমণ হইতে স্নেহের করুণাকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন নিধির কথা। অবলাকে রক্ষা করিতে গিয়া অকৃতজ্ঞ মাতালের করতাড়নও অবিচল-চিত্তেই তিনি সহ্য করেন। অল্প পরিমাণ অতিরঞ্জন থাকিলেও, এই চরিত্র-চিত্র সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর এতটা মনের আকর্ষণ কেন, আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি।

এই গল্প উত্তরোত্তর জমাট বাঁধিয়াছে শেষের দিকে। আমাদের মনে হয় শেষ সাতটি পরিচ্ছেদের ঘটনা-সন্নিবেশে ও চরিত্র-চিত্রণে লেখকের বিশেষ দক্ষতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকালের দ্বিধায় সংশয়ে পড়িয়া করুণাকে প্রত্যাখ্যান করার পরে সার্বভৌমের অনুতাপ পরিতাপ, যাহাতে নিজের জীবনের বঞ্চনার অভিজ্ঞতা আর শাস্ত্রবাক্য মহাজনবাক্য একেবারেই ভাসিয়া গেল, এটি ফুটাইয়া তুলিতে রবীন্দ্রনাথকে বহু বাক্যব্যয় করিতে হয় না। মহেন্দ্রের প্রত্যাবর্তন, রজনীর ভাগ্যপরিবর্তন ও ভাবপরিবর্তন, তাহার শ্বশুর শাশুড়ি আর পাড়াপড়োশিনীর চরিত্রাঙ্কন— সকলই নিখুঁত। আর, রজনী ও করুণার গলাগলি সখ্যের কাহিনী, অন্যোন্য সহৃদয়তা, তাহাই বা কত সুন্দর! প্রধানতঃ বর্ণনামূলক হইলেও, সে ছবিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মতো—

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুই জনের ফুস্ ফুস্ করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল— তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কতদিনকার সামান্য যত্ন, সামান্য আদরটুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, তাহাই কত মহান ঘটনার মতো বলাবলি করিত। কিন্তু এ বিষয়ে তো দুইজনেরই ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কী যে কথা হইত তাহারাই জানে।··· কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না— সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া,

কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া, রজনীর এক-প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই তো কেমন ক'রে সে রজনীর কথা শুনিবে। তাহার কি একটা-আধটা কথা? তাহার পাখির কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালির গল্প— সে কবে কী স্বপ্ন দেখিয়াছিল— তাহার পিতার নিকট দুই রাজার কী গল্প শুনিয়াছিল— এ-সমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত তখন তাহাই বা থামায় কে? আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য? রজনী বেচারির বড়ো বেশি কথা বলিবার ছিল না কিন্তু বেশি কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক-এক সময়ে অন্যমনস্ক হইত বটে— তা, তাহাতে করুণার কী ক্ষতি? করুণার বলা লইয়া বিষয়। /

কিন্তু সরলা বালিকার এই আত্মবিস্মরণ, এই স্বভাবের সহজ স্ফূর্তি, সে তো সব সময়েই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। দুর্ভাগ্যের পশরা তো অল্প নয় তার। তাই—

আবার এক-একবার যখন বিষণ্ণ ভাব করুণার মনে আসিত তখন তাহার মূর্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে— রজনী পাশে বসিয়া 'লক্ষ্মী দিদি আমার' বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ণ হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'নরেন্দ্র কোথায়?'

মহেন্দ্র কহিল, 'আমি তো জানি না।'

করুণা কহিল, 'কেন জানো না?' /

কোনো কিছু না ভাবিয়া, না বুঝিয়া এমন প্রশ্ন শুধু করুণাই করিতে পারে আর পারে, অবশ্য, চার-পাঁচ বৎসর বয়সের বালিকা। সে দিক দিয়া দেখিলে, ক্ষুদ্র বালিকার সহিত তরুণী করুণার কোনো পার্থক্যই

বুঝি নাই।—

একদিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারী ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এ পর্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনও নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা-রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল।

নরেন্দ্র লিখিতেছেন— 'তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ, না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।'

করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হবে!' /

ক্রমশ মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধান করিলেন, এক-প্রকার খবরও আনিলেন কিন্তু সে খবরে আনন্দের বা আশ্বাসের কোনো কারণ নাই —ফলে, করুণার মুখের হাসি চিরতরে মিলাইয়া গেল। লাঞ্ছনা অপমান আঘাত পদাঘাত এই সুকুমার স্বভাবে আর তরুণ বয়সে অল্প সহ্য করে নাই করুণা, তবু চরম বিপন্নতা হইতে উদ্ধার পাইয়া আর রজনীর অকৃত্রিম আদর ও বন্ধুত্ব -লাভের ফলে, তাহার নিজস্ব স্বভাবের যে শেষ স্ফূর্তি হইয়াছিল অল্পকালের মতো, দীপশিখা জ্বালিয়া উঠিয়াছিল শেষ বার, এবার বুঝি সত্যই নিভিয়া গেল।—

কিছুদিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে— হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত— সে এক দিনের

জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য শূন্য ঠেকিত, কী যেন অভাব বোধ হইত। কয় দিন হইতে করুণা এমন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছিল— সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এইরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে তখন রজনীর বড়ো কষ্ট হয়— সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোনো কাজই হয় না।

নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারী ধরিয়া পড়িরাছে। মহেন্দ্র বলিল, সে বাড়ি অনেক দূরে। করুণা বলিল, তা হোক! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড়ো খারাপ। করুণা কহিল, তা হোক! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই। করুণা উত্তর দিল, তা হোক! সকল আপত্তির বিরুদ্ধে এই এক 'তা হোক' শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভালো বাড়িতে আনাইবেন ও সেইখানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন।...

করুণার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল— যে ভাবনা করুণার মতো বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল এ সংসারে সে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া ওঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোকজন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়। সে মনে করে, 'আমাকে এইখানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি।' সে সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না। সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারি কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মতো ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে— বর্ষার সলিলসেকে, বসন্তের বায়ুবীজনে, আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না।

...মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি। মহেন্দ্র করুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র

মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একবার মন ভাঙিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্তি হওয়া সহজ নহে —করুণা এই সংবাদ শুনিল কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রের বাড়ি হইতে বিদায় হইল— যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল। করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেন কেমন শূন্য শূন্য হইয়া গেল। সেই-যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না। সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সুমধুর হাসির ধ্বনি এক দিনের জন্যও আর শুনা গেল না। /

ইহার পর করুণার ব্যথাহত ব্যর্থ জীবনের পরিণাম অতি দ্রুত ঘনাইয়া আসিল। আসন্নমৃত্যু পীড়িতা পত্নীর উপর তার স্বামী-দেবতার পুনঃপুনঃ উৎপীড়ন অবাধে চলিতে লাগিল। করুণার সকল আশা ফুরাইল, বাঁচিবার ইচ্ছাও ফুরাইল। কোনো অত্যাচারের প্রতি-বাদ কোনোদিন সে করিতে পারে নাই, আজও করিল না। শেষ বারের মতো পাষণ্ড স্বামীর লাঞ্ছনায় রোগদুর্বলা করুণা যখন মূর্ছিত হইয়া পড়িল, সেই সময়েই পণ্ডিত মহাশয় সহসা ছুটিয়া আসিলেন। করুণা শেষবারের মতো শয্যা লইল। সখীর স্নেহে, মহেন্দ্রের আগ্রহে, বৈদ্যের চিকিৎসায় বা পণ্ডিত মহাশয়ের স্নেহার্ত ব্যাকুলতায় আর সে নূতন প্রাণ নূতন জীবন ফিরিয়া পাইল না। প্রেমপিপাসিনী রমণীর শেষ আকূতিটুকু প্রকাশ করিয়া, অকৃতজ্ঞ অমানুষ অপ্রকৃতিস্থ নরেন্দ্রের সব অপরাধ নিঃশব্দে ক্ষমা করিয়া, শূন্যহস্তে শূন্যজীবনে অপরিতৃপ্তহৃদয়ে এ লোক হইতে লোকান্তরে চলিয়া গেল। বর্ণবিরল বিষাদখিন্ন সেই সর্বশেষ ক্ষণের চিত্রলেখা আমরা পূর্বেই উদ্‌ধৃত করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস-রচনায় অনেক নিপুণ চরিত্রচিত্রণ অনেক খুঁটিনাটি সৌন্দর্য ইতস্ততঃ আকীর্ণ আছে। সব আমরা সংকলন

করি নাই, এমন-কি উল্লেখ করিতেও পারি নাই। কল্পনারাজ্য হইতে নামিয়া কিশোর বা তরুণ কবি বাস্তব সংসারের প্রতি প্রথম এই দৃষ্টিপাত করিলেন। 'কবিকাহিনী'তে অনুভব করিয়াছিলেন বটে 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন' আর এখন যেন বুঝিলেন : মানুষের কাছে মনুষ্য-জীবনেরই অশেষ মূল্য। সুন্দর-অসুন্দর শুভ-অশুভ সু-কু -নির্বিশেষে মানুষকে জানিতে, বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে হইবে। কবি যে নিছক অনুকরণস্পৃহায় অথবা কল্পনাবিলাসের বশে এই উপন্যাস-রচনায় হাত দিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। শুধু যে নব-প্রচারিত সাময়িক পত্রের পাতা ভরাইবার খোশ-খেয়াল বা স্বজন-বন্ধুর তাগিদ ছিল, এ কথা সত্য নয়। জন্মনিঃসঙ্গ নিসর্গনিমগ্ন স্বপ্নবিলাসী কবির পক্ষে সত্যকার সংসারে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিবার একটা প্রয়োজন ছিল, প্রয়াস ছিল— এই বয়সের 'হৃদয়অরণ্য' হইতে বহু কষ্টে পথ কাটিয়া আঁধার ছেদিয়া বাহির হইতে না পারিলে যে নয়। 'করুণা'-রচনা কবির সেই জীবনঅর্জনের ও সত্যলাভের, বস্তুলাভের, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত।

রচনা হিসাবে হয়তো 'করুণা' ষোলো-আনা সার্থক হয় নাই। অনেক ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। শ্রবণ মনন অনুমান ও কল্পনার উপরেই নির্ভর হয়তো বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই লেখক বলিয়াছেন সত্য 'সে আর কী বলিব'। বার বার প্রহার ও পদাঘাতের দৃষ্টান্তেই দুর্বৃত্তের দুর্বৃত্ততা ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে— এতটা চন্দ্রনাথ বসুর রুচিতে বাধিয়াছে আর আমাদেরও ভালো লাগে নাই। তবু কাহিনী ও চরিত্র আছে। 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনা সর্বত্র না থাকিলেও মোটের উপর রস যে ফুটিয়াছে সে আমরা দেখিয়াছি। 'করুণা'র আখ্যান-কথনে নিগূঢ় এবং যথার্থ যে ত্রুটি সে হয়তো বর্তমান আলোচনায় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তবু আর একবার বুঝাইয়া বলিলে অসংগত হইবে না।—

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় গল্পে আর প্রথম বড়ো গল্পে বা 'সত্য'

গল্পে বাস্তব সংসার, রক্তমাংসের সজীব মানুষ, সকল আলো-অন্ধকার পুণ্য-পাপ ভালো-মন্দ লইয়াই উপস্থিত। অভাব বা অপূর্ণতা সে দিকে নয়। ত্রুটি এই যে, অধিকাংশ চরিত্রই বর্ণিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকাশিত, প্রকটিত হয় নাই। কবির এই বয়সে, জীবনের এমন অল্প অভিজ্ঞতায় তাহা হইবারও নয়। বর্ণনায় ও প্রকাশ হওয়ায় কী তফাত তাহা এরূপ একটি উপমার সাহায্যে বলা যায় যে, অজস্র স্থিরচ্ছবি একটির পর একটি সাজাইয়া দিলে বর্ণনার কিছু অবশিষ্ট না থাকিতেও পারে কিন্তু ঠিক ঐ ছবিগুলি একটি গতিবেগের সঞ্চারে নড়িয়া-চড়িয়া, একটি আরেকটির সহিত মিলিয়া-মিশিয়া ছুটিয়া যখন চলে তাহাকেই চলচ্চিত্র বলা হয় আর তাহাই সজীব সচল জীবনের রূপ। আলোচ্য উপমানের ক্ষেত্রে তো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা প্রকরণ আছে ; উপমেয়র ক্ষেত্রে, সাহিত্যে, চরিত্র-সৃষ্টির ব্যাপারে সেরূপ কোনো ফর্‌মূলা কোনো কর্মকৌশল কাহারো কাছেই শেখা যায় না। আপনার জীবন হইতেই জীবনবেগ কাব্যে বা কথায় সঞ্চার করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাথমিক রচনায় বুঝি সেটুকুরই অভাব রহিয়াছে। 'করুণা' আখ্যায়িকা চিত্রবৎ, চলচ্চিত্রবৎ নহে।

তবু করুণা চরিত্র সত্য এবং বাস্তব। ইহাকে আমরা দেখিয়াছি। বালিকার মধ্যে দেখিবার সৌভাগ্য যেখানে হয় নাই (সে দেখায় অনবধান বা অবহেলার অবকাশ থাকিলে তো দেখা ঠিক হইত না) বৃদ্ধার মধ্যে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছি। ইহাকে দেখিয়াছি কবি রবীন্দ্রনাথের সহজ আনন্দময় সত্তায়, সুন্দর স্বভাবে— ইহার অন্তরঙ্গ সত্যকে দেখিয়াছি।[১২]

উত্তরটীকা : তথ্য ও প্রমাণ -পঞ্জী

১ অধুনা চতুর্থভাগ গল্পগুচ্ছে এ দুটি আখ্যায়িকা সংকলিত।

২ বনফুল, ভিখারিনী, কবিকাহিনী —সাময়িক পত্রে এই ক্রমে রচনা প্রকাশিত। বনফুলের প্রচার 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' মাসিক পত্রে। ভারতী মাসিক পত্রে করুণা-প্রচারের অন্তর্বর্তীকালে কবিকাহিনী চার সংখ্যায় মুদ্রিত।

৩ কবির ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ইন্দিরা (কমলা) নাম কে দেন জানি না। আনা তড়খড়'কে নলিনী নাম উপহার দিয়াছিলেন কবি স্বয়ং।

৪ ভারতী পত্রে ভিখারিনীর প্রচারকাল, ১২৮৪ শ্রাবণ - ভাদ্র; করুণা, ১২৮৪ আশ্বিন - ১২৮৫ ভাদ্র; কবিকাহিনী, ১২৮৪ পৌষ-চৈত্র। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রে বনফুল কাব্যের প্রচার-কাল ১২৮২ অগ্রহায়ণ - ১২৮৩ আশ্বিন-কার্তিক।

৫ 'an unfinished social novel (Karuna)'— P. C. Mahalanobis : A Tagore Chronicle 1861-1931 : The Golden Book of Tagore (1931), p. 365

"করুণা'র ন্যায় সামান্য একটা অসম্পূর্ণ উপন্যাস' —প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৫৩), পৃ ১৬০

' "করুণা" উপন্যাস ২৭ পরিচ্ছেদ বাহির হইয়াও শেষ হয় নাই।' —সজনীকান্ত দাস : রবীন্দ্রনাথ / জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭), পৃ. ২২১ / 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৬৮ বৈশাখ সংখ্যায় ভারতী হইতে আদ্যন্ত 'করুণা'র পুনর্মুদ্রণ। সে-সময় পূর্বোক্ত অভিমতের অসারতা বা অলীকতা যদিবা বুঝিয়া থাকেন সম্পাদক, ভ্রম-সংশোধনের সুযোগ তিনি পান নাই।

৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (পৃ ৪২০-২৩) চন্দ্রনাথ বসুর পত্রখানি প্রচারিত। তাহার মুখ্যভাগ এখানে

সংকলনযোগ্য।—

কলিকাতা···

১৭ই আশ্বিন ১২৯১

করুণা পড়িয়াছি। পড়িয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি।···

প্রকৃতপক্ষে গল্প দুইটি একটি নয়— নরেন্দ্র এবং করুণার একটি গল্প ; মহেন্দ্র এবং রজনীর একটি গল্প। অনেক দূর পর্য্যন্ত দুইটি গল্প পৃথক আছে— শেষে [আখ্যায়িকার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে] মিলিয়াছে। আমার বোধ হয় যে দুইটি গল্প আরও গোড়ার দিকে মিলিলে ভাল হইত।···

গল্পের দুই একটি গ্রন্থি সম্বন্ধেও আমার কিছু বলিবার আছে। করুণা কাশী না যাইলে করুণার গল্পের সহিত মহেন্দ্রের গল্পের মিলন হয় না।··· কিন্তু স্বরূপ উত্তর পশ্চিমে কেন গেল ?··· যেন করুণার গতি কি করা যায় তাহার কিছু ঠিকানা করিতে না পারিয়া স্বরূপকে ফস্ করিয়া এলাহাবাদে পাঠান হইল।··· আমার মনে হয় যেন করুণার নির্ব্বাসন উপলক্ষে··· ষড়যন্ত্রের অবতারণা করিয়া করুণাকে কাশীতে আনিয়া ফেলিলে গল্পের এই অংশটুকু বেশ পরিপাটি হয় এবং করুণার চরিত্রগৌরব (যাহা আমার মতে এইখানে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে) বজায় থাকে। মহেন্দ্রের গল্প বেশ রচিত হইয়াছে। কেবল তাহার বাড়ী আসিবার সময় কাশী যাওয়ার কথাটা··· weak বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এ কথাটা বোধ হয় সহজেই মানাইয়া লওয়া যায়। মহেন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় অনুরাগ এবং লজ্জা এই উভয় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল। অতএব লজ্জাবশত, আসিতে আসিতে, তাহার এক একবার যেন ইতস্তত করা স্বাভাবিক··· এবং সেই কারণে সোজা পথ ছাড়িয়া একটু বাঁকিয়া কাশীতে যাওয়া বেশ সঙ্গত।···

পণ্ডিত মহাশয়ের কথাটাকেও একটা স্বতন্ত্র কথা বলিয়া

গণ্য করা যাইতে পারে। সে কথা আমাকে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। কিন্তু সেইজন্যই আমার দুঃখ হয় যে কি মহেন্দ্রের কি নরেন্দ্রের গল্প কোনটিরই সহিত তাহা বিশিষ্টরূপে জড়িত নয়। একটু ভাল করিয়া জড়াইয়া দেওয়া যায় না কি?

গল্পের তিনটি সূতাই বেশ ভাল পাঁজের সূতা; কিন্তু তাঁতির বুনন কিছু আল্গা হইয়াছে।

এখন তিনটি কথার মধ্যে কোন কথাটি আমাকে কেমন লাগিয়াছে তাহা বলিতেছি।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা অতি উত্তম হইয়াছে। এমন হাস্য-রসময় কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় বিরল। পণ্ডিতজীর নদী পার হওয়ার কথা পড়িতে পড়িতে হাসিয়া আমার নাড়ী ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং? আহা! এমন উন্নত চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়ই বিরল। সে চরিত্র যথার্থ দেবচরিত্র। সে চরিত্রে বাঙ্গালী যথার্থই একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইয়াছে। সে চরিত্রের চিত্রে চিত্রকরের বড়ই মহত্ত্ব এবং গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে। সে চিত্রকর দীর্ঘজীবী হউক্।

তার পর— করুণা এবং রজনী। করুণাকে আমি ঠিক বুঝিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে, করুণা কেবল একটি কল্পনামাত্র— মানবচরিত্র নয়; রজনী প্রকৃত মানবচরিত্র। করুণা কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার জিনিস নয়; রজনী কর্ম্মক্ষেত্রের জিনিস। করুণাতে কেবল ভাব আছে, বুদ্ধি নাই— তাই করুণা কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিতে পারে না। এবং সেইজন্য ভাবাধিক্যে রজনীর শ্রেষ্ঠ হইয়াও গৌরবে রজনীর নিকৃ[ষ্ট] ··· এত ভাবময় হওয়া বা আপনার ভাবে ভোর হইয়া থাকা মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জীবের উপযুক্ত হইতে পারে, মানুষের উপযুক্ত নয়। কি স্ত্রী কি পুরুষ— মনুষ্য মাত্রেরই ভাব এবং বুদ্ধি বা heart এবং intelleot দুইই কম বেশী

পরিমাণে আবশ্যক। যদি কাহারো দুইয়ের একটি একেবারেই না থাকে অথবা না থাকার মতন— সূক্ষ্ম মাত্রায় থাকে তবে তাহাকে অসম্পূর্ণ মানুষ বলিতে হইবে। ··· যে স্ত্রীলোক আত্ম-মাহাত্ম্য বুঝে না এবং রক্ষা করিতে পারে না বা সাহসিক হয় না সে অতি দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, অতি অসম্পূর্ণ স্ত্রীলোক।··· মানুষের অপেক্ষা বড় হইতে পারে বা ছোট হইতে পারে, কিন্তু মানুষ হয় না। কিন্তু মানুষের দুঃখে মানুষের হৃদয় যত গলে আর কাহারো দুঃখে তত গলে না। স্পষ্ট কথা বলিব— রজনীর দুঃখে আমার হৃদয় যত গলিয়াছে করুণার দুঃখে তত গলে নাই। রজনী বড়ই চমৎকার মেয়ে। যখন মহেন্দ্র চলিয়া গেল আর রজনী "আমি কাছে আসিয়াছিলাম বলিয়া বুঝি তিনি চলিয়া গেলেন" এই ভাবিয়া জানালায় বসিয়া··· কাঁদিতে লাগিল তখন, রবীন্দ্রনাথ, আমি যথার্থই ঝর ঝর ধারায় কাঁদিয়াছি! তোমার করুণা খুব ভাল— কিন্তু অসম্পূর্ণ— একটি ফুল মাত্র, ফল নয়— কল্পনা মাত্র, কাব্য নয়— স্বপ্ন মাত্র, জীবন নয়— দৃশ্য মাত্র, আদর্শ নয়। তোমার (রুদ্রচণ্ডের) অমিয়াও তাই। তাই অমিয়াকে ভাল বলিতে পারি নাই, তাই করুণাকেও ভাল বলিতে পারিলাম না।···

করুণা [চরিত্র] অসম্পূর্ণ হইলেও বড় উত্তম জিনিস।···

মহেন্দ্র-মোহিনী সম্বাদটা বেশ লেখা হইয়াছে— বড়ই হাস্যরসপূর্ণ। বোধ হয় ও সম্বাদটা সমাজসংস্কারক মহাশয়দিগের বড়ই মিষ্ট লাগিবে। কিন্তু মোহিনী যথার্থই মহৎ এবং প্রেমময়ী। মোহিনী চরিত্র বঙ্গসাহিত্যের একটি রত্ন।··· ভবির গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

সাহিত্য, লোকচরিত্র, প্রভৃতি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি সুগভীর এবং সুচতুর কথা দেখিলাম। সেগুলি বড় ভাল লাগিল এবং "বিবিধ প্রসঙ্গ" প্রণেতার যোগ্য বলিয়া বোধ হইল।

গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপান আবশ্যক। কিন্তু গল্পের বাঁধনি একটু শক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক··· আপনার প্রতিভাবলে আপনি তাহা নিশ্চয়ই করিয়া লইতে পারিবেন।

আর দুইটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। গল্পের প্রথমাংশে চরিত্রগুলি কিছু বুঝাইয়া বুঝাইয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।··· কিন্তু উপন্যাসে analytical প্রণালী বড় ভাল লাগে না।··· তাই বঙ্কিমবাবুর দেবী চৌধুরাণী অত উচ্চস্তরে স্থাপিত হইয়াও তাঁহার বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের মতন তত মিষ্ট লাগে না। কাব্যে চরিত্র কার্য্যে নিহিত বা প্রচ্ছন্ন থাকাই উচিত— ইতিহাসে বা সমালোচনায় যেমন explain করিয়া দেখান হয় তেমন করিয়া দেখান হইলে ভাল লাগে না। "করুণা"র প্রথম অংশে চরিত্র সেইরূপে বর্ণিত হইয়াছে— বিশেষ করুণার নিজের চরিত্র।

দ্বিতীয় কথা— উপন্যাসের একটি প্রধান অঙ্গ কথোপকথন, তাহারই গুণে উপন্যাস dramatic হয়। করুণাতে সেই dramatic অংশ নাই। একটু থাকিলে ভাল হয়।

শেষ কথা— মাতালগুলার মাতলামির বর্ণনা কিছু কম করিয়া দিলে ভাল হয়। ···

ভারতী ২ খণ্ড ২।৪ দিন পরে পাঠাইয়া দিব। ··· বিনত

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

মূল চিঠির কোনো কোনো অংশ বিনষ্ট, কতক অংশ বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। সেই স্থলগুলিতে যথোচিত চিহ্নে রচনাংশ বর্জনের ইঙ্গিত আছে। সংকলনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বন্ধনীবদ্ধ পদাবলি মূল পত্রের অঙ্গীভূত নয়। তেমনি শেষ ভাগে এক বাক্যের একটি অনুচ্ছেদে বুঝিবার সুবিধার জন্যই 'চরিত্র' শব্দটি বসাইতে হইয়াছে, আর ইহার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে (পৃ ২১২) 'তোমার করুণা' (অতঃপর যেমন 'তোমার অমিয়াও') প্রয়োগে

অনেক না-বলা হয়তো না-ভাবিয়া-দেখা কথার যে দ্যোতনা ফুটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার— এজন্যই আমরা বিশেষ হরপের ব্যবহার করিয়াছি।

৭ বিশেষ কতকগুলি কারণে রাজর্ষি, বৌঠাকুরানীর হাট, রাজা ও রানী, রাজা, অচলায়তন, শারদোৎসব, কর্মফল, একটা আষাঢ়ে গল্প, শেষের রাত্রি, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, পরিশোধ (নির্দিষ্ট ক্রমে উল্লেখ হইল না / কিছু বাদ গেল কি ?) এরূপ অনেকগুলি আখ্যায়িকা নাটক কাব্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ করিয়াছেন এ কথা সত্য। এ-সব ক্ষেত্রে কবি একবার যাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন পুনর্বার তাহারই রূপান্তর-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্তরের অথবা বাহিরের বিচিত্র তাগিদে। 'অকৃতকার্য অকথিতবাণী অগীতগান'এর মায়া মমতায় বারে বারে পিছন ফিরিয়াছেন এমন নয়।

৮ বন্ধনীমধ্যে এই পদটির প্রক্ষেপ আদ্যন্ত কাহিনীর হুঁশিয়ার পাঠকের পক্ষে একরূপ অনাবশ্যক ছিল। তেমনি এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্যে দেখি : রজনী কাঁদিতেছে। 'নিঃশব্দে কাঁদিতেছে' না বলিলেও, মনোযোগী পাঠক সেরূপই বুঝিবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কান্না আর রজনীর কান্নায় যে পার্থক্য স্বাভাবিক, দুটি চরিত্রের ভিন্নতায় আর সমুদয় ঘটনাসমাবেশেই তাহা স্পষ্ট হয় সন্দেহ নাই।

৯ এজাতীয় ত্রুটি চন্দ্রনাথ বসুও উল্লেখ করিয়াছেন। 'তাহা আর কী বলিব' এরূপ প্রয়োগ বহু স্থলে দেখা যায়। কবিশক্তির পূর্ণতায় এ কথা আর বলিতে হয় না ; প্রয়োজন হইলে বচনের দ্বারাই অনির্বচনীয়েরও উদ্দেশ দেওয়া যায়।

১০ জীবনস্মৃতির প্রাথমিক খসড়ায় (১৩১৮ বৈশাখের পূর্বে রচিত) এই উক্তি দেখা যায়। 'করুণা' অসম্পূর্ণ এমন কথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন নাই, অপরিণত বলাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল— অর্থাৎ

'রীতিমত নভেল'। তবে, কবির আত্মসমালোচনা অন্যের পক্ষে সবটা মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই। এ কথা ভগ্নহৃদয় প্রভাত-সঙ্গীত সন্ধ্যাসঙ্গীত আর ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমনি করুণা সম্পর্কেও। এমন-কি বহুপরবর্তী 'নৌকাডুবি'র বিচার-প্রসঙ্গেও ইহা মনে রাখা ভালো।

১১ স্টেশনে হঠাৎ কাহারো সহিত দেখা হওয়া এবং অনাথা বিপন্না নারীর আশ্রয়লাভ ও আশ্বাসলাভ —এরূপ নাটকীয় ঘটনার পুনশ্চ প্রয়োগ দেখি নৌকাডুবিতে। নানা অবস্থায় গঙ্গাতটশায়িনী বারাণসী সকলকে টানিয়াছে। তবে, প্রথমে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ও পরে মহেন্দ্রের সহিত করুণার কাশীতে সাক্ষাৎ হইলেও, কাশী ছাড়িয়া মোগলসরাই জংশনেই কমলার দেখা হয় উমেশের সঙ্গে। কমলাকে সে'ই আবার গাজীপুরের খুড়ামহাশয়ের উদার স্নেহাশ্রয়ে ফিরাইয়া আনে। স্বভাবসারল্য ও ঔদার্যের দিক দিয়া রায়পুরের শ্রীকণ্ঠসিংহ (জীবনস্মৃতি), রায়গড়ের খুড়ামহাশয় (বৌঠাকুরানীর হাট ও প্রায়শ্চিত্ত), গাজীপুরের চক্রবর্তী খুড়া (নৌকাডুবি) আর করুণা আখ্যায়িকার সার্বভৌম পণ্ডিত মহাশয়— ইঁহাদের মধ্যে গভীর সাজাত্য ও সাদৃশ্য নাই কি? বিশেষ চরিত্রকল্পনার আশ্রয় ও আদর্শ যেন শ্রীকণ্ঠসিংহ আর কল্পিত চরিত্রগুলির একটি হইতে অন্যটির বৈসাদৃশ্য যতটা সে বুঝি – স্থান কাল ঘটনা এবং রূপকল্পনাশক্তির পার্থক্য-জনিত। এক দিকে গল্পগুলি পৃথক্ আর অন্য দিকে রবীন্দ্রপ্রতিভারও ক্রমিক বিবর্তন ঘটিয়াছে। মূলগত ঐক্যটি অনুস্যূত আছে নানা বৈচিত্র্যের অন্তরালে।

১২ রবীন্দ্রশতবার্ষিক 'শনিবারের চিঠি'তে (বৈশাখ ১৩৬৮) আদ্যন্ত 'করুণা'র পুনর্মুদ্রণ কিন্তু কোনোরূপ সম্পাদকীয় মন্তব্যের অসদ্ভাব। তৎপূর্বেই শ্রীপুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত চতুর্থখণ্ড গল্পগুচ্ছ (বিশ্বভারতী) যন্ত্রস্থ থাকিলেও, প্রকাশ অনেক পরে

১৩৬৯ সনের আশ্বিনে। আংশিক সম্পাদনার ও মুদ্রণসংক্রান্ত তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকায়, এ সময়ে (১৩৬৮ বৈশাখের পূর্বে) আনুপূর্বিক আখ্যানটি আমায় পড়িতে হয় আর তাহারই ফলে বর্তমান প্রবন্ধটি লেখা অনিবার্য হইয়া ওঠে ১৩৬৯ শ্রাবণে (গল্প-গুচ্ছ ছাপা শেষ হইলে লেখাও শেষ হয় ১৮ অগষ্ট্ ১৯৬২ তারিখে)। ১৩৬৯ কার্তিকের 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' ত্রৈমাসিক পত্রে ইহা প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রের একটি সংখ্যায় (তা° ১৯ শ্রাবণ ১৩৬৯) 'রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস' নামে যে চমৎকার প্রবন্ধটি লেখেন শ্রীস্মরণকুমার আচার্য, তখন আমার চোখে না পড়িলেও এখন অবশ্যই তাহার উল্লেখ করা কর্তব্য। ইহার পরে 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়' গ্রন্থ -রচনা উপলক্ষ্যে 'করুণা' সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও আলোচনা করেন শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ। তাঁহার গ্রন্থ (জিজ্ঞাসা / আশ্বিন ১৩৭৬) যে-কোনো রবীন্দ্রভক্ত পাঠকের সযত্ন অধ্যয়ন ও মননের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহার পরে আরো কিছু যদি বলিতে হয় তাহার কারণ এই যে, হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে জ্যোতির্ময়বাবুর ভুল ধারণা থাকিয়া গিয়াছে, কিছু তথ্য তাঁহার জানা নাই, অনুমান করাও কঠিন ছিল। যেমন—

'রচনাবলীতে করুণা গল্পগুচ্ছের শিরোভূষণ মেনে নিচ্ছে কেন? শ্রীকানাই সামন্ত যার প্রকাশক?' [র. উ. প্র. পর্যায়। পৃ ৪৭]

কারণ— এ ক্ষেত্রে প্রকাশক আর সম্পাদক অভিন্ন নয়। পূর্বোক্ত সপ্তবিংশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর (বৈশাখ ১৩৭২) সম্পাদনা পুলিনবাবু করেন নাই, গ্রন্থপরিচয়ও অন্যের লেখা— পরবর্তীকালে আংশিক সংশোধন কে করেন তাহা বলিতে পারি না। এমন-কি বিশ্বভারতী-প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩৬৯) চতুর্থখণ্ড গল্পগুচ্ছের কিছুটা সম্পাদনার ভার আমাতে ন্যস্ত থাকিলেও,

আমার ব্যক্তিগত অভিমত মূল সংকলক ও সম্পাদকের উপর চাপানোর উপযোগিতা তখন ছিল না, ইহাও স্বীকার করা ভালো। 'করুণা' বড়ো গল্প বা উপন্যাস —এটুকু মাত্র বলা হয় (দ্রষ্টব্য উত্তরটীকা ১। পৃ ৩৫১)। সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ এ বিতর্ক স্থগিত থাকে। কিন্তু ঐ গল্পগুচ্ছেরই পরবর্তী মুদ্রণে তথা সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৭০) বলিতে বাধা ছিল না, কেননা ততদিনে এ বিষয়ে আর ভিন্নমত হয়তো ছিল না : রবীন্দ্রনাথের ষোড়শ-সপ্তদশ বৎসর বয়সে রচিত বা মুদ্রিত এই সম্পূর্ণ উপন্যাসখানি সম্পর্কে (প্রথম উপন্যাসও বটে) দ্রষ্টব্য আলোচনা / ইত্যাদি (পূর্বোক্ত গল্পগুচ্ছ-৪। পৃ ১০৩৯)। অনূ্যন ৫ বৎসর পরে 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়' প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থকার তাহা লক্ষ্য করেন নাই কি ?

জ্যোতির্ময়বাবুর বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইলেও, তাঁহার একটি কথায় আমাদের তেমন প্রত্যয় জন্মিল না। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের চিঠির 'শেষে মিলিয়াছে' (অত্র উত্তরটীকা ৬-ধৃত সংকলনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পৃ ২১০) উক্তির প্রথম পদটিতে তিনি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। 'দুইটি গল্প' 'শেষে মিলিয়াছে' বলায় অ ব শে ষে মিলিয়াছে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে (উপন্যাস তখনো শেষ হয় নাই) ইহাই তো নির্গলিতার্থ; স ব শে ষে মিলিয়াছে যেমন বলা হয় নাই, বলা ভুল হইত তাহাও "অনস্বীকার্য"। উপন্যাস শেষ হওয়া না-হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সম্ভবতঃ তখন পর্যন্ত সে বিষয়ে কাহারো মনে কোনো ধাঁধা লাগে নাই। এই ধাঁধার অহেতু উৎপত্তি হইয়াছে, ধাঁধা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তত উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসরে (১৯৩১-৬০) যাঁহাদের 'স্বতঃসিদ্ধ ধ্যান-ধারণা'য়, হয়তো কেহই তাঁহারা আদ্যন্ত আখ্যায়িকা ভালো করিয়া দেখেন নাই বা পড়েন নাই অভিমত লিখিবার ও ছাপাইবার পূর্বে।

যাহা হউক, গল্প বা উপন্যাস নিশ্চিত শেষ হইয়াছে তাহার তর্কাতীত প্রমাণ আছে / থাকে গল্পের ভিতরেই। বাহিরে প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ানোর বড়ো বেশি সার্থকতা নাই। শেষ হইয়াছে —অন্যের মুখের কথায় (যেই হোন তিনি) কিভাবে প্রমাণ করা যাইবে, গল্পের প্রকট অসম্পূর্ণতা বা অপরিণতি যদি তাহার প্রতিবাদ করে? বস্তুতঃ কবিকৃতি নিজেই নিজের প্রমাণস্বরূপ। অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ আনুষঙ্গিক মাত্র। থাকিলে ভালো, না থাকিলেও ক্ষতি নাই।

২২ শ্রাবণ ১৩৮৬

সংযোজন-সংশোধন

'আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী' আমাদের প্রেমের গানের তালিকায় ৪৫-সংখ্যক। এটির রচনা সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে পূর্বে যেটুকু বলা হয়েছে (পৃ ১৪৪, টীকা ৯), তার পরিপূরক বা প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের সাক্ষ্য এ স্থলে সংকলন করা যায় :—

কবির মুখে শুনেছিলাম "আহা জাগি পোহালো বিভাবরী" গানটা লেখার বিবরণ। সেদিন কবি তাঁর বজরাতে ছিলেন পদ্মায়। সঙ্গে দুই ভ্রাতুষ্পুত্র— শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সন্ধ্যে থেকে দারুণ ঝড়, সারা রাত সেই ঝড়ের মধ্যে উদ্‌বেগে কাটাতে হোলো। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে এইবার বুঝি নোঙ্গড় ছিঁড়ে নৌকো উল্টে যাবে। সমস্ত রাত তিন জনে জেগে বসে রইলেন। ভোরবেলা প্রকৃতি শান্ত হোলো। সেই ভোরে ঐ গানটি লেখা। হাসতে হাসতে বললেন, "গানটা পড়ে কি কল্পনা করতে পারো যে এইরকম অবস্থায় ঐ গান লিখেছি? সেদিন কোনো সুন্দরীই ধারে কাছে ছিল না। শুধু ছিল আমার বলু আর সুরেন, এবং কবিত্ব করবার মতো রাত্রি-জাগরণ নয়, একেবারে জীবন মরণের দোলার মধ্যে রাত কেটেছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে, গানের মধ্যে সে উদ্‌বেগের কোনো চিহ্ন নেই।"

—দেশ, ১৯ কার্তিক ১৩৬৭, পৃ ২২, বীথি ২

পৃ ১২৯। ছ ৮ 'সোনার' স্থলে হবে : বীণার

পৃ ১৬০। ছ ৭ 'বলে' নয় : বলা

বর্তমান গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধের চতুর্থ টীকায় (পৃ ৪৮) বলা হয়েছে—বিসর্জন নাটক নিয়ে কবির মনের অনেক ভাঙা-গড়া (হেতু তার এক-প্রকার *divine discontent* বলা চলে) বাংলা বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণেই সীমাবদ্ধ নয় ; কবি-কৃত ইংরেজি রূপান্তরেও তার অনুবৃত্তি আর সে আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়, ধ্যান ধারণার বস্তু, বিচার বিশ্লেষণ আলোচনার ক্ষেত্র। বিসর্জন নয় কেবল, কবির পূর্ববর্তী নাটক রাজা ও রানী সম্পর্কেও ওই এক কথাই বলা যায়। কেননা, কবি নিজের বাংলা রচনার ভাষান্তর করতেন ইংরেজিতে এ কথা প্রায় কোনো সময়েই বলা চলে না ; এক সৃষ্টিকে পৌঁছে দিতেন অপ্রত্যাশিত আর অভিনব আরেক সৃষ্টিতে। তুলনায় আলোচনা করে দেখলে বিস্মিত আর বিমুগ্ধ হবেন যে-কোনো রসিক ব্যক্তি। অথচ, তেমন নিবিষ্ট গভীর অধ্যয়নের / পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনায় আলোচনার সূচনাও কি হয়েছে কোথাও ? আমাদের জানা নেই। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-আবির্ভাবের পরে ১২৫ বৎসর / তিরোভাবের পরেও ৪৫ বৎসর শেষ হতে চলল্।

বিচিত্র বিশাল ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে আজও রবীন্দ্র-চর্চার, কাব্যরসিক বিদ্বজ্জনের অনুশীলনের ও অনুসন্ধানের।

কেবল, বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের পাঠপঞ্জীকৃত সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৮৪) প্রচলিত বাংলা রূপে আর ইংরেজি রূপান্তরে কী পার্থক্য সেটি সূত্রাকারে নির্দেশ করা হয়েছে গ্রন্থশেষে (পৃ ১০২-১১৩)। আর, সূত্রাকারেই এরূপ তুলনায় আলোচনার অনুসৃতি দেখতে পাওয়া যাবে কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত (চৈত্র ১৩৯১) বিশ্বভারতীরই পাঠপঞ্জীকৃত সচিত্র চিত্রাঙ্গদা নাট্য-কাব্যে (পৃ ১০০-১১২)। সেই কি যথেষ্ট বলা চলবে ? তা অবশ্য নয়।

কবি-কৃত রাজা ও রানী আর বিসর্জনের ইংরেজি রূপান্তর-দুটিতে মূল নাটকের, পরিবর্তন নয়, বিবর্তন কতটা যে সুদূরপ্রসারী তার যৎ-

কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিয়েছি আমরা অন্যত্র। *

বিষয়টিতে বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ আর অধিকারী যোগ্যজনের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য এখানে; বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

১৩৫৭ আশ্বিন থেকে প্রচলিত তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে আর বর্তমান গ্রন্থের দুটি লেখায় ('গান থেকে কবিতা' / 'প্রেমের গান') গীতজ্ঞ না হয়েও কবির গান সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের পরিবেশন করতে হয়েছে বিভিন্ন আলোচনার সূত্রে আর রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বাংলা গান থেকে তাঁর নিজেরই ইংরেজি রূপান্তর (কথায় ও সুরে) তারও পাঠ সংকলন করা হয়েছে যথাস্থানে (পৃ ১৫৫)। এ-সবেরই কথঞ্চিৎ সম্পূরণ এ স্থলে গ্রন্থশেষের এই সংযোজনে।

প্রেমের গানের তালিকা-ধৃত ৫০-সংখ্যক গানের কবি-কৃত যে ইংরেজি রূপান্তরের উল্লেখ '১৫৬' পৃষ্ঠায়, স্বরলিপি-অনুযায়ী সেটির সম্পূর্ণ পাঠ এই :—

In the bower of my youth a bird sings,
Wake, my love, awake!
Open thy love-languid eyes, my love, and wake!
There is a tremour in the midnight darkness to-night,
and the air is tremulous with the praise-song of Spring.
Oh, timorous maiden, blushing with the mystery of first love,

* দ্রষ্টব্য শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা-কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিভারতী' (আশ্বিন ১৩৯২), পৃ ৯৯, ছত্র ১-১৩ তথা উত্তরটীকা ২।

listen in my grove of Paradise a bird sings
in a repeated rapture, Wake, my love, awake!
Wake, my love, awake!
Wake! Wake!
—*The Maharani of Arakan (1915)*

বর্তমান গ্রন্থের '১৫৭' পৃষ্ঠার ঊনশেষ বাক্যে বলা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের যে গানের সুর হারিয়েছে, যে কবিতায় তিনি সুর দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দেওয়া হয় নি অপিচ গীতবিতানের প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ডে (মাঘ ১৩৪৮ থেকে অদ্যাবধি) সংকলন করাও হয় নি, প্রচল তৃতীয় খণ্ডে (১৩৫৭ আশ্বিন থেকে) তা সবই দেওয়া হয়েছে বা দিতে যত্ন করা হয়েছে। সে হিসাবে কবির গানের স্বকৃত ইংরেজি রূপান্তর-দুটি ওই গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয়ে অন্তত দেওয়া উচিত, তাতে তো সন্দেহ নেই। হয়তো দেওয়া হবে আগামী সংস্করণে।

'লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ' — স্নেহপাত্রী নির্মল-কুমারীকে কবি প্রশ্ন করেন কিছুটা সুস্মিত কৌতুকে (পথে ও পথের প্রান্তে / পত্র ৩৯, ২৩ শ্রাবণ '৩৬)। আমরা বেশ জানি রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রসাদে সকলই সম্ভব। তার বহু ও বিচিত্র সাক্ষ্য দেবেন আজও রবীন্দ্রসান্নিধ্যে-ধন্য প্রবীণ গুণীজন। অথচ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে (দ্রষ্টব্য পঞ্চম সংস্করণ তথা মুদ্রণ ১৩৭৯-৮৬, পৃ ৭৮৬-৯২) —

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে	স°	৫৩
কেন নিবে গেল বাতি		৫৪
আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো		৫৬
সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে		৫৭
ভাঙা দেউলের দেবতা		৬১

এ-ক'টি সম্পর্কে কিছু সংশয় আমাদের মনে থেকেই যায়। ভৈরবী-ঝাঁপতাল / গৌড়সারং-একতালা / বেহাগ্-কাওয়ালি / কীর্তন / পূরবী-একতালা'র উল্লেখে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের 'গান' বইয়ে হঠাৎ এগুলি

এল কী সূত্রে অথবা কেন! কবির আয়ুষ্কালে, এ সময়ের আগে বা পরে, অন্য কোথাও আভাসে ইশারাতেও জানা তো যায় নি এগুলি গান। উক্ত 'গান' (১৯০৯) গ্রন্থে অনাহূত অবাঞ্ছিত অন্যের যে-সব গান ঢুকে পড়েছিল ঝিমন্ত দ্বারীর অনবধানে, বইয়ের ফর্মাগুলি ছাপা হয়ে যাওয়ার পরেও তাদের বহিষ্কার না ক'রে উপায় ছিল কি? তাই 'চিত্রা' 'কল্পনা' হাতের কাছে তখন যে কাব্য পেলেন কবি, তা থেকেই এদের তলব পড়ল কি শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্য? তখনকার মতো কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে, অনায়াসে এদের ভুলেও গেলেন তিনি। অপর পক্ষে প্রচলিত গীতবিতানে এদেরই ফাঁকে ফাঁকে আগে বা পরে আর-যেগুলি আছে, গান হিসাবেই রয়েছে তাদের মান মর্যাদা কুলপরিচয়— কবিতা-রচনার সঙ্গে সঙ্গে, অল্প পরে বা দীর্ঘকাল পরেও, যখনই সুর বসিয়েছেন কবি সে সুর তুলে নিয়েছেন গীতজ্ঞ গুণী, যখন যিনি ছিলেন তাঁর কাছে। কিছু সুর হারায় নি তা নয় (যেমন কল্পনারই 'এবার চলিনু তবে' / 'বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে'।) কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে— যে মুহূর্তে স্থান পেয়েছে কবির কোনো গ্রন্থে, গান ব'লেই ঘোষণা হয়েছে প্রথমাবধি। পূর্বোক্ত গীতবিতান-৩'এর সংখ্যা ৫৩। ৫৪। ৫৬। ৫৭। ৬১ (পৃ ৭৮৬-৯২) সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না তো।*

এক কালে সুর দিয়েছিলেন কবি, সংরক্ষিত হয় নি, এমন গানের অভাব নেই তা সকলেই আমরা জানি। কেবল তিনটির উল্লেখ করা যায় এখানে—

১ হে অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু

২ বলো বলো, বন্ধু, বলো তিনি তোমার কানে কানে

৩ আজি পল্লীবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো †

প্রথমটির মজবুৎ কার্ড্-বোর্ডে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বহস্তের

---

* বিষয়টি অনুধাবন করতে হলে, উক্ত গীতবিতানেই, পৃ ৯৬৩, দ্রষ্টব্য টীকা ৪।

স্বরলিপি (অপর পিঠে বুঝি তাঁরই আঁকা ছবি) — এক কালে চোখে দেখেছি আমরা স্পষ্ট মনে পড়ে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'ভবনে বাস-কালে। অনুরূপ আরো বহু গানের স্বরলিপি ছিল, সবই কবির নতুন-দাদার স্বহস্তলিপি, শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবীর দান বিশ্বভারতীকে। অন্যগুলি কোথায় সংরক্ষিত আজ জানি না; এটি হারিয়েছে ব'লেই স্বরবিতানের কোনো খণ্ডে স্থান পায় নি। বহুখ্যাত মজুমদার-পাণ্ডুলিপি-অনুযায়ী এ গানের রচনা ১৬ আশ্বিন ১৩০২ তারিখে আর প্রথম সংকলন ১৩০৩ কাব্যগ্রন্থাবলীর 'গান' অধ্যায়ে।

দ্বিতীয়টির উল্লেখ যেমন আছে দিনেন্দ্রনাথ- লিখিত ও সম্পাদিত প্রথম-প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩২৫) গীতপঞ্চাশিকার সূচীপত্রে, সম্পূর্ণ গানের পাঠও আছে '৪৬' সংখ্যায় '২৭' পৃষ্ঠায়— স্বরলিপি কোথাও নেই!

তৃতীয় গানটি রচনার উপলক্ষ্য ১৩৪৪ বর্ষামঙ্গল। বিশেষ কারণে উৎসবের অনুষ্ঠান হয় নি শান্তিনিকেতনে কিন্তু যে অনুষ্ঠানপত্র ছাপা হয় এ সময়ে তাতে যেমন আছে গানটি, রয়েছে ১৩৪৪ কার্তিকের প্রবাসী পত্রে 'বর্ষামঙ্গল ১৩৪৪' গীতিগুচ্ছের অন্তর্গত হয়ে।

এই-সব প্রায়-প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণে মনে করা চলে— উল্লিখিত গান তিনটিব সুর ছিল এক কালে, সংরক্ষিত হয়ে পৌঁছয় নি একালে।

আর-একটি মাত্র গানের প্রসঙ্গে এই 'সংযোজন' শেষ করা যায়। প্রচলিত গীতবিতান গ্রন্থে তৃতীয় খণ্ডের 'পূজা ও প্রার্থনা' অধ্যায়ে রয়েছে আখর-সমৃদ্ধ কীর্তনাঙ্গের একটি গান : তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই ইত্যাদি (পৃ ৮৪৯)। প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীমান সুভাষ

। কবি-কর্তৃক নির্বাচিত গান হিসাবে তৃতীয় গানটি ছিল দ্বিতীয়খণ্ড গীতবিতানে (মুদ্রণ-সমাধা ১৩৪৬ ভাদ্রে), এ কথা উল্লেখযোগ্য। অপর দুটি গান পাওয়া যাবে প্রচলিত তৃতীয় খণ্ডে।

চৌধুরী দেখিয়ে দিলেন কবির 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'প্রার্থনা'-শীর্ষক চতুর্দশপদীর সূচনাংশের কয়েকটি ছত্রের আধারে এর রচনা, যথা—

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' করিছে সবাই …
নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমুখে,
এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক লজ্জায় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ছত্রে 'করিছে' স্থলে 'বলিছে' গানে আর সংকলিত চতুর্থ ছত্রের রূপান্তর : এরা ম্লান হয়ে যাক্ তোমার সম্মুখে / পরবর্তী আখর : লাজে ম্লান হোক হে ইত্যাদি / অতঃপর ভাবের অনুস্মৃতি কেবল, ভাষার নয়।

সংশোধন

পৃষ্ঠা। ছত্র	শুদ্ধ পাঠ
২৫। ১৬	'হইয়া' স্থলে : হয়ে
৩৩। শেষ	। প্রায়শ্চিত্তে
৩৮। ১২	নামান্তর
৪৪। ১৩	আর-এক
৬১। ৮	পূর্বসংকেত ও
৭৯। ১২	সিকদার
৮১। নীচে থেকে ৫	ট্র্যাজেডি!
৮৭। ১৬	'চাল' স্থলে : চলে
১০৫। ৪	জ্যৈষ্ঠে
১৭১। ১৫	যুগান্তরে?
১৮৪। নীচে থেকে ৫	বার্ধক্যে

রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮) গ্রন্থে

কবি শিল্পী ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা

শাজাহান (বলাকা ৭)
উত্তীয় (শ্যামা)
কমলা (নৌকাডুবি)
দামিনী (চতুরঙ্গ)
জীবনের কবি রবীন্দ্রনাথ
শিশু ও শিশু ভোলানাথ
ছিন্নপত্রাবলী
রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি
রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী
মায়ার খেলার রূপান্তর
রবীন্দ্রচিত্রকলা

ইত্যাদি

মূল্য ৪০ টাকা